যুগে যুগে যার আসা

সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬

নিবেদন

যে লোহা পরশমণির ক্ষণসান্নিধ্য লাভ করেছে তাকে যদি পরশমণির পরিচয় দিতে হয়—তাহলে কথায় নয়—নয়নের জলে। শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দজী আজন্ম সাধক ও সিদ্ধপুরুষ।

তিনি 'যুগে যুগে যার আসা' এই পুস্তকে তাঁর পরমারাধ্য শ্রীশ্রী৺ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ভাবজীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব্ব আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। পরমহংসদেবকে এমনভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারার তিনি প্রকৃত অধিকারী কারণ তাঁহার জীবনধারা একেবারে তাঁর পরমারাধ্য দেবতার জীবন-ধারায় হারা হইয়াছে।

পরমহংস-দেবের সাধনপথের সেই জ্বালাময়ী উৎকণ্ঠা, সেই অবোধগম্য বচন ও আচরণ, বিরহের সেই অসহ্য-যন্ত্রণা, মিলনের সেই শাশ্বত পরমানন্দের যে চিত্র লেখক ফুটাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার অপরোক্ষ নিবিড় অনুভূতির ছাপ বর্ত্তমান।

পুস্তকখানি ক্ষুদ্র আকারে বটে কিন্তু ইহা কালজয়ী। ভক্তিরস-পিপাসু পাঠকগণের ইহা চিরদিনের আনন্দের বস্তু হইবে।

আশ্রমবাসিনী স্নেহময়ী মায়েরা ও আশ্রমবাসী ভক্তগণ এই গ্রন্থরাজকে পূজা করিবার অগ্রাধিকার আমাকে দিয়াছেন। আমি ভক্তিহীন, মন্ত্রহীন অভাজন—বক্ষের উষ্ণতায় ও চক্ষের জলে ইহার অভিষেক করিয়া—নতজানু হইয়া সজল নয়নে কৃতাঞ্জলী পুটে বলি—

'যৎপূজিতং ময়াদেব পরিপূর্ণং তদস্তুমে'।

কোগ্রাম
২২শে শ্রাবণ
১৩৬৫

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং ত্বং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ।

—স্বামী অভেদানন্দ

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

—রবীন্দ্রনাথ

এক

তুষার তীর্থ হিমালয়ের উপলে জাগা সাতরঙা রামধনুর হাসি দেখেছ কি—আর দেখেছ সপ্তপর্ণের মানিক ছড়িয়ে পড়া ভোরের আলোয় গগন গঙ্গা……?

তেমনি এসেছিলেন আঁধার কারায় নীলমানিকের ব্রজবঁধু, আর বেথলহেমের পান্থশালায় হেম তনু ঈশামশি—আবার দেখি নদীয়ার, শচীর দুলাল শত চাঁদ মাখা অঙ্গে…এবার কিন্তু বিশ্বের আর্তি নিয়ে এসেছিলেন চন্দ্রার ভাঙ্গা ঘরে এক মুঠো জুঁইএর মত গদাধর……সেদিন ধরণীতে জাগেনি কোন আগমনী—শুধু নেমে এসেছিল একটি আনন্দের ললিত—আর পুলকের একটি মদলেখ…

স্বর্গ যেন দাঁড়িয়েছিল ধরার আঙিনায়—আর ধরা ··সে শুধু চেয়েছিল লাজুক নত চোখে।

আলোর দেশ সপ্তর্ষিমণ্ডল—জ্যোতিঘন বেড়া দেওয়া খণ্ডের ঘর পার হয়ে অখণ্ডের ঘর, রাশি রাশি জ্যোতিঘন তৈরী তার পথ…তমসঃ পরস্তাৎ …সমস্ত আঁধারের পারে সে দেশ—সেখানে ধরার ধূলির, ধরার দৈন্যের প্রবেশের পথ নাই—আছে শুধু শান্ত-শুদ্ধ-ধ্যানসুন্দরের প্রকাশ · সেই যেখানে সাতটি ঋষি তাদের সমাধির গহন গাহনে নিবাত নিথর রূপে বসে আছেন জ্যোতির নগাধিরাজের মত ··সেই স্থানে ঘটলো এক পরম অভ্যুদয়। এসে দাঁড়ালো এক কুমার কিশোর—অরূপ যদি রূপায়িত হয়—সমস্ত স্বর্গের সুষমা যদি মোহমন্থন রূপ নেয়—মদির জ্যোছনা যদি নিথর নিবিড় হয়ে ধরা দেয় বাহুর বন্ধনে তবুও তার শ্রীঅঙ্গের এক কণাও হয় কিনা সন্দেহ—যার ক্ষণিকের ইচ্ছা বিলাসে সব সুন্দরের প্রকাশ হয়, তার অকল্পনীয় রূপের কথা কি বলা যায়? সেই চির পিপাসিত ধ্যানের ধন—যুগ যুগ বেদনায় গড়া জ্যোতি-ঘন-তনু অমিয়য় কিশোর এসে দাঁড়ালো সপ্তর্ষি লোকে। সেদিন গগনে ভুবনে জেগেছিল যে হর্ষ, যে পুলক—তার প্রকাশের ভাষা যে নিথর।

সে তার তুষার উদ্ভিন্ন বাহু দিয়ে ধরল জড়িয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রবীণতম ঋষিকে, যার চিন্তায় ঋষির ধ্যান গম্ভীরতা—যার চিন্তায় ঋষিব গহিন লোকে বাস, তার আগমনে ঋষির নেই সাড়া · কিশোর আর পারে না—ধীরে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে তাব ব্যাকুল বাহু দিয়ে ঋষির কণ্ঠ—শত বেণু-বীণায় বলে,—ওগো ঋষি! জাগো, জাগো—আমি যে যাচ্ছি—তুমি যাবে না?···এমনি করেই কি জাগাও দয়ামষ সব নীববতা—সব নিথরতা—সব জড়তা! যার ডাকে সৃষ্টি একদিন লীলায়িত হয়েছিল, তার ডাকে কি সাড়া না দিয়ে পারা যায়···

জাগেন ঋষি—সপ্তর্ষি মণ্ডলেব প্রবীণতম ঋষির নিবিড়তম ধ্যান যায় ভেঙ্গে, স্তিমিত নেত্রে জেগে ওঠে প্রেমেব স্পন্দন—সেদিন সেই পবমক্ষণে কেউ কি দেখেছিল দুটি অম্লান প্রভাতী তারার মত ধবার ধূলায় নেমে এসেছিল পার্থ আর তাব সাবথী···নব আব নারায়ণ···স্বামিজী আর শ্রীঠাকুর···
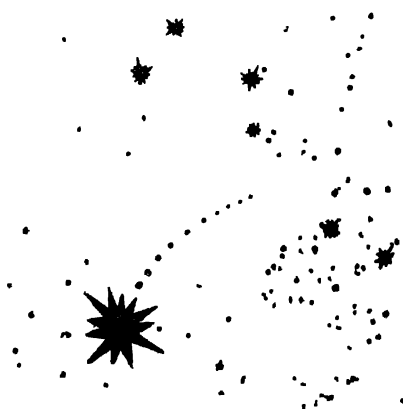
সপ্তর্ষিমণ্ডল

দুই

আঠারো শতকের বাংলা—কবির বাংলা—ঋষি তপস্বীর বাংলা—ধ্যানের বাংলা—সোনার বাংলা। তার শ্যামায়িত অঞ্চলে সুখে স্বচ্ছন্দে গৌরবে বাস করতো এই বাঙ্গালী।

মাঠে মাঠে ছিল শ্যাম শস্যের প্রাচুর্য, বড় বড় দীর্ঘিকার কাকচক্ষু জলে ছিল মাছের প্রাচুর্য -সেই দেশে বাস কর'ত বলিষ্ঠ চিন্তাশীল এক জাতি—যারা ছিল ভারতের তথা জগতের লুব্ধ নেত্রের লক্ষ্য। এই দেবভূমিতে বারে বারে এসেছেন কত সাধুসন্ত—সতী-সীমন্তিনী···এই দেবভূমির রাঙ্গা ধূলায় আপনাকে দিয়েছেন লুটিয়ে স্বয়ং ভগবান গৌরচন্দ্র। ধূলা হয়ে গেছে সোনা—জগৎ হয়ে গেছে ধন্য। আর আমরা—মরণের মুখে পড়েও শত দুঃখ দৈন্যে জর্জ্জরিত হয়ে আজও আমরা অমর; বাংলার বুকে আজও জ্বলে প্রেমের, শান্তির, ত্যাগ-বৈরাগ্যের, শৌর্য-বীর্যের অনির্বাণ শিখা—সোনার বাংলা আজও মরেনি।

এই আঠারো শতকের বাংলায় জ্বলে উঠেছিল এক জীবন-সমিধের শিখা। হুগলী জেলার উত্তর-পশ্চিমে, বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের মিলন অঙ্গনে দেরে গ্রামেই বাস করতেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়—শিখাময় তাঁর জীবন···

ব্যথার আঁধার ভেঙ্গেই জেগে ওঠে মঙ্গলময়ী ঊষা, গ্রীষ্মের তৃষাতুর বুকেই করুণার ধারাসার আসে নেমে, ব্যথায় রাঙা হৃদয়েই জেগে ওঠেন ব্যথাহারী নারায়ণ······

যুগে যুগে এশিয়া তথা ভারতের বুক নিঙড়ে ডাক উঠেছে ক্রন্দসী ধরার, ডাক উঠেছে অধর্মের গ্লানির বিরুদ্ধে, অশিবের বিরুদ্ধে। অন্য দেশে ভোগ ব্যাকুলতা নিয়ে মানুষ তাঁর দুয়ারে বারে বারে আঘাত করেছে···তার ফলে সেই সব দেশে তাঁর প্রকাশ হয়েছে শুধু ভোগক্ষেম বহন করে। আর ভারতের ইতিহাস, দেবভূমির ইতিহাস···তাঁরই ইচ্ছায়,

ভারত অন্য পথ নিয়েছে, সে পথ যোগক্ষেমের পথ—সত্য-শিব-সুন্দরের পথ, তাই ভারত ও এশিয়ায় প্রকাশ ধর্ম-বীরদের—অবতারদের।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের জগতে নেমে এসেছিল অধর্মের এক রাশ আঁধার—জড়বাদের, অজ্ঞেয়বাদের দুরপনেয় মোহ। ফরাসী ও জার্মান জাতির মধ্যে ক্যাণ্ট, লামেট্রি, ফয়ারবাক্, মার্কস প্রভৃতিদের প্রকাশ চিন্তাশীল মাত্রেই দেখেছেন। ইংলণ্ডে দর্শন ও মনোবিজ্ঞানে হব্স, হিউম্ প্রভৃতির মতবাদে এর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতে কিন্তু পূর্বে হতেই ধর্মে নানা মত ও পথের সাধুসন্তেরা এত বিচিত্রতা এনেছিলেন যে এদের ভিতরে একত্বের ভিত্তিভূমির সন্ধান পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছিল। বেদমত ও সংস্কৃত ভাষা পরিহার করে, জাতির গণ্ডী বিনা বিচারে ভেঙ্গেচুরে সমভূমি করে, ধর্মের অঙ্গগুলির পরিহারে নিরাকার বাদ প্রচার করে ধর্মের যে কুশলতা সাধিত হয়েছিল, তাই আবার পরবর্তীকালে ধর্মের নামে যথেচ্ছাচারিতা এনে দেয়। আবার সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে মুসলমান সভ্যতার ভোগবাদ আর রাষ্ট্রের সহায়তায় হিন্দুধর্মের সঙ্গে বিরোধ যে অনিষ্ট সাধন করেছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতা তার শক্তি ও প্রলোভন নিয়ে, সন্দেহবাদ, জড়বাদ ও সর্বোপরি ভোগবাদ নিয়ে, তাতেই ইন্ধন যোগাল। ভারতের তথা বাংলার, এমন কি সারা জগতের এ এক সঙ্কটময় যুগ—জাতির ভিত্তিভূমি যেন শিথিল হতে বসেছিল···দিশাহারা তরণীর মত আমরা যেন অকূলে ভেসে চলেছিলাম—লক্ষ্যহীন, আশাহীন··· ভারত-পথিক তখন নবীন আশায়, নবারুণের প্রতীক্ষায় ঊর্দ্ধমুখে আকুল হয়েছিল বসে···

এমনি যুগসঙ্কটে নেমে এলেন করুণার প্লাবনে মহাসমন্বয়-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। বিজ্ঞানের আলোয় মানুষের মন তখন একদিকে জড়বাদে সমাচ্ছন্ন, অন্যদিকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসে পথহারা। এই পথহারাদের পথের দিশারী হতে হলে এদের মতই হতে হয়, তাই ঠাকুর বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে ভগবৎ প্রাপ্তির পথ দেখাতে সুরু করলেন—শুধু ব্যাকুলতাই হল সম্বল—শুধু চোখের জলে ভরা হল মঙ্গল ঘট—নিজের জীবন বলি দিয়ে কেনা হল মার আশিস···এমনি করে সব প্রধান প্রধান

ধর্ম মতের সাধনে সিদ্ধ হয়ে যখন অদ্বৈত-সিদ্ধিতে মন অখণ্ডের ঘর থেকে আর নামতে চায় না, সেই সময় মা'ই আবার নামিয়ে আনলেন বিশ্বের কল্যাণে অখণ্ড হতে খণ্ডের রাজ্যে···বললেন,—ভাবমুখে থাক।

কাণ পেতে যে কল্যাণবাণী শুনতে চেয়েছিল বিশ্ব, সেই বাণী মা নিজেই শুনিয়ে গেলেন,—ওরে তুই ভাবমুখে থাক। এমনি করেই কি ভাববাদের (আইডিয়ালিজম্) প্রতিষ্ঠা হল উনবিংশ শতকের জগতে। এমনি করে তিনবার মার আদেশে মায়ের দুলাল নামলেন সমাধির সপ্তলোক হতে···মরুর বুকে সেদিন নেমেছিল কণ্ঠভরা তৃষাহরা অমৃত বরিষণ···যার কৃপাধারে শুধ বাংলা নয়, শুধু ভারত নয়, সমস্ত বিশ্ব অমৃতায়িত হচ্ছে···বিশ্বের উর্দ্ধে যে সব লোক আছে সেখানেও চলেছে হর্ষপ্লাবন···আজ লোকে লোকে বসেছে নব-বোধনের মঙ্গলঘট আর আগমনীর মিলন মাঙ্গলিকে, দিক-দিক দেশ-দেশ হচ্ছে অনুরণিত।

সত্যসন্ধ ঋষি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্মনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিবালয় ও চাটুজ্যেপুকুর আজও তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা ও জনরঞ্জন চেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। এঁর তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান ক্ষুদিরাম সম্ভবতঃ এগারশত একাশি সালে জন্মগ্রহণ করেন।

অশ্র-ছাওয়া কল্পনায় আমরা আবার ফিরে যাই বাংলার সেই গৌরবের যুগে—আবার দেখি সোনার বাংলার সোনার ছেলেমেয়েদের···দেখি তেজস্বী আর্য-মহিমায় দীপ্ত ক্ষুদিরাম—দেহ-গৈরিকে অগ্নি-শিখার সুষমা—আর দেখি দুই পাশের লোক শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে করছে চরণ চুম্বন—দীর্ঘ দীপ্ত নেত্র, ভাবে ভক্তিতে আর ব্রহ্মতেজে আরক্তিম। আর অনাসক্তিতে, ত্যাগে, তপস্যায় দুই চরণ যেন ধরণীর ধূলিতে পড়েও পড়ে না···মনে হয় যেন এ স্বপ্নের বাংলা···যেন এই অমর বাংলা—আমাদের চির বিদায়ের ধন।

আবার দেখি অবগাহনরত ব্রাহ্মণ উর্দ্ধমুখে গায়ত্রীর আবাহন করছেন—আয়াহি বরদে দেবি—চোখে দ্যুলোকের দ্যুতি—মুখ ভাগবৎবিভায় আরক্তিম। আর দীর্ঘিকার তীরে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান যুক্তকর স্নানার্থীরা।

মনে হয় বর্তমানে সভ্যতার আলেয়ার হাতছানিতে আমরা যেন অন্ধ মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছি।

কালের যবনিকা সরিয়ে আবার আমাদের চোখে পড়ে এক অপূর্ব দৃশ্য ···ভূদেব ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম নিবাত নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে জমিদার কক্ষে—মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দৃঢ়তার সঙ্গে করছেন অস্বীকার—অনুনয়, ভীতি কিছুই তাঁকে সত্যাশ্রয় থেকে বিচ্যুত করতে পারে না—সাতপুরুষের জননীর তুল্য ভিটা, পৈত্রিক সম্পত্তি—কিছুরই মায়া তাঁকে টলাতে পারে না। এমনি সত্যনিষ্ঠা, প্রাণের বিনিময়ে সত্যকে আঁকড়ে থাকা,···আর একবার আমরা দেখেছি অযোধ্যাধিপতি দশরথের···মিথ্যার বুকে কখনও সত্যস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাব সম্ভবে না।

জীবনের শেষ প্রান্তে এমনিভাবে হৃতসর্বস্ব ব্রাহ্মণ দেরেপুরের অনতিদূরে কামারপুকুরে বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর দেওয়া পর্ণকুটীরে এসে আশ্রয় নেন। সঙ্গের সম্বল ইহপরকালের সাথী গৃহদেবতা রঘুবীর—আর সম্বল বন্ধুবরের দেওয়া এক বিঘে দশছটাক ধান্য জমি—নাম লক্ষ্মীজলা—মা লক্ষ্মীর ক্ষুদ্র স্বর্ণ ঝাঁপির মতই! এই জমি দেব-ব্রাহ্মণেব গৃহে অফুরান সম্পদই হয়েছিল···শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় এমনি একখণ্ড জমি আছে—তারও নাম লক্ষ্মীজলা···গদাধর আর জগন্নাথ, ব্রহ্মসাগরের ছুটি ফুট কিনা!
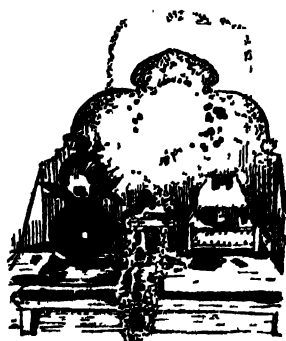
রঘুবীরের সিংহাসন

তিন

জর্জ বার্ণাড শ—বিশ্বের বাণী মন্দিরের একজন দিক্‌পাল···তাঁর একটি কথা বেশ মনে লাগে—বলেছেন তিনি, বেশ জোরেই বলেছেন,—যখন বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন যে একটি ছুঁচের ডগায় লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতিন্ নৃত্য করছে, অথচ তারা ধরা দেয় না স্থুল লীলায়, তখন এটী ধ্রুবসত্য হয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু যখন ভগবদ্বিশ্বাসীরা বলেন, দেবদূতেরা লীলা করেন সূক্ষ্মরূপে —আর দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, উপলব্ধি করেই বলেন, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় কুসংস্কার—হাসির খোরাক মাত্র। কিন্তু বাণী-পাদপীঠে আজ যাদের অর্ঘ্য শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য তাদের কথাই বলি—ধর্মই বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক। এটি বলেছেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইন।

অসময়ে এসেছেন অতিথি নারায়ণ—গৃহের সম্বল সামান্য। একদিকে উপবাসী নারায়ণ অন্যদিকে বাস্তবের নগ্নসত্য—গৃহলক্ষ্মীর ঘটল বিষম পরীক্ষা···মা অন্নপূর্ণার নাম করে সামান্য যা কিছু জোগাড় হল তাই দিলেন চাপিয়ে—সহসা দেখেন একি অঘটন, রন্ধনস্থালীর উপান্তে দুইখানি পদ্মহস্ত !—ফলে সেই সামান্য আহার্য্য হয়ে উঠল মধুসূদনের দধিভাণ্ডের মতই অফুরান—অতিথি সৎকার করতে যে ব্যথা বেজেছিল জননীর বুকে সেই ব্যথাই বেজেছে বিশ্বজননী অন্নপূর্ণার বুকে—সেই দিন থেকে জননীর অন্নথালী, অন্নপূর্ণার ভাণ্ডের মতই হত যেন অফুরন্ত—আর সেইদিন থেকে জননীরও কাজ হল কাশীর অন্নপূর্ণার মত নিরন্নদের ডেকে ডেকে অন্ন দেওয়া···জননী চন্দ্রার সেই অন্নপূর্ণার রূপ আজ সার্থক হয়েছে, আজ শ্রীরামকৃষ্ণ জননীর সাধ পূর্ণ হয়েছে. বিশ্বের তৃষাতুর আর্তের জন্যে আজ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের দেউল চিরমুক্ত···

আর এক দিনের দিব্যদর্শন—না বললে জননী চন্দ্রার দেবীত্বের পরিচয় দেওয়া পূর্ণ হবে না। আশ্বিনের আনন্দ-নন্দিত কোজাগরী রাত্রি···জননী চন্দ্রা পুত্রের আগমন উৎকণ্ঠায় ঘরবার করছেন. এমন সময় দেখেন পথে এক দেবীমূর্তি—নানা আভরণে বরদেহ সজ্জিত—কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে বলয়—সরলা জননী অতি সরলভাবেই তাঁকে প্রশ্ন করলেন,—মা আমার ছেলের

পূজো করে ফিরতে এত দেরী হচ্ছে কেন জানো ?—দেবীমূর্তি তাঁর পুত্রকে চিনবেন কেমন করে—এ প্রশ্ন তাঁর মনেই হল না। যাই হোক দেবী বলেন- মা আমি সেই বাড়ী থেকেই আসছি···তোমার ছেলের জন্য ভেবোনা সে আসছে···তখন জননী চন্দ্রা, স্বভাব সুলভ স্নেহার্দ্র অন্তরে তাঁকে স্বগৃহে বিশ্রামের জন্য ডাকলেন—কিন্তু দেবী বারান্তরে আসবেন এই অভয় দিয়ে স্মিতহাস্যে হলেন অন্তর্হিতা···সারদারূপে আসার এই কি সূচনা······

বারশত একচল্লিশের একদিন- তপস্বী ব্রাহ্মণ, কন্যা কাত্যায়ণীর শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত—কন্যা অসুস্থ, মনে হল যে এ অসুস্থতা অন্য কোন কারণে—যেন কোন প্রেতাবেশ হয়েছে। দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করলেন,—তুমি যেই হও, আমার কন্যাদেহ পরিত্যাগ করে স্থানান্তরে যাও।

সত্যই কন্যাদেহ অবলম্বনে সেই প্রেত অনুনয়ের কণ্ঠে উত্তর করলে,—প্রভু ! আমায় মুক্ত করুন—গয়াধামে আপনার মঙ্গল হস্তের পিণ্ড পেলে আমি মুক্ত হয়ে যাব···করুণা বিগলিত ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে দিলেন সম্মতি···

এমনি করে ক্ষুদিরামের দ্বিতীয়বার তীর্থ যাত্রার সূচনা হয়। প্রথমবারে তিনি রামেশ্বর সেতুবন্ধ প্রভৃতি তীর্থ সেরে আসেন।

ভারততীর্থ—ভারতের কাশী, কাঞ্চি, বৃন্দাবন, মথুরা, নদীয়া, কামারপুকুর—ভারতের ভালে গৌরব টীকা। শুধু ভারতে নয়—সর্বদেশের সর্বকালের এরা জয়স্তম্ভ। অনাগতদের জন্য এরা বহন করে এনেছে কত হারিয়ে যাওয়া গৌরব-স্মৃতি—কত ইতিহাস—কত পুরাণ কাহিনী—কত সাধু-সন্তের পবিত্র জীবন-নাট্য- কত সতী সীমন্তিনীর পূত মর্মকথা অভিনীত হয়ে গেছে এর বুকে—ভারতের দর্শন, পুরাণ, রাজনীতি, অর্থনীতি, কাব্য-কাহিনীর ইতিহাস—এই ভারত-তীর্থের ইতিহাস। এই ভারত তীর্থ-পথের ধূলি আজও মহীয়ান হয়ে আছে ভারত-পথিকের পদরেখায়। জগতের তৃষিত আত্মার আত্মীয় হয়ে আজও ভারত-তীর্থের ধূলি হয়ে আছে রাঙ্গা। বিস্মিত প্রতীচ্য তার গৌরবোন্নত শির অবনত করে আজও ভারতের পথরেখা চুম্বন করে। এই ভারত-তীর্থ পথের সোনার ধূলিকে বার বার জানাই প্রণাম।

বারশত একচল্লিশের কোন একদিন ইষ্টের চরণে প্রণাম জানিয়ে, গৃহিণী চন্দ্রার কাছে বিদায় নিয়ে পুত্র কন্যাদের কুশল কামনা করে গয়া-তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়লেন তীর্থঙ্কর ক্ষুদিরাম। পিছে পড়ে থাকে সুখনীড়—পুত্র-কন্যাদের কলকথা—পিছে পড়ে থাকে জননী জন্মভূমি—তার সোহাগ স্বপন-মুখর দিনগুলি নিয়ে--অকম্প্র হৃদয়ে, বন্ধনমুক্ত গৈরিক প্রবাহের মত ছুটে চলেন যষ্টিতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—অভীষ্টের দর্শন পিপাসায়···তীর্থযাত্রা তখন মহাপ্রস্থানের মতই ভয়াবহ ছিল—ভক্ত হৃদয়ের পরীক্ষার পথবিশেষ ছিল এই তীর্থ পথ।

চৈত্রের এক নব মুকুলিত দিনে তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এসে পৌঁছলেন তাঁর যাত্রা শেষে—গযা তীর্থে। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে কর্তব্যগুলি শেষ করে আনন্দ অবসাদে তিনি নিদ্রার বুকে পড়েন এলিয়ে···রজনীর গহিনে ধরণী তাঁর মোহজাল ছড়িয়ে কি যাদু রচনা করলেন, দেবতা তার একমাত্র সাক্ষী···

সর্বান্তর্যামীর লীলা দিযে, বিলাস দিযে রচনা এই স্বপ্নরাজ্য—এই স্বপ্নেই মানুষের স্ব-স্বরূপের প্রকাশ—এই স্বপ্নের মোহজালে খসে যায় বৃথা আবরণ—সমাজের নাগপাশ—জগতের চাহিদা—মানুষ তখন দেবতার কাছে দাঁড়ায় তার নগ্ন-তৃষা নিয়ে আর সংস্কার নিয়ে। তাই দেবস্বপ্ন আমাদেব সঙ্গে হৃদিস্থিত হৃষিকেশের নর্মলীলা মাত্র···আর···

তৈর্থিক ব্রাহ্মণ

চার

ঋষি তপস্বী ব্রাহ্মণের চক্ষে আঁধারের যবনিকা যায় সরে ; দেখেন— পিতৃলোক হতে, পিতা পিতামহ এঁরা এসেছেন তাঁকে আশীর্বাদ করতে—অশ্রুর অভিষেকে তাঁদের চরণে প্রণতি জানান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—চকিতে পট-ভূমিকার হয় পরিবর্তন ··দিব্য জ্যোতিতে কুটীর যায় ভরে···রোমাঞ্চ বিস্ময়ে দেব-ব্রাহ্মণ দেখেন, থমকিত বিদ্যুদ্দামের মত করুণ কান্তরূপে শ্রীগদাধর এসেছেন স্বয়ং- যুগ যুগ মথিত ভক্তের আকুতি দিয়ে গড়া সে বরতনু—দেখে ভক্ত যেন নিজেকে বিশ্বাস করতেই পারে না—সহসা একি ! সর্বহৃদয় মথিত করে যেন দূরাগত অলকার ঝংকারে বেজে ওঠে কমকণ্ঠ,—ক্ষুদিরাম ! আমি যে তোমার গৃহে যাব—বেপথু প্রাণের রোমাঞ্চ নিয়ে ভক্ত বলেন,—আমি যে নিঃস্ব, তোমাব সেবাধিকারের যোগ্যতা যে আমার নাই প্রভু···! বিশ্বের দুয়ারে যিনি নিত্য ভিখারী—বিদুরের খুদ যাঁর কাছে চিরসুধাময় তাঁর শ্রীমুখে জাগে হৃদয়-হরণ স্মিত হাসির একটি কণা··· যুগে যুগে এই অভয় ইঙ্গিতেই তো তুমি মুছিয়ে দিয়েছ ভগবান—ভক্তের সব ব্যথা, সব দুঃখ—সব সঙ্কোচ—সব আর্তি ! এমনি হাসি হেসেই বিলিয়ে গেছ আপনাকে দীন আর্ত ধরাব ধূলায় ·সেকি একবার ! নিঃস্ব চোখে জাগে শুধু মৌন আকুতি—শুধু দুটি ফোঁটা অশ্রু।

হৃদয় দেউল থাকে অর্গলিত—তাই দেবতার হয় না আসা। সহজ সরল মনের আকুতি দিয়েই খোলা যায় এই যুগ-রুদ্ধ দ্বার, ঠাকুর বলতেন,—সহজ সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। জননী চন্দ্রা ছিলেন সরলতার প্রতিমূর্তি। ক্ষুদিরাম তখন গয়াতীর্থে—সঙ্গিনী ধনীমার সঙ্গে জননী চন্দ্রাও সেদিন যুগীদেব শিবমন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত—দেবতার পূজার উপচার হাতে। সহসা ধনী দেখে—ভাবাবেশে অবশ শিথিল হরিময তনু লুটিয়ে হয়ে পড়ে হরচরণায়িত···। তাড়াতাড়ি যথারীতি শুশ্রূষা করে ধনী, চন্দ্রার মুখে শুনেন—সে এক অপূর্ব দিব্য দর্শন···যেন দেবাদিদেব শংকরের দেহ-বিগলিত এক জ্যোতি-তরঙ্গ তাঁর দেহ মনকে সমাচ্ছন্ন

করতে ছুটে আসছে, সে চেতন জ্যোতি-সমুদ্রে জননী আর নিজেকে সংবৃত রাখতে পারেন নাই···কিন্তু প্রশ্নও জাগে রোগ বা অপদেবতার আবেশ নয় ত? ধনী দেয় প্রবোধ···

তবে এই দিব্য স্পর্শে দেহ হয়ে যায় দেবায়তন—আর ভগবানের আবির্ভাব মহোৎসবের আয়োজন হয়ে যায় সুরু। নিত্য নিত্য নব নব দর্শন রভসে দেহ মনে জাগে হর্ষের প্লাবন ··তনুতীর তার আবির্ভাবে যায় ভরে···বর্ষাভিষেকে কুলুনদীর বুকে যেমন জাগে হর্ষহিল্লোল—জাগে দুকুল ভরা রূপ।

ধরণীর পরম লগ্নগুলি চুপিসারেই আসে—বরণীয় ক্ষণগুলির কথা ইতিহাসের পাতায় বড় একটা লেখা হয় না। মঙ্গলময়ী উষসীর মত ধীরে ধীরে ভরে দিয়ে যায় জীবনের পাত্র পূর্ণতায়···

আলেকজাণ্ডারের বা জারাক্সাসের রক্ত অভিযানের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিবিড় নিষ্ঠায় বর্ণিত—কিন্তু বৈদিক ঋষি-কন্যার মানসে যেদিন রাত্রিদেবী জেগেছিলেন উদার উদ্বোধনে, সেদিনের কথা কেউ কি জানে? দীন মেরীর বুক ভরে যেদিন জগতের এক-তৃতীয়াংশ আলো করা ভগবান ঈশামসি জেগেছিলেন সেদিনের সাক্ষী ছিল আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মাত্র, আর দ্বাদশটী দীন ঋষি···তাঁদেরই আকুতিতে হয়ত নেমে এসেছিলেন পরিত্রাতা—জগৎ যাঁকে আজও চেনেনি···আবার সোনার চাঁদের রাকারূপে শচীর বুকে এসেছিলেন গৌরকিশোর আর সাথে এসেছিলেন চির-শিশু নিত্যানন্দ, চোখের জলে ধরার কালিমা ধুয়ে দিতে —সেদিন সেই জ্যোৎস্নামদির রজনীর আকুলতা ছাড়া আর কি বা ছিল? আবার যেদিন চন্দ্রার রিক্ত বুকে এসেছিলেন গদাধরচন্দ্র সেদিনও জাগেনি কোন মহোৎসব ··জগৎ জুড়ে আজ যাঁর করুণাধারা আর ভাবধারা সেবা-প্রেমের সঙ্গম করছে সৃষ্টি, তাঁর জন্মবাসরে ক্ষীণ দীপটীও গিয়েছিল দখিণাবায়ে নিভিয়ে···শিশু আশ্রয় নেয় ধানের চুল্লীতে—শিশু শিবের যোগ্য আশ্রয়···মনে পড়ে পরিত্রাতা ঈশামসির জন্ম—পশুর খাদ্যাধারে।

গৃহ-কর্মের হয়ে গেছে সমাপ্তি, গৃহ-দেবতা রঘুবীর আর শীতলা মার ভোগাদি হয়ে গেছে সারা। ক্লান্ত নয়ন-পল্লব যখন রজনীর গহিন চুম্বার

আলসে অবশ—তখন নিদালীর মত নীরব পায়ে কে এসে দাঁড়ায়…কংসের আঁধার কারা একদিন যেমন উচ্ছল হয়েছিল নীলকান্তবেশে—তেমনি করেই কি এসেছিলে প্রভু নীরবে নিভৃতে নব-ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়ার ম্লানায়মান রজনীর শেষ যামে—অচেনা সুবাসের মত !

সূক্ষ্মলোকের কথা—ভাবলোকের কথা, দিব্যলোকের কথা—আমরা স্থূললোকে স্থূলভাবে চাই পেতে, আর এই অসম্ভব সম্ভব না হলেই হয় না বিশ্বাস—হয় অপ্রত্যয়…স্থূলের ক্ষুধাই, জড়ের আকর্ষণই এর প্রধান কারণ। আবার সব প্রত্যক্ষ, সব প্রত্যয় মনেরই খেলামাত্র…অবতারদের জীবন—সাধারণ জীবন নয়…তাই এঁদের জীবনে জড়িয়ে থাকে অপ্রাকৃত অনেক কিছু, আর সেটি মেনে নেবার মত দৃষ্টিভঙ্গীরও হয় অভাব।

দেবশিশু তখন আট মাসের—জননীর আশা ও ব্যথা নিয়ে দিন কাটে ··একদিন আনন্দকরোজ্জ্বল প্রাতে শিশুর শয্যাপ্রান্তে এসে দেখেন শিশু নাই—রয়েছেন এক আদিত্যবর্ণ দীর্ঘায়ত পুরুষ; গৃহ আলোয় আলোময় ··জননী মাত্র কিছু আগেই শিশুকে গেছেন রেখে আর এর মধ্যেই এই অঘটন—ভয়ে বিস্ময়ে ছুটে যান ক্ষুদিরামের কাছে, আনেন তাঁকে ডেকে—কিন্তু এসে দেখেন যে পট পরিবর্তন হয়ে গেছে—ক্ষুদিরাম বোঝান এ সেই চক্রধারী গদাধরেরই লীলা…উমা হৈমবতীর বর্ণনায় মহাকবি কুমার সম্ভবে বলেছেন,—

দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা
পুপোষ লাবণ্যময়ান বিশেষাণ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি।

চন্দ্রলেখা যেমন দিনে দিনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি দিন দিন রূপে রূপময় হয়ে ওঠেন…চন্দ্রার স্নেহচ্ছায়ে, দিনে দিনে চন্দ্রলেখার মতই বেড়ে ওঠেন গদাধর চন্দ্র—হাস্যে লাস্যে নর্মলীলায়…

শিশুর মুখে ফুটে ওঠে স্বর্গের সুষমা—শিশুর অস্ফুট হাসিতে ঝরে পড়ে অলকার অলকানন্দা—শিশু যদি হয় অলকা হতে ঠিকরে পড়া রূপলেখা ··তখন ধরায় জাগে নববসন্ত - কবির তুলিকা হয়ে ওঠে আকুল রূপতৃষ্ণায়—আর প্রাণের শুষ্কতটে জাগে লীলার হিল্লোল…র‍্যাফেলের শিশু ঈশার রূপায়ণ দেববালকদের নর্মলীলায় আজও হয়ে আছে চির-

নন্দনের ধন—আজও হয়ে আছে অমর...বৃন্দাবনের লীলা-কিশোর—নন্দদুলালের লীলারসে ধরণী আজও রসময়ী। আমাদের গদাধর গোপালকে নিয়ে তেমনিই এক আনন্দের হাট বসেছিল কামারপুকুরে। পিতার সঙ্গে ছেলে গেছে ভুরসুবোর বিখ্যাত মাণিক রাজাদের বাড়ী—মাণিক রাজা, ক্ষুদিরামের সত্যনিষ্ঠার পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে ছিলেন আবদ্ধ। ঐশ্বর্যের বাধা মহত্তের জন্য নয়...ছেলের অপরূপ রূপে বাড়ীর সবাই মুগ্ধ—বলে,—আবার এসো বন্ধু তোমার এই ছেলেটিকে নিয়ে...বন্ধুর হয়ত হয় না যাওয়া—ডাক আসে,—বন্ধু তোমার পথ চেয়ে আছি—ছেলেটিকে না দেখে থাকতে পারছিনা জেনো।

অন্তঃপুরচারিণী কল্যাণীরাও রাখতেন নানা আভরণ, গদাধরকে মনের মত সাজাতে...বৃন্দাবন-চন্দ্রকে না দেখে ব্রজবণিতারা দেখত অন্ধকার... গদাধর-চন্দ্রকে কিছুদিন না দেখলে এদের মনে ঘনিয়ে থাকতো ব্যথার আঁধার। তাই বার বার আসত ডাক —উপচারের থালী সাজিয়ে।

শুধু কি রূপময়...যাত্রা, কবিগান, ছবি আঁকা, মাটীর মূর্তি গড়া এসবে তার জুড়ি পাওয়া ভার—লাহা বাবুদের আটচালায় বসে পাঠশালায়...মনে পড়ে সন্দীপনী মুনির পাঠশালায়, নওলকিশোরের লীলামূর্তি...পড়ায় বেশী সময় লাগে না—ছেলেদের নিয়ে আমের বনে গিয়ে, চলে দিব্য খেলা —শ্রীমতীর ভাবে—কখন চলে রূপাভিসার, কখন চলে নৃত্য—কথকতা—গান। এক একদিন এভাবে হারিয়ে যায় সব সম্বিৎ—ছেলেরা অবোধ, ভাবে বুঝি মূর্চ্ছা...ভাব সমাধির রাজা নিজে এসে যখন লীলার পুনরভিনয় করে তখন সেই ঝরা ফুলের মালাই গন্ধমদির নব কিশলয়ের মতই হেসে ওঠে ধরণীর বুকে...আমরা যেন সেই চির পুরাতনকে চিনেও পারিনা চিনতে, ধরেও পারিনা ধরতে, ধরা দিতে অধরা হওয়া এইত তার খেলা......

একদিন দেখা যায়—গদাধর ভাবে অবশ—উপবাসী—মুখে নাই কথা ...ধনী কি জানি যেন বুঝতে পারে—ছুটে এসে সবাইকে বলে,—ওগো তোমরা কে কি দেবে দাও, আজ তোমাদের অনুরাগের দেওয়া অন্ন না হলে ক্ষুধা ত মিটবে না। দীনের ঠাকুর—দীনের আকুতি এমনি করেই করেন পূরণ...আর একদিন—ছুতোরের মেয়ে খেতির মা, দীনের আর্তি নিয়ে

প্রার্থনা জানায়, সবাই খাওয়ায় গদাধরকে—তারও প্রাণ যে হয় আকুল··· অন্তর্যামীর প্রাণে যায় সে কথা—ছুটে আসে খেতির মার কাছে—বিদুরের দ্বারে দেবতা যে নিত্য-ভিখারী······

সেদিন···দেবাত্মা ক্ষুদিরাম বসেছেন রঘুবীরের পূজায়—যেমন বসেন নিত্যদিন। স্রকচন্দনে আর মৌন নিবেদনে পূজা গেহ যেন পুণ্য আবির্ভাবে থম থম করছে···কোথায় ছিল গদাধর ছুটে এল, লীলাঞ্চিত চরণে, এসে—পিতার পুষ্পপাত্রের মালা নিল তুলে—দেবতার চন্দনে নিজের বরদেহ হল সজ্জিত···ললিত কলকণ্ঠে বলে,—দেখ দেখ আমি কেমন সেজেছি! ···পিতা ধ্যাননেত্র মেলে দেখেন···গদাধর না রঘুবীর! ···ভক্ত ভগবানে হয়ে যায় এক চকিত লীলার পালা। এমনি লীলা হয়েছিল সরযূর তীরে—ভক্ত তুলসীদাসের প্রীতির চন্দন সেদিন কিশোরকুমার রামলক্ষ্মণ পরেছিলেন নিজে যেচে···সেদিন কিন্তু এমন করে দেন নাই ধরা···। লীলা নিত্য—সরযূর লীলা—নদীয়ার লীলা—আর কামারপুকুরের লীলা—লীলা সেই একই······

গ্রামের কল্যাণী মায়েরা গদাইকে পেলে যেন সব যেত ভুলে—কেউ চাইত কিছু খাওয়াতে, কারো সাধ দুটী কৃষ্ণ কথা শোনে, যাত্রার ভঙ্গীতে—কেউ চায় সাজাতে, পূজা করতে···যেখানে যায় সোনার কিশোরকে ঘিরে বসে যায় আনন্দের হাট···

সে এক নববর্ষার দিন···আকুল করা নবীন মেঘভারে গগন ভুবন ঢাকা—চোখ জুড়ান সেই কৃষ্ণকান্ত বর্ষাগমে নব আশার মত সবাই পুলক চঞ্চল···কবি-কিশোর, প্রকৃতির দুলাল সেদিন চলেছে আনমনা মনে আলের পথ ধরে···চকিতে নীল মেঘের বুকে দেখা গেল নর্মলীলায় ভেসে চলেছে একদল হংসবলাকা—অসীমে সীমাবিলাসের মত—অপরূপ রূপে ধরা দেওয়ার মত। দেখা যায়—কিশোর গদাধর চকিতে আপন-হারা হয়ে লুটিয়ে পড়ে—হরিৎ-শ্যাম শয্যায়—হর্ষোচ্ছ্বাসে পুলকোদ্গম চারু দেহ—লুটিয়ে পড়া বিদ্যুৎ যেন···

সোনার কিশোরের এই প্রথম গভীর সমাধি—এই সমাধি তিন দিন ছিল—এই সমাধিই কি অসীমের বুকে আনন্দ বিহরণ মনরূপ বিহঙ্গের—

যে কথা পরে শ্রীঠাকুর বলতেন,—জ্ঞানীর ধ্যান—অনন্ত আকাশ—পাখী আনন্দে উড়ছে পাখা বিস্তার করে—আনন্দ ধরে না…

বিষাদের আঁধার ঘনিয়ে আসে। সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, আনন্দ-নিরানন্দ—মহামায়ার এই জগৎ বিলাস—দিনরাত্রির মত এরা আসে আবার চলে যায়—জাগে শুধু মার মুখে লীলায় উচ্ছল করুণার হাসি…জীবনের মাঝে মরণের, আবার মরণের বুকে জীবনের ছন্দ দোলা—এই ছন্দ মায়েরই দান—এরা আসেই, তবে মায়ের ছেলে, মায়েরই কৃপায় হেলায় এদের কাটিয়ে যায়—অশান্ত সমুদ্রে পাকা মাঝির মত…শাস্ত্রে কোথাও এঁদের স্থিতপ্রজ্ঞ বলেছেন, কোথাও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলা হয়েছে—কোথাও বা এঁরা যোগস্থ বলে নির্দেশিত…

ভগবান তথাগত, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহারা হন…আচার্য শঙ্করকে শৈশবেই পিতৃহীন হতে হয়…কিশোর গদাধরের জীবনেও নেমে এল এমনি এক বিষাদের দিন। অষ্টষষ্ঠিতিপর ক্ষুদিরাম পূজা উপলক্ষে ভাগিনেয় রামচাঁদের গৃহ সেলামপুর গ্রামে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিজয়া-দশমীর দিন মার প্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেবতপস্বী ক্ষুদিরামের জীবনদীপের অমর-জ্যোতি রঘুবীরের স্মরণ নিয়ে চির-জ্যোতির সমুদ্রে যায় মিশে। কামারপুকুরের ধর্মের সংসারে নেমে এল বজ্র-বৈশাখের দিন।
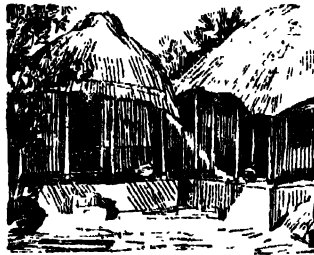
শ্রীরঘুবীরের মন্দির ও শ্রীঠাকুরের বাসভবন

পাঁচ

দেবজনক ক্ষুদিরামের দেহান্তে জীবন্মৃত চন্দ্রার জীবনে এক বিশেষ পটক্ষেপ হয়। স্নেহান্ধ জননী তাঁর পক্ষপুটে, পিতৃহীন বালককে আপদে বিপদে ঢেকে রাখতে হলেন সজাগ...

জমিদার লাহাবাবুদের পান্থ-নিবাস গঙ্গাসাগর যাত্রাপথের সাধু-সন্তদের একটি ডেরা বিশেষ ছিল...এখন থেকে উদাসী-কিশোর এই সব সাধু-সন্তদের অনুরাগী হয়ে পড়ল বেশী করে...তাদের পূজা আরতি—আত্ম নিবেদন—এই সব দেখে সে যেত আপন ভুলে...আর কোন কোন সিদ্ধ মহাত্মার চোখে সেই ভাবঘন কিশোর মূর্তির পিছনে যে বিরাট ভবিষ্যৎ, যে যুগচক্র উদয় অচলে আছে লুকিয়ে, তা ধরা পড়ে যেত...আর তারাও —প্রসাদে নির্মাল্যে, শ্রদ্ধা নিবেদনে, পরিতুষ্ট করতে চাইত আধ ফোটা এই লীলা কমলকে ..গদাধরচন্দ্রের ললাটে চিরদিনের লিখন ছিল সাধুর রাজা হওয়া। পরে যেমন বলতেন,—সাধুর রাজা হব সাধ ছিল—সে কথা তখন দিকচক্রে গুণ্ঠিত হয়ে থাকলেও দেখা যায় সাধুদেরও নানাভাবে সেবার ব্যবস্থা গদাধর করেছেন—কখন জোগান ধুনীর কাঠ, কখনও বাড়ী থেকে এনে দেন সিধার সম্ভার...

এক একদিন তারা নবীন বৈরাগীর বেশে দেন সাজিয়ে আমাদের সোনার কিশোরকে—ভস্মাবশেষে আর গৈরিকে সে সোনার তনুর কি যে শোভা হত! আর সাধুসন্তরা যারা দ্রষ্টা, তারা সে রূপ-মাধুরীতে নন্দনের কি যে আনন্দ পেত তা বলা যায় না...মনে পড়ে গৌর রূপ,—

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে,
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ......

তবে চন্দ্রামার—ধনীমার বুকে জাগত আঁধারের আশঙ্কা—যদি এরা সোনার গদাইকে ভুলিয়ে নিয়ে চলে যায়?—এমন ত শোনা যায়...

এক একদিন দেখা যায় গৃহকোণে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে জননীর অঞ্চল যায় ভিজে। জননীর দুঃখ গদাধরের বুকে জাগায় ব্যথা...মার কাছে

সে কথা দেয়, সাধুদের সঙ্গ সে করবে না—পাছে মার প্রাণে লাগে ব্যথা। আর্ত্তের ব্যথায় যিনি সমাধির সপ্তলোকে থাকতে পারেন নি, নেমে এসেছেন ধরার কঠিন ধূলায়—ভুলেছেন অলকার জ্যোতির্লোক—তাঁর বুক জননীর জন্য ব্যথিয়ে উঠবে এতো অসাধারণ কিছু নয়…জননী শচীর বুকভাঙ্গা ব্যথায় আমাদের নদীয়ার নিমাইও হয়ে পড়তেন আপনহারা…সেই একই লীলা—পরে যেমন বলেছেন,—সব এক—এক দেখছ না। তবে সাধুরাও চন্দ্রাদুলালকে ছেড়ে পারে না থাকতে—তাই তারা এসে দাঁড়ায় কুটীর দ্বারে, আর মার আশঙ্কা যে মিছে তাও দেয় জানিয়ে—আবার ফোটে হাসি মার মুখে, মুছে যায় সব আশঙ্কা—আবার সাধুদের জমাতে জাগে লীলার আনন্দ।

হরিৎ-অঞ্চলা, শ্যাম-মেখলা বাংলা, সত্যিই কবির বাংলা—ঋষির বাংলা। এই শ্যামা মেয়ের স্নেহ-ছায়ে বেড়ে উঠেছে কত যে কবি, কত যে ঋষি, ইতিহাস তার সব কথা ধরে রাখতে পারেনি। কত কুঞ্জে, কত যে গোপন জয়দেব, চণ্ডীদাস তাঁদের ললিত গাথা গেঁথে গেছেন—বনলক্ষ্মী হয়ত তার একমাত্র সাক্ষী…কত সাধু সন্ত, কাঙ্গাল বাউলের বেশে এই বাংলার ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে গেছেন ইতিহাসের পাতায় তার কোন চিহ্নই নাই…কিন্তু এর আকাশে বাতাসে, এর শ্যাম-শোভায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়; শ্যামা মেয়ের কৃষ্ণতার করুণ অতল চোখে তার ঈষৎ আভাস আজও জেগে আছে—মার কোলে উঠে মার মুখের পানে আপন ভোলা শিশুর মত তাকালে হৃতসর্বস্ব পল্লীজননী আজো তেমনি স্নেহচুম্বনে জাগিয়ে তোলেন হৃদয়-তন্ত্রী—জাগে কাব্য, জাগে দর্শন, এই স্নেহের পরসাদ আজও অফুরাণ হয়ে আছে মার বুকে…

বার মাসের তের পার্বণের একটি আনন্দোজ্জ্বল দিন—কামারপুরের শুচিস্মিতা পুরবাসিনীরা চলেছে পূজা উপচার হাতে, দেবী-বিশালাক্ষীর চরণান্তিকে। সঙ্গে চলেছেন আমাদের সোনার কিশোর গদাধর, হাস্যে লাস্যে, সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছে পল্লীবিতান—আলোছায়া দোলা বাংলা মার বুকে জাগল কি কাঁপন কে জানে…চকিতে বালক লুটিয়ে পড়ে চেতন হারা—দেব অঙ্গে পুলকশ্রী—মুখে রুচির হাসি, আলোয় আলোময়…

সমবেত কণ্ঠে মার জয়ধ্বনিতে সে ভাবাবেশের অবসান হয় সেদিন… একি ভবতারিণীর প্রথম প্রকাশ—না—দেবী বিশাইয়ের মহিমা উজ্জ্বল করা—কে জানে…

শুভ উপনয়ন বাসর—প্রজ্জ্বলিত হোম শিখার মতই দিব্যকান্তি গদাধর আছে দাঁড়িয়ে—মুখে ব্রহ্মজ্ঞের দৃঢ়তা আর ব্রহ্মতেজের দীপ্তি, পল্লীবাসী ও পল্লীজননীগণ আনন্দে, শ্রদ্ধায় যুক্তকর…এ যেন আচার্য শঙ্করের, ভগবান বামনের, উপনয়ন বাসরের নব রূপায়ণ। সহসা জাগে এক বিপত্তি—নব ব্রাহ্মণের ভিক্ষা পাত্র এগিয়ে আসে দীন ধনীমার দিকে—সকলে সচকিত, অগ্রজ রামকুমার শশব্যস্ত—বালককে সাবধান করে দেন নীচ জাতির কাছে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী বংশের আচার বিরোধী। কিন্তু দণ্ডীধারী, করধৃত ভিক্ষাপাত্র বালক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সে পূর্বে দীন পালকমাতাকে কথা দিয়েছে তাকেই করবে ভিক্ষামাতা।—সত্যরক্ষা ব্রাহ্মণের প্রথম কর্তব্য,—"সত্যই কলির তপস্যা"—শেষ পর্যন্ত দীনের আকুতিই হয় জয়ী। অশ্রু-রোমাঞ্চে প্রথম ভিক্ষাপাত্র ভরে ওঠে দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে। যাঁর কৃপায় দীন দরিদ্র আজ দরিদ্রনারায়ণ রূপে জাগ্রত দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত—দিকে দিকে, দেশে দেশে যাঁর সেবায়তন উঠেছে গড়ে, সেই দীন নারায়ণের জয় জয়কারে শুভ উপনয়ন বাসরের হয় পরিসমাপ্তি। এমনি দীনের পূজাই মহার্ঘ্য হয়েছিল ভগবান তথাগতের জীবনে—"একমাত্র বাস" যিনি ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুকের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষারূপে। ক্ষুদ্র ঘটনাই যে জীবনের নিরিখ।

কোন গ্রীক দার্শনিককে প্রশ্ন করা হয়,—শৈশবে আমাদের কি করা উচিৎ। তিনি উত্তর দেন,—যৌবনে আমাদের যেটি কর্তব্য তার পরিকল্পই শৈশবের কৃত্য—কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা,—শিশুই বয়স্কদের পিতা। দেবকুমার ঈশামসিকে দেখা যায় বাল্যেই ধর্মদানে ব্রতী…গদাধরের কৈশোরও সেই লীলায় গরগর। লাহা বাবুদের শ্রাদ্ধ-বাসর—পণ্ডিত সমাজে প্রমা, প্রমাণ ইত্যাদি শাস্ত্র বিচারের ধুম গেছে লেগে। একস্থানে এসে আর কোন মীমাংসা হয় না—শুধু বাক্‌বৈখরী হয়ে পড়ে—সহসা দেখা

গেল—মধ্যমণির মত শ্রাদ্ধ-মণ্ডপ আলো করে এসে দাঁড়ায় আমাদের সোনার কিশোর গদাধর। স্মিতহাস্তে সহজে দেয় মীমাংসা করে সমস্ত অনুপপত্তি—পণ্ডিত সমাজ হয় বিস্মিত—এত সহজে এমন জটিল প্রশ্নের এমন সুন্দর মীমাংসা, এই বালক কেমন করে পারে—মূক বিস্ময়ে তারা তাকিয়ে থাকে বালকের দিব্যমুখের দিকে আর পুষ্পবৃষ্টির মত ঝরে পড়ে আশীর্বচন···এমনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছিল বহুদিন আগে আর এক বিদ্বৎ সভা—যেদিন ভগবান ঈশামসি বালকবেশে পরাস্ত করেছিল পণ্ডিতদের গর্ব।

শিব-চতুর্দ্দশী—সারা বাংলার নরনারীর বুক নিঙরে সেদিন জেগেছে শশাঙ্কশেখর শিবশঙ্করের জয়গান···উপবাসখিন্ন ভক্তপ্রাণের সব আকুতিটুকু সেদিন একত্র হয়ে দেবাদিদেবের চরণে ধুতরা বিল্বার্ঘের মতই যেন স্থান পায়···আমাদের কিশোর গদাধরও সেদিন উপবাসক্লিষ্ট, দেহ-মনে শিবময়—সঙ্গে আছে সঙ্গী বয়স্যেরা। সহসা সংবাদ আসে সীতানাথ পাইনদের বাটীতে শিবযাত্রায় যার শিবের অংশ গ্রহণ করার কথা তার অসুস্থতায় সমস্ত অভিনয় পণ্ড হবার উপক্রম। সমবেত ভক্ত দর্শকের একান্ত ইচ্ছা যে গদাধর এ অংশটুকু গ্রহণ করে ; গদাধর তখন প্রথম প্রহরের পূজান্তে শিবধ্যানে তন্ময়। সকলের ইচ্ছায় সেদিন পূজকের আসন ছেড়ে পূজ্যের আসনে বসতে হয় গদাধরকে—সেদিন যাত্রা আসরে উৎসুখ উন্মুখ নয়নে সহসা এক অপরূপ দৃশ্য প্রকাশিত হল······ভাবময় বেপথু দেহে, জটাজটিল শিবসুন্দর কিশোর বেশে এসে উপস্থিত যাত্রার আসরে—টলমল অক্ষম চরণ—অতিসন্তর্পণে বয়স্যেরা আনে সঙ্গে করে—চকিতে জয়ধ্বনি জাগে শত কণ্ঠের···আর ভাবময় গদাধরের দেহছন্দ সমাধির নিস্তরঙ্গে হয়ে যায় নিশ্চল।···অভিনয় সদিন আর অভিনয় ছিল না···

ছয়

তিনি নিত্য—তাঁর লীলাও নিত্য, নিত্য আর চেতন···ধরার গোষ্ঠে কান্নাহাসি নিয়ে গড়াগড়ি না দিলে অধরা রাখালের মন ভরে না··· মার বুকে সোহাগ কাঁদন, সখা-সখীদের সঙ্গে নর্মলীলা—সাধকের শত দায়ে ধরা পড়া আর যোগক্ষেম বহন করা—কেন এই খেলা তাঁর? কেন—তার উত্তর সেই বিরাট শিশু দেয় না, সে শুধু খেলেই যায়·· উচ্ছল নীল যমুনায় বাঁশী আজও বাজে—শুধু অভিনয়ের পটভূমি পালটায়, সাজবেশও কিছু বদলায়···বেথেলহেমে মেষশিশু আর সখাসখী নিয়ে খেলা—সেই বৃন্দাবন-লীলায় ফেরার পালাই ত···নদীয়ায় সুরধুনীর বুকে নর্মলীলাও সেই একেরই খেলা···আবার এই সেদিন মাণিকরাজার বনাঙ্গনে সেই খেলাই সেই রাখাল খেলেছে···

যাত্রার পালাগান শুনতে যেটুকু সময়···বয়স্যদের নিয়ে হয় যাত্রার দল—মুহুর্মুহু কুহুলিত আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ মনোরম পটভূমিকা করে রচনা···উপরে নীলঢালা গগন, নীচে শ্যামা মেয়ের শ্যাম অঞ্চল, কাকচক্ষু জল নিয়ে টলটল করছে কালো দীঘি—এই রঙ্গভূমিতে আমাদের রঙ্গরাজের অভিনয় চলে নিত্য নিত্য, সেই যুগে যুগে চলে আসা লীলাই··· "চালকলা বাঁধা বিদ্যা" থাকে পড়ে। পণ্ডিত মহাশয়ের মাঝে মাঝে এসে আসরে দর্শক হয়ে আসাও হয়—পল্লীজননীরা ভরা কুম্ভ নিয়ে বনদেবীর মত অবসর করে নিষ্পলকে দেখে যান কৃষ্ণ-যাত্রা ক্ষণিকের জন্যে—চিনু শাঁখারী, প্রসন্ন দিদির মত দেব-আত্মাদের সজাগ চোখে ধরা পড়ে চতুর চূড়ামণির গোপন-লীলা—আনন্দ সঙ্কোচে কারো চলে গোপন পূজা অশ্রুর অভিষেকে—

পরিবর্তনেই জগতের বিলাস—জগতের মাধুর্য্য—দুঃখ আছে বলে সুখের বিলাস···রাতের কান্না মুছাতেই ত উষার এত আদর। লীলার পরিবর্তন হয় বলেই ভক্ত ভগবানের লীলা এত রসমধুর···লীলায় বিরহ-মিলন না থাকলে লীলাকজ্জল এত নিবিড় হয়ে জড়াতে পারত না ভগবানকে···

কামারপুরে এই দিব্যলীলায় একদিন নেমে এল মাথুর সন্ধ্যা...পূর্বে রামকুমার কলিকাতায় ঝামাপুকুর অঞ্চলে এক চতুষ্পাঠি স্থাপন করেন সংসারে আয়ের কিছু সুবিধা হবে এই আশায়।—কনিষ্ঠের পড়াশুনা পাঠশালায় আর কুলাবেনা আর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তার এখন প্রস্তুতির প্রয়োজন, সে চিন্তাতেও আমাদের গদাধরকে কলিকাতায় নিয়ে যাওয়া স্থির করেন অগ্রজ রামকুমার। শিশুর মত হাস্যে লাস্যে, চির শিশু গদাধরের তখন সপ্তদশ বর্ষ গেছে কেটে পল্লীমায়ের নর্মগেহে......

নওল কিশোর যেদিন বৃন্দাবনের প্রেমের হাট ভেঙ্গে চলে যান বৃহত্তর কল্যাণে, সেদিনের কথা মহাজন পদাবলীতে অশ্রু-সরসে আছে লেখা—আজও সে বেদন-লীলা ভুলতে পারেনি জগৎ—আজও ভক্ত চক্ষে অশ্রুর বন্যা জাগে সেই বিদায় গোধুলি স্মরণ করে—শত শত কাব্য কাহিনী হয়েছে রচনা—তবুত ফুরায় না বিরহ মাথুর...

......যে পরম লগ্নগুলি আনন্দ লহরী তুলে বয়ে যায় অতীতে অসীমে, তাদের মর্য্যাদা বেড়ে ওঠে তখনি যখন আর তাদের ফিরে পাবার থাকে না উপায়—তাই স্মৃতির তীর্থই আমাদের পরমতীর্থ—তাই ব্যথার বুকেই নিত্য লীলা করেন ব্যথাহারী আনন্দলীলার স্মৃতিতে।—স্বপ্নঘেরা স্মৃতিই তাঁর নিত্য অচলায়তন...কামারপুরে আনন্দের হাট আজ বেদনাতুর—লীলা কিশোরের শত স্মৃতি মুখরিত নর্মগেহ আজ বিষাদ-খিন্ন—কুন্তলিত মাণিকরাজার বন পিছনে থাকে পড়ে, কাকচক্ষু হালদার দীঘি, যার পাড়ে রমণীবেশে চরণ-চিহ্ন এঁকে চলে গেছেন নূপুরিত পায়ে কত কতদিন; অঝোরে ঝরে সখাসখীদের ব্যথাতুর আঁখি, ম্লান রাখালের খেলা গেহের বাঁশী আজ নীরব, শ্যাম বনাঙ্গনে কত যে লীলা সমাধি, কত যে গোপন মধুর অভিনয়—কত যে বুক ভরা—দুখ হরা চপলতা,—কত চন্দিম রজনীর লীলা—কত বর্ষণ মুখর আম্রকাননের গোধূলী... ভুলিয়ে যাবার এই লগ্নে বাঁধভাঙ্গাঅশ্রু গহন বুকে হয়ে ওঠে অসহ...

ক্ষণিকের নর্মলীলা, পূরবীর সুরে যায় থেমে তবু জেগে থাকে মনের কোণে, শত কান্নার আকুতি চির চিরদিন—

জননী চন্দ্রার অঞ্চল যায় ভিজে, ধনীর দীন বুকের আকুতি কোন

সান্ত্বনাই মানতে পারে না—বর্ষণ নত সন্ধ্যার মত দাঁড়িয়ে থাকে পল্লী-জননীরা—জননীর চরণ বন্দনা করে, সবার কাছে বিদায় নিয়ে সখাদের বেদন আলিঙ্গনে উচ্ছল করে, অগ্রজের সঙ্গে ধীর গম্ভীর পায়ে জগৎ উদ্ধার ব্রতে চলেছেন গদাধর—অনাগত ভবিষ্যতের পানে; সেদিন অরুণ প্রেমময় দুটি চক্ষুও কি সরস হয়নি, প্রাণের ইতিহাস এতে দেয় না সায়।

সেদিন গম্যস্থানে বাজেনি কোন মঙ্গলশঙ্খ, জাগেনি কোন হর্ষোচ্ছ্বাস—শুধু পল্লী জননীর বুক ভেঙ্গেই এই নবায়ন হয়েছিল সুরু···নারায়ণের নিত্য বৃন্দাবন যে বিদুরেরি দীন হৃদয়, যুগে যুগে···

কামারপুকুরে জন্মস্থলী ঢেঁকিশালা

সাত

নিথর গহীন রাত্রি...কলিকাতার জানবাজার অঞ্চলে এক বৃহৎ পুরী, জনমানব সঙ্কুল পুরী আজ নিরন্ধ্র নিদ্রায় চেতনাহারা... সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত গরিমা অবসান করে যে নিশা ধরণীর বুকে আসে নেমে, সে নিশা রচনা করে দেবতার বিলাস রাজ্য—এই লীলাসুষুপ্তির অন্তরালে চলে ভক্ত-ভগবানের দিব্যলীলা...অহং যাকে দিনের আলোয় রাখে ঠেলে, সুষুপ্তির নিস্তরঙ্গ রাজ্যে তাকে পাওয়া যায় সহজে—কৃপাতে...

সুষুপ্তির দেউল খুলে দেবতা দেন দেখা...ভক্ত ও ভগবানের এই লীলার মাঝে থাকে যে ব্যবধান—সে ব্যবধান যেন গভীর রাতের গোপনে পাওয়া মার চুম্বন পুলক—ভুলো ছেলের জন্যে মার দরদ বেশী—তাই সুষুপ্তির এত মোহজাল—শাস্ত্র একে ব্রহ্মানুভূতির ক্ষণিক প্রকাশ বলে স্বীকার করেছেন...

এমনি এক মোহমদির দিব্য নিশা—রাণী রাসমণি শয়ন নিষন্ন। সহসা দেখেন—একি ! মা ভবানী ভবভয়হারিণী ভবতারিণী, দিব্যরূপে আলোয় আলো করে—তাঁর শিয়রে—হস্তে বরাভয়, দীপ্ত নয়নে করুণার প্রস্রবণ...ধীর ললিত কণ্ঠে জাগে যুগের জাগরণী,—ভাগীরথি তীরে আমার

চকিতে সুখস্বপ্ন যায় ভেঙে—একি স্বপ্ন না সত্য—কল্যাণী ভাবেন...যে কল্যাণশক্তি নিয়ে তখনকার বাংলায় একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, দীন-দরিদ্রের গৃহে জন্ম নিয়ে দীন দরিদ্রের কাছে যাঁর দক্ষিণাহস্ত চিরমুক্ত ছিল,—যাঁর দৃঢ় হস্ত প্রয়োজন হলে কোম্পানী বাহাদুরকেও তটস্থ করতে ইতস্ততঃ করত না, সেই রাণীর কাছে এ প্রত্যাদেশ যে কি, তার পরিচয় বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণ দেউল হয়ে শোভা পাচ্ছে আজও—। মার চিহ্নিত নায়িকা পরদিন হতেই শুরু করে দেন আয়োজন—স্মৃতি থেকে মুছে যায় বহু আশাপোষিত বারাণসীর তীর্থ-পথ—মার জন্য নব-বারাণসীর প্রতিষ্ঠা এখন থেকে তাঁর জীবনের স্বপ্নসাধ হয়ে দাঁড়ায়...

গঙ্গার পূর্বকূলে হেষ্টি সাহেবের কূর্মাকৃতি ঘাট বিঘা ভূমিখণ্ড হল কেনা বহু আয়াসে। দশবৎসর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বিরাট দেউল গঙ্গার পূর্বকূল আলো করে উঠে দাঁড়াল—আর দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় কেনা দিনাজপুরের শালবাড়ী পরগণা দেবসেবায় নির্দিষ্ট হয়ে রইল।

দেবী রাসমণির দিন কাটে আকুল উৎকণ্ঠায় শুভ লগ্নের প্রতীক্ষায়—ইতিমধ্যে মার অন্নভোগ শাস্ত্রসঙ্গত না হওয়ায় এক বিপত্তি হয় উপস্থিত। পরিশেষে ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ঝামাপুকুর টোল হতে নির্দেশ দেন রাণী যদি ঐ সম্পত্তি গুরুকে দান করেন তবে শাস্ত্রমতে দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া সম্ভব।—

এদিকে রাণী কৃচ্ছ্রসাধনায় দিন গুনছেন,—শাস্ত্রমতে পুণ্যাহ পেতে হয় দেরী—দিব্য সে এক রজনী, রাণী স্বপ্নে দেখেন মা ভবতারিণী যেন আকুল হয়ে উঠেছেন প্রতিষ্ঠার লগ্ন চেয়ে—ভক্তও আকুল, ভগবানও আকুল—দুহুঁ মুখ চাহি দুহুঁ আজি কান্দে।

উদ্বোধিতা রাসমণি পরবর্তী স্নানযাত্রার দিন বিষ্ণুপর্বাহেই দেবী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন…জননী যেন আর পারেন না অপেক্ষা করতে—বিশেষ সন্তান যে দ্বারে উপস্থিত—যে দিব্যলীলায় দিক দেশ যাবে ছেয়ে, তার পুণ্যাহ যে সমাগত—লীলার আকুলতা, এ যে তাঁরি দায়—।

মহাসমারোহের সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে সাঙ্গ; এদিকে মা ভবতারিণীর পূজক যায় না পাওয়া। কাতরা রাণী তখন রামকুমারকে ঐ ভার নিতে সাগ্রহ সম্ভ্রমে জানান নিবেদন। অশূদ্র-প্রতিগ্রাহীর বংশে এরূপ কার্য্য অশাস্ত্রীয়, দেবীর প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক আশঙ্কায় রামকুমার কেবল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থায় হলেন অগ্রসর—আর কৈবর্ত্তের পূজকপদে কেহ অগ্রসর না হওয়ায় রামকুমারকে বাধ্য হয়ে দেবীর পূজকের পদ করতে হয় গ্রহণ। বন্ধনহীন সন্তানের বাঁধবার এই হল প্রথম পৈঠা।

…প্রতিষ্ঠার দিন…তখনকার কলিকাতার নামকরা ধনী রাণী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা এক মহামহোৎসবের দিন হয়েছিল, একথা না বললেও

চলে···বিশেষ প্রত্যাদেশিত রাণী এখন দিব্যশক্তিতে শক্তিময়ী—তিনি যে মার চিহ্নিতা কর্মী—অষ্টনায়িকার মধ্যে প্রধান নায়িকা···ভারতের তথা জগতের ইতিহাসে বারশো বাষট্টি সালের আঠারই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিন এক অবিস্মরণীয় দিন।

মার ডাকে ছেলের কি দূরে থাকা হয়—রামকুমারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গদাধরও আসেন চলে,—দক্ষিণেশ্বরের দেবারামে। মার মুখে ফোটে লীলার হাসি—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল···ঝামাপুকুরের লীলার হয় অবসান—কিন্তু কেম করে সেও এক লীলা পর্য্যায়—শ্রীঠাকুর রাসমণির অন্ন গ্রহণ করবেন না ঠিক করেছেন, এদিকে রামকুমার বুঝতে পারেন দৈব ইচ্ছা। একদিন ধরে নিয়ে যান্ মার চরণান্তিকে—বলেন মার কি ইচ্ছা আয় দেখি—মার সামনে দুটি বিল্ব পাতায় জয় পত্র করা হল, সেদিন মার কাছে পুত্রের হ'ল পরাজয়। মার প্রসাদ মার ছেলে না খেলে মা কি প্রসন্ন হ'তে পারেন।
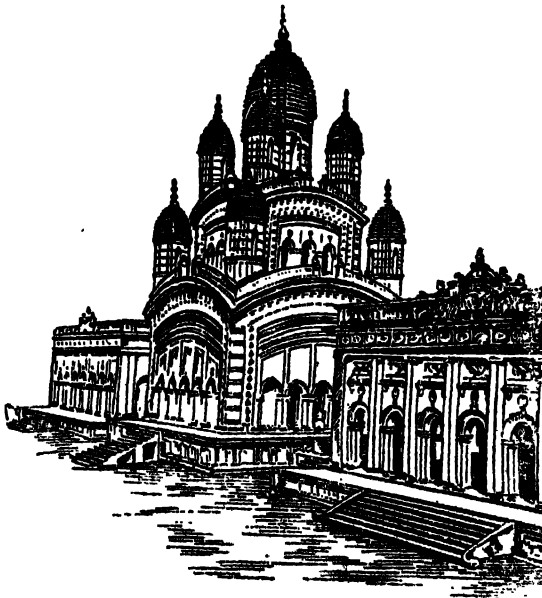
দক্ষিণেশ্বর

আট

এখন আমরা আর চন্দ্রাত্নলালকে গদাধর বলব না। এখন তাঁর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার দিন সমাগত। এখন থেকে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর... মার চরণান্তিকে সহস্রদলে বিলাসের দিন যে এসে পড়েছে! জননী পুত্রকে কোলের কাছে নিলেন টেনে—কিন্তু পুত্র যে চির আপন ভোলা, সংসার বুদ্ধি রহিত চিরশিশু—নাবালক, তাকে দেখবার অছি যে চাই...এলেন হৃদয়রাম, শ্রীঠাকুরের ভাগিনেয়, বলিষ্ঠ—সুন্দর যুবক—শ্রীঠাকুরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও শ্রীঠাকুরের সর্বপ্রকার ভার গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র...লীলার পাত্র ওঠে ভরে।

দাসত্ব স্বীকারে চিরদিনের অপ্রীতি...যেদিন নিরঞ্জন, পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, চাকরী স্বীকার করেন, শ্রীঠাকুর বলেছিলেন,—যদি মার জন্য চাকরী না করতিস তাহলে তোকে ছুঁতে পারতুম না। অবশ্য সাধারণের প্রতি তাঁর এ ভাব কখনই সম্ভব নয়। সংসারে থেকে কেউ বসে থাকলে তাকে কুমড়োকাটা-বট-ঠাকুরের গোত্র ত্যাগ করে কিছু আয়ের চেষ্টা করতেই বলতেন...

প্রথম দর্শনের একটা গভীরতা আছে, একটা মোহ আছে জীবনের প্রথম স্মৃতির মত। অবচেতন মনের বিলাসই হোক আর পূর্বজন্মের স্মৃতির সংস্কারই হোক, প্রথম দর্শনেই ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্দিষ্ট হয়ে যায়। মথুরা-মোহন, রাণীর জামাতা—শ্রীঠাকুরের প্রতি এমনি এক আকর্ষণ অনুভব করেন প্রথম দর্শনেই – প্রথম দর্শনের দিন থেকেই মথুরামোহন ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে স্থায়ীভাবে রাখার জন্য এক অব্যক্ত আকুলতা অনুভব করেন...শ্রীঠাকুর কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার, বিশেষ কৈবর্ত্ত্যের দাসত্ব—কোন মতে মেনেই নিতে পারেন না। ফলে ভক্ত ভগবানের মধ্যে এক বিচিত্র লীলার সৃষ্টি হয়—মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম চারিমাস এমনি করেই যায় কেটে...ভক্তিমান মথুর শ্রীঠাকুরকে ধরেও যেন পারেন না ধরতে—শেষে একদিন মথুরামোহনের একান্ত ইচ্ছায় শ্রীঠাকুর মা ভাবতারিণীর বেশকারীর পদ গ্রহণ করেন আর

হৃদয়কে করে নেন তাঁর সহকারী···জননীর মুখে ফোটে এক রঙ্গের হাসি—ত্রিকাল দীপ্তির হাসি···

পূজক ক্ষেত্রনাথ চলেছেন অতি সন্তর্পণে—হস্তে রাধাকান্ত বিগ্রহ, শয়ন-মন্দির হতে পূজামণ্ডপের পথে—শ্বেত পাথরের মণ্ডপ···চলার পথই পিছল, আর তার চেয়েও পিছল নিয়তির পথরেখা···সহসা ক্ষেত্রনাথ গেলেন পড়ে—দেব বিগ্রহ হল ভগ্ন—বিনামেঘে বজ্রাঘাত···নন্দোৎসবের মধ্যাহ্নে—আনন্দসারঙ্গে চকিতে নেমে এল সন্ধ্যার পূরবী···দক্ষিণেশ্বরের পুরীতে সহসা সহস্র প্রদীপ যেন ম্লান হয়ে গেল।

রাণীর কাছে সংবাদ গেল। কি করা উচিত—প্রধান পণ্ডিতদের বিচার সভা হল ডাকা—শাস্ত্র নির্ভরে সিদ্ধান্ত হল, ভগ্নমূর্ত্তির গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন··· মথুরামোহনের মন এতে দেয় না সাড়া। সহসা চোখে পড়ে যায় আলথাল ভাববিভোরতনু শ্রীঠাকুরকে—কাছে গিয়ে সব নিবেদন করা হল—ভাবেই শ্রীঠাকুর দেন উত্তর,—রাণীর জামাই যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলে তবে কি তাকে ফেলে দিতে হবে—সত্য—সহজ সত্য—সহজ সত্যের সহজ প্রকাশে আনন্দ-মথিত অন্তরের সাড়া পান মথুরামোহন, আর ব্যবস্থাও হয় সহজেই—দেববিগ্রহের সংস্কারের ব্যবস্থা শ্রীঠাকুরই নেন স্বহস্তে। এ কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর আগেই ছিল—প্রাণের পূজায় দেবতা যেখানে অন্তরতম চির জাগ্রত ধন, শুষ্ক শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সেখানে পায় না ঠাঁই। অন্তরের অন্তরতমকে চেনাতে শাস্ত্রের শস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন ত নাই।

মায়ের ছেলে এখন মায়ের কাছে—ছেলে যেমন মাকে পেয়ে মার মুখপানে চেয়ে থাকে আপন ভোলা হয়ে, তেমনি চিরশিশু ঠাকুর কখন মার চরণ-নিকষে আত্মনিবেদনরত—কখন মা-মা করে চোখের জলে বুক যায় ভিজে, কখন বা নির্জনে—সন্ধ্যায়—রজনীর গহীনে—পঞ্চবটীর তলে ধ্যাননিমগ্ন—কখন বা জগৎ ভুলে গান ধরেছেন,—কোন হিসাবে হরহৃদে—আর বাঁধভাঙ্গা অশ্রুর গঙ্গা হচ্ছে উছলিত···এমনি দুকুল ভাঙ্গা ব্যথা না হলে বুঝি মাকে যায় না পাওয়া···তাই পরবর্তীকালে শ্রীঠাকুরের সহজ পূজার মন্ত্র,—চাই ব্যাকুলতা।

আবার শাস্ত্রের মর্যাদাও ত রাখা চাই—দীক্ষা হয়নি, তাই দীক্ষার

হয় ব্যবস্থা—অগ্রজ রামকুমার এখন ধীরে অক্ষম হয়ে পড়েছেন…মার পূজার ভার নিতে হবে—শক্তিসাধক শ্রীযুত কেনারাম ভট্টাচার্য্যের কাছে তাই দীক্ষার ব্যবস্থা হল…শাস্ত্রের ব্যবস্থা নষ্ট করতে ত অবতারদের আসা নয়—তাই যুগে যুগে তাঁরা গুরুর চরণে করেছেন নিজেদের নত…তাই দেখি মহাপ্রভুর আহুতি ঈশ্বরপুরীর কাছে, তাই ঈশামসিকে দেখি নতশিরে দাঁড়িয়েছেন জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্টের চরণ নিকষে, শ্রীঠাকুরও একাধিক গুরুর চরণে জানিয়েছেন নতি—শাস্ত্রকে করেছেন সঞ্জীবিত।

মার ছেলেকে মার কাছে দিয়ে, মার পূজায় নিবিষ্ট দেখে রামকুমার একদিন সহসা নিলেন বিদায়—পিতৃতুল্য অগ্রজের দেহাবসানে শ্রীঠাকুর যেন আবার হলেন পিতৃহারা—দেহ ধারণের ব্যথা নিতেই ত দেহে আসা, না হলে ব্যথাহারী হবেন কি করে? বাংলার বারশত তেতাল্লিশ সালের এই ঘটনা…

পঞ্চবটী

নয়

এইবার ঠাকুর নিলেন জ্বলবার মন্ত্র। আকুল তৃষ্ণা নিয়ে এইবার সুরু হল তপস্যার অতলে ডুব দেওয়া...দিশাহারা প্রাণে জেগেছে মা-মা-ডাক...জাতি, কুল, শীলাদি অষ্টপাশ মুক্ত হয়ে চলে জপ ধ্যানাদি—কখন উন্মত্তের মত কালীবাড়ীর কাঙ্গাল নারায়ণদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ, কখন টাকা মাটি সাধনে গঙ্গায় অর্ঘ নিক্ষেপ, কখন উপবীত দেহাবরণাদি ত্যাগে শিবের মত ধ্যান নিরত। তখন দেহ মনের তপস্যা নিয়ে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত চলেছিলেন ছুটে অসীমের টানে—অশান্ত—অতন্দ্র—অবুঝ।

শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের কথা,—মার দেখা পেলাম না বলে বুকে তখন অসহ্য যন্ত্রণা, সজোরে গামছা নিঙড়ানো করে হৃদয়টাকে কে যেন নিঙড়াচ্ছে —অস্থির হয়ে ভাবলাম তবে আর জীবনে আবশ্যক নাই,...সহসা মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি তার উপর পড়লো; উন্মত্তের মত ছুটে ধরতেই মার দর্শন পেলাম...ঘর দ্বার মন্দির সব মিলিয়ে গেল—কোথাও যেন কিছুই নাই, আর দেখি কি এক অসীম চেতন জ্যোতিঃ সমুদ্র...সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম। কোন দিক দিয়ে সেদিন ও তারপরদিন গিয়েছে তার কিছুই জানতে পারি নাই... (লীলাপ্রসঙ্গ)

শ্রীঠাকুর বলতেন,—ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়,—সতীর পতির প্রতি, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি, আর মার সন্তানের প্রতি টান, এই তিন টান এক হলে তাঁকে পাওয়া যায়। ব্যাকুলতার সাধন যে কি নিজের জীবনেই বিশেষ করে দেখিয়ে গেছেন। নিজের মুখে বলেছেন,—তখন শরীরের দিকে মন না থাকায় চুল সব বড় হয়ে, ধূলামাখা হয়ে, জটা পাকিয়ে গিয়েছিল—আর ধ্যানের গভীরতায় পাখীরা এসে মাথায় বসত—চেতন থাকত না...সময়ে সময়ে মার অদর্শনের ব্যথায় মাটিতে মাথা কুটে মুখ ঘসে এমন প্রার্থনা করতাম যে রক্ত পড়ত—আর সন্ধ্যা হলে সারাদিনের জপ ধ্যান প্রার্থনা ক্লান্ত শরীরে গঙ্গাকূলে লুটিয়ে পড়া; কাতর ক্রন্দনে দিক ভরে যেত,—মা আর একটা দিন যে

চলে গেল, এখনও দেখা দিলি না…লোকে ভাবত ছোট ঠাকুরের পেটে শূলব্যথা হয়েছে।

শ্রীঠাকুরের কথায় জীবকে ভক্তি প্রেম শেখাতেই অবতারের আসা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনেও দেখা যায় চিরবিরহীর প্রাণ নিয়ে, কি আকুল কান্নাই কেঁদে গেলেন সারা জীবন—ভগবদ্বিরহে চোখে নির্ঝরের মত ঝরত অঝোর ধারা…শ্রীঠাকুরের এখন থেকে মার নিরন্তর দর্শনের জন্যে এক আকুল ক্রন্দন বুক নিঙরে উঠত জেগে, সব সময়ে সে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সময়ে সময়ে লুটিয়ে পড়তেন সম্বিৎহারা হয়ে। বুক ফাটা ক্রন্দনে লোক যেতো দাঁড়িয়ে, তাদের সব উপহাস পরিহাস মরুমায়া বলে মনে হত—আর এই লুটিয়ে পড়া অসহ বেদনায় যখন এসে দাঁড়াতেন জননী ভবতারিণী—স্মিতহাস্যে আলোয় আলো করে…ব্যথার অন্ধকারে জাগত শত চাঁদের বিলাস—আর স্বর্গের মাধুরী ঝরা বাণীতে দিতেন সান্ত্বনা—দিতেন শিক্ষা…কি সোহাগ হাসি জাগত ছেলের মুখে, কি যে তৃপ্তি জাগত সারা অঙ্গের পুলকে—কে বলবে।

—রোস্ রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি তারপর খাস্…সহসা মন্দির মুখরিত হয়ে ওঠে, সকলে ছুটে গিয়ে দেখে শ্রীঠাকুরের অদ্ভুত পূজা, উন্মত্তের পূজা—শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে জগৎ তখন ছায়ার জগৎ…তখন তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে মার অরূপরূপ—চিন্ময় মুখে ফুটে উঠেছে ভুবন ভুলানো হাসি—কখন মার মন্দির সোপানে উঠত মার কমলফোটা চরণের ঝুমঝুম নুপূর—কখন দেখছেন মন্দিরের দ্বিতল অলিন্দে আকুল কেশ এলিয়ে দাঁড়িয়েছেন লীলা চঞ্চলা—কখন হাত দিয়ে দেখছেন নিশ্বাস স্পন্দিত শ্রীমুখ। কখন বা উন্মত্তের মত খুঁজছেন মন্দির দেউলে শ্রীঅঙ্গের ছায়া…আবার অস্ফূটে মার সঙ্গে চলেছে কত রঙ্গ কত পরিহাস কখন বা মার কাছে মার খাটে হয় শোওয়া…এমনি দিব্যলীলায় কাটে অপূর্ব দিনগুলি, ততোধিক অপূর্ব রাত্রির ক্ষণ। মার প্রথম দর্শনের পর কিছুদিন কোন কাজই হয় না সম্ভব…পূজাদি ত দূরের কথা। অবুঝ হৃদয়রাম কবিরাজী চিকিৎসার করেন ব্যবস্থা—কিন্তু ভবরোগ বৈদ্যের চিকিৎসার কোন নিদানেই নেই।

ভাবময় ঠাকুর মার নাটমন্দিরে যে ভৈরব মূর্তি আছে তাকে দেখিয়ে মনকে ঐরূপ নিস্পন্দে ধ্যান করতে বলতেন—আর সত্যাই দেখতেন ঐরূপ ভৈরব কাছে বসে আছেন, আর শূল হাতে ভয় দেখিয়ে নিবিষ্টে বলছেন ধ্যান করতে...এমনি আবার পূজায় বসে যখম 'রং' ইত্যাদি মন্ত্রে দিগবন্ধন করতেন তখন সত্যাই দেখতেন—যেন অগ্নিময় প্রাচীরের সৃষ্টি হয়ে গেছে চারিদিকে...আবার শরীরের মধ্যে পাপ পুরুষ বিনষ্ট হয়ে গেল, চিন্তা করা মাত্র দেখলেন মাতালের মত এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেহ হতে বেরিয়ে গেল, শূল হাতে আর এক সন্ন্যাসী দেহ থেকে বাইরে এসে তাকে করল বিনাশ...। ব্রহ্মের কল্পনায় জগৎ সৃষ্টি—এটি কল্পকথাই নয়, এই তার প্রমাণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর

দশ

অদ্ভুত অনুভব—ধ্যানে বসেই কে যেন ভিতর থেকে ঘট্‌ঘট্‌ করে একটার পর একটা গ্রন্থি বন্ধ করে দিচ্ছে—ধ্যানান্তে আবার ঐরকম করে সব যেত খুলে—কখন বা কুয়াসার মত চিৎজ্যোতিতে চারিদিক হত জ্যোতির্ময়…হয়ত এই শিক্ষাই আমাদের দিলেন—ধ্যানের নির্বিকল্পে শরীর এমনি নিশ্চল হয়—শুধু মনই হয় না।

বৈধী পূজা আর অনুরাগের পূজা—অনুরাগের পূজাই প্রাণের পূজা—শাস্ত্র, মন্ত্র এখানে মিথ্যাচার। বহির্মুখের মনে হবে এ পূজা উন্মত্তের পূজা …শ্রীঠাকুর জবা বিল্বার্ঘ্য, মার চরণে দেবার আগেই দিলেন নিজের মাথায়, নিজের চরণে—অন্নাদি নিবেদন করতে মার মুখেই দিলেন ধরে—হয়ত বা নিজেই খেতে সুরু করলেন—আর সেই উচ্ছিষ্টই মাকে করলেন নিবেদন… মার সঙ্গে চুপে চুপে কথা—কখনও বা মার চিবুক ধরে রঙ্গ-পরিহাস—এমন কি নৃত্যও চলেছে—এ ত পূজা নয়, মায়ে-ছেলেতে খেলা। এ যেন অসীম সাগরের সঙ্গে অসীম গগনের উচ্ছল বিলাস।—যখন অবুঝ শিশু মার মুখে নিজের মুখ থেকেই খাবার দেয় ধরে কোন প্রশ্নই ত জাগে না মার দিক থেকে, না কারো দিক থেকেই…আপন হতে আপন মাকে কেউ আপন করে নেয় না তাই সাধারণে শ্রীঠাকুরের লীলার পায় না খেই। সুরু হয় কোলাহল—কিন্তু ভক্ত মথুর নিজে এসে সমস্ত দেখেন—এই ত পূজা—সত্যিকার পূজা। রাণীকে গিয়ে সংবাদ দিলেন অদ্ভুত পূজকের আরো অদ্ভুত এই পূজার কাহিনী—আর কর্মচারীদের দেন সাবধান করে যেন কোনরূপ বাধা না দেওয়া হয় এই সহজ পূজায়।

এদিকে শ্রীঠাকুর দিন দিন ভাবসায়রের গহনে ডুবে আর যেন উঠতেই চান না। নরেন্দ্রকে যেমন পরে বলতেন,—মনে কর এক খুলি রস রয়েছে, তুই কোথায় বসে খাবি? নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান, উত্তর দেন,—কেন আড়ায় বসে খাব, নইলে যে ডুবে যাব…ঠাকুর বলেন,—তুই ত ভারি বোকা। এ যে অমৃত সাগর; এতে ডুবলে মানুষ মরে না অমর হয়…শ্রীঠাকুরও এই অমৃত সাগরে ডুব ডুব করে আর যেন উঠতেই চাইতেন না। পূজাদি আর হয়ে ওঠে না—পূজার ভার নিতে হয় হৃদয়রামকে।

সাধনার সুরুতেই শ্রীঠাকুরের দেব অঙ্গে হল জ্বালা, এক মালসা আগুন বুকের ভিতর দিলে যেমন হয়—পঞ্চতপার এই জ্বালায় ঠাকুর গঙ্গারজলে শ্রীঅঙ্গ ডুবিয়ে তিন চার ঘণ্টাতেও পেতেন না কোন স্বস্তি। আবার মার ক্ষণিকের অদর্শনেও অসহ ব্যথায় আছাড় খেয়ে মুখ ঘসে হতেন অবুঝ আকুল, দেহ থাকা হয়ে পড়ত দায়। কিন্তু মার দর্শন এখন অবাধ হওয়ায় এভাব বেশীক্ষণ থাকতে পেত না—সৌম্যাৎ সৌম্যতরা রূপে এসে মা দিতেন আশ্বাস— দিতেন সান্ত্বনা, সব জ্বালা যেত জুড়িয়ে যুগে যুগে এমন ছেলে পাওয়া যে ভার...

এই সময় শ্রীঠাকুর বিধিবৎ পূজায় হয়ে পড়েন অক্ষম, মার ইচ্ছায় খুল্লতাত পুত্র শ্রীরামতারক চট্টোপাধ্যায দক্ষিণেশ্বরে এসে পড়েন, পূজার আর ভাবনা থাকে না। এ ঘটনা আঠারোশোআঠান্ন খৃষ্টাব্দের। এঁকেই শ্রীঠাকুর হলধারী বলে ডাকতেন।

শ্রীঠাকুর বলতেন,—নাবালকের অছি এসে জোটে। পরমহংস ত বালক, বালকেব মা চাই না?...মা আমি তোর মুখ্যু ছেলে, যা শেখাবার তুই শিখিয়ে দে..তাই এখন থেকে শ্রীঠাকুরের সাধনা-বিলাস চলে মার ইঙ্গিতে—জগজ্জননীর পাদপীঠেই ত জগৎগুরুর পাঠ।

...মার অবাধ দর্শনেব পর মার ইঙ্গিতেই শ্রীঠাকুর এখন হনুমানের দাস্যভাব সাধনে হলেন ব্রতী। ভক্তরাজ মহাবীরের চিন্তায় এখন আপনহারা। তাঁরি মত ব্যবহার-·লোকচক্ষে সেত উন্মত্তের আচরণ। এমনি দাস্য সাধনে দিন যায়—সহসা একদিন দেখেন, ধ্যান চিন্তা কিছু না করেই দেখেন, জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যবর্তী এক মাতৃমূর্তি—পঞ্চবটীতল আলোয় আলো করে আসছেন—প্রেমে, করুণায়, ক্ষমা, তপস্যায় মূর্ত হয়েও যেন অমূর্ত—অবাক বিস্ময়ে শ্রীঠাকুর থাকেন চেয়ে- চকিতে একটি হনুমান এসে জানায় শরণাগতির নতি...অন্তর মথিত করে ধ্বনিত হয়— ইনিই সীতা— রামময় জীবিতা, সহিষ্ণুতার বেদনার মূর্ত বিগ্রহ, মা জানকী—আর প্রসাদ প্রসন্ন নয়নে নিকটে এসে শ্রীঠাকুরের বরদেহে মিলিয়ে...দাস্য সাধনের শেষ কথা—ভক্ত ভগবান অভেদ--সে মা নিজেই গেলেন দিয়ে...জ্বলবার মন্ত্র নিয়ে আসেন অবতার —তাই কি এই অভিজ্ঞতা, সাধনার পূর্বাশায়...

এগারো

সেদিন গঙ্গায় দুকূল উছল বান—সহসা ভক্তাভাবী মালী আনন্দ কলরবে জানায়—জোয়ারে ভেসে এসেছে পঞ্চবটীর বেড়া দেবার সব কিছু… কিছুদিন আগে শ্রীঠাকুর একটি অশ্বত্থের চারা লাগান নিজের হাতে আর হৃদয়রামকে দিয়ে বট, আমলকী, বেল আর অশোকের চারাও দেন লাগিয়ে। উদ্দেশ্য পঞ্চবটীর ছায়ার গহিনে নিশ্চিন্তে ধ্যানে থাকবেন ডুবে। বেড়ার ছিল প্রয়োজন, গাছগুলি বাঁচাতে হবে। সহসা তরঙ্গময়ী গঙ্গাই দেন এনে গরানের খুঁটি, দড়ি, কাটারী সব কিছু…এই যোগক্ষেম তিনি বারবারই বহন করে এসেছেন ভক্তের জন্যে। শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর বরানগরের ভূতের বাড়ীতে জড় হয়েছেন সন্নাসীর দল—দানার দল—তপস্যার সমিধে আপনহারা—সহসা স্বামীপাদ বলেন,—আজ আর কেউ ভিক্ষেয় বেরুব না, দেখি তিনি আমাদের দেখেন কি-না। এর পর কীর্তনানন্দে যান মেতে। সারাদিন যায়—জোটে না দুটি মুঠি অন্নও রাত্রির কতকটা গেছে পার হযে সহসা দুয়ারে পড়ে আঘাত। স্বামীপাদ বলেন,—ওপর থেকে দেখ্, হাতে যদি কিছু থাকে তবেই খুলবি দরজা দেখা যায় নিকটেই লালাবাবুর গোপালবাড়ী, সেখান থেকে এসেছে প্রসাদ। জয়ধ্বনি পড়ে যায় নবীন সন্ন্যাসীর দলে। আরো পরের কথা ঝুসীতে অভেদ স্বামীপাদ গেছেন, পরিব্রজ্যাপর্বে। বসে আছেন শ্রীঠাকুরের কৃপার উপর নির্ভর করে। বর্ষণসিক্ত দিনান্ত। সহসা এসে পড়ে আহারের উপায়ন অতি অতর্কিতে। বিবেক স্বামীপাদের হাথ্‌রাস প্রব্রজ্যায়ও এমনি এক ঘটনাই ঘটে। তৃষ্ণার্ত, ক্ষুৎক্ষাম, স্বামীপাদ আছেন বসে বৃক্ষমূলে—সহসা ছুটে আসে হালুইকর। হাতে আহার্য্য সম্পুট,—দৈব প্রেরণাতেই এসে পড়ে সে। এমনি কত কত দিন। আজ শ্রীঠাকুরের পূজা পর্যায়ে কোটী কোটী টাকা ধূলিমুষ্টির মত এসে পড়ছে। যোগ-ক্ষেমের পাত্র কানায় কানায় উঠেছে ভরে। ভক্তের যোগক্ষেম ভগবান বহন করেন কিন্তু ভগবানের যোগক্ষেম কে বহন করবে—তাই বোধহয়

এবার অন্য ব্যবস্থা হয়। তাই ভক্তাভারীই এ যুগের ভগবানের প্রথম যোগক্ষেমধারী।...যাই হোক প্রচ্ছায় পঞ্চবটীতে নিরন্ধ্র ধ্যানে ঠাকুর যান ডুবে—যেন জগতের স্পন্দন হয়ে যায় স্তিমিত।

শ্রীঠাকুরের কথা,—ফুল ফুটলে ভ্রমর এসে আপনি জুটবে। সাধুদের তীর্থ পথে দিশা-জঙ্গল আর অন্নপানির ব্যবস্থা না হলে চলে না! দক্ষিণেশ্বরের এই মহাতীর্থে ঐ দুটির অভাব ছিল না কোন দিনই, তাই জগন্নাথ আর সঙ্গম তীর্থের সন্ত-পথিকদের ডেরা হয়ে পড়েছিল এই দক্ষিণেশ্বর। ভাল ভাল সাধুদের চরণচিহ্নে আরো মহনীয় হযে উঠেছিল এই পরম স্থান। আর সাধুর রাজা ঠাকুরও এঁদের সঙ্গে নানা আলাপে শাস্ত্র মীমাংসায় গড়ে তোলেন এক যুগান্তরী ভাব-গঙ্গা।

সেদিন সাধনা-সাগর-সঞ্চারী শ্রীঠাকুর আছেন বসে, সহসা মুখ দিয়ে সুরু হল রক্তপাত। সীমপাতার মত মিসকালো তার রং। পড়তে পড়তে জমে যায় সে রক্ত,—সকলে অস্থির।...মনে পড়ে শ্রীযুত হলধারীকে ঠাকুরের সাধন বিষয়ে অবহিত করা। ক্রোধে অধীর অগ্রজ দেন অভিশাপ—তোর মুখ দিয়ে রক্ত পড়বে। ...মনে পড়ে বালির অভিশাপ মাথায় কুড়িয়ে নিয়েছিলেন ভগবান রামচন্দ্র যার ফলে কৃষ্ণাবতারে ব্যাধের শরাঘাত। দৈব নির্দেশে সেদিন জনৈক প্রাচীন সাধু এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বর তীর্থে। তিনি বিশেষভাবে দেখে বলেন,—এ ভালই হয়েছে এই রক্ত বেরিয়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ। হটযোগের শেষ কথা জড় সমাধি। সে সমাধি হলে শ্রীঠাকুরের লীলা-বিগ্রহ আর থাকত না। তখন চলছিল হটযোগের সাধন বিলাস।

শ্রীযুত হলধারীর সঙ্গে শ্রীঠাকুরের লীলা, সাধন কালের এক মধুর অধ্যায়। হলধারী পাণ্ডিত্যের অভিমানে সময় সময় শ্রীঠাকুরকে—মা ভবতারিণীকে অবজ্ঞা করতেন; আবার সময়ে সময়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেও হতনা ভুল। একদিন মাকে তামসী বলে শ্রীঠাকুরের কাছে প্রমাণ করেন, নানা তর্কযুক্তির সহায়ে—বালক স্বভাব ঠাকুর সজল নয়নে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন ছুটে মার চরণান্তিকে, মায়ের শরণাগত বালকের নিবেদনে ভবতারিণী কি স্থির থাকতে পারেন আশ্বাস না দিয়ে? ফিরে এসেই

একেবারে চেপে বসেন হলধারীর স্কন্ধে বলেন,—তুই মাকে তমোময়ী বলিস—মা যে ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধ সত্ত্ব গুণময়ী···হলধারী করেন পূজার ফুলে চরণ বন্দনা, জগদম্বা জ্ঞানে·· কিন্তু শাস্ত্র বিচারের অহং আবার সব দেয় ভুলিয়ে···পানা ঢাকা পুকুরের জল পানা সরিয়ে দিলে আবার যায় ঢেকে। হলধারী আবার বিচার করতে বসেন। একদিন হলধারী দেখেন কালীবাড়ীর দীন-নারায়ণদের উচ্ছিষ্ট—প্রসাদজ্ঞানে- শ্রীঠাকুর একান্ত ভক্তিভাবে করছেন গ্রহণ। দেখেই হলধারী হন দিশাহারা, বলেন, —দেখি তোর ছেলেমেয়েদের কেমন করে বিয়ে হয়। শ্রীঠাকুরের মাথায় হয় বজ্রাঘাত, বলেন,—এই যে বল সর্বভূতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করতে—আর মনে কর বুঝি তোমার মত আমার ছেলেমেয়ে হবে—ধিক্ এই শাস্ত্রজ্ঞানে- হলধারীর শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞান শ্রীঠাকুরের বিজ্ঞান দৃষ্টির কাছে পায় না থই।

যে যা বলে বালক স্বভাব শ্রীঠাকুরের সহজ সরল মনে মেনে নেওয়াই ছিল বৈশিষ্ট্য চিরদিনের—হলধারী এমনি বিচারে একদিন তাঁর সব দর্শন মিথ্যা বলে এমন ভাবে প্রমাণ করলেন—অধ্যাস, মায়া, জগৎ ভ্রান্তি—এই সব শাস্ত্রবাণী সহায়ে যে শ্রীঠাকুর আর স্থির থাকতে পারলেন না; তাঁর নিজের কথায়,—ভাবলাম, তবে ত ভাবে যত রূপ দেখেছি সেসব মিথ্যা—মা তবে আমায় ফাঁকি দিয়েছে—মন বড় ব্যাকুল হল, আর দারুণ অভিমানে, কেঁদে কেঁদে, মাকে বললুম, মা নিরক্ষর অবুঝ বলে আমায় কি এমনি ফাঁকি দিতে হয়—সে কান্নার তোড় আর থামে না—

···কুঠীর ঘরে এই লীলা—সহসা দেখেন মেঝে থেকে ধোঁয়ার মত উঠছে—চিন্ময় সে ধোঁয়া, আর তার ভেতর গৌরবর্ণ সৌম্য শ্মশ্রুল এক মুখ—জীবন্ত চিন্ময়,—সেখান থেকে এক বাণী শুনলাম,—'ভাবমুখে থাক'—তিনবার ঐ কথা বলার পর ঐ শ্রীমূর্তি কুয়াসায় গলে গেল—আর ঐ কুয়াসাও গেল সরে···মন এক শান্তি নিথরে সান্ত্বনায় গেল ভরে······

হলধারীর যুক্তিতর্ক আর একবার ঘটায় এমনি বিভ্রম—সেবারও মা তাঁর সন্তানকে বুঝিয়ে দিতে ঘটের পাশে হলেন আবির্ভূত, বল্লেন—ভাবমুখে থাক—এই বাণীই আবার তিনি পান—নিরন্তর ছয়মাস নির্বিকল্প ভূমিতে

বাস করবার পর, মন যখন সপ্তভূমিতে নিলীন হয়ে যাবার যো হয়েছিল—সে বাণী কিন্তু শরীরী নয়—আত্মায় আত্মায় সে বাণী···

শ্রীঠাকুরের তিনবার তিন রকম অনুভূতি হয়েছিল—মনে হয় প্রথমবার উপনিষদের হিরণ্য-গর্ভ পুরুষ, যিনি—'আপ্রনখাৎ সৌবর্ণম্'—তিনিই এসেছিলেন; দ্বিতীয় বারের দর্শন মানবীয় রূপে, আর তৃতীয়বার বাগ্‌ব্রহ্ম-রূপের, স্ফোটরূপের প্রমাণ পেয়ে হয়েছিলেন আশ্বস্ত···শ্রীঠাকুরকে বুঝাতে মাকেও অনেক কিছু করতে হয়েছিল···এমন অবুঝ ছেলে না হলে দর্শনের কথা —'বেদবেদান্তের পারে' যাবে কেমন করে ?
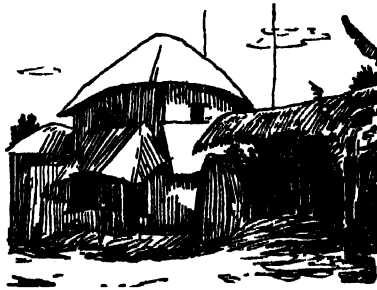
ধনীমাব কুটীব

বারো

শ্রীঠাকুরের কথা—'মন মুখ এক করাই সাধন'—দেখা যায় যখন সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন জ্ঞান করতে হবে স্থির করলেন, তখন এক হাতে টাকা নিয়ে আর এক হাতে মাটি নিয়ে টাকা মাটি সত্য সত্য সমজ্ঞান করে উভয়কেই গঙ্গা-গর্ভে দিলেন বিসর্জন…আবার যখন শুচি অশুচিতে সমজ্ঞান সাধন করতে হবে, দেখা যায়—সত্য সত্যই নিম্ন জাতির বিষ্ঠা নিজের মাথার কেশ দিয়ে পরিস্কার করছেন, আর সর্বভূতে সমজ্ঞান করতে দীন-নারায়ণদের উচ্ছিষ্ট মাথায় করে গঙ্গা-গর্ভে দিচ্ছেন বিসর্জন…এইভাবে স্থূল ও সূক্ষ্মের সাধন—তিনি নিজে করে না দেখালে লোকের গ্রহণ যোগ্য হতনা—আপনি আচরি ধর্ম শিখান অপরে,…নিজে যেমন বলতেন—আমি ষোল টাং করেছি তোরা এক টাং কর; বলতেন,—মন যখন শুদ্ধ হয় তখন সেই মনই গুরুর কাজ করে ।…অবতার পুরুষদের মন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ত' বটেই বরং আরো কিছু…তাই মনে যা উঠত বা শাস্ত্রের সব কথা প্রত্যক্ষ হোত।

শ্রীঠাকুরের নিজের কথা,…আমারি মত দেখতে এক যুবক সন্ন্যাসী আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত—যখন তখন, আর অনেক বিষয়ে উপদেশ দিত—সে যে সব উপদেশ দিত কালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী এদের কাছেও সেই একই উপদেশ পেয়েছি। যখন এই সন্ন্যাসী বাইরে আসতো, তখন এই দেহটা হয় একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়ত, না হয় কিছু সংজ্ঞা থাকত…এঁদের গুরু করণের উদ্দেশ্য শুধু শাস্ত্র মর্যাদা রক্ষা, শুধু নজির মাত্র।…শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষা লগ্নে এমনি ঘটনাই ত' ঘটেছিল।

সাধনার প্রথম চার বৎসরের শেষের দিকে শ্রীঠাকুর আছেন কামারপুকুরে। তখনকার দর্শন একটু অন্যরকম—

শ্যামছন্দ শিহরগ্রামের বনপথ…শিবিকায় চলেছেন শ্রীঠাকুর—বালকের লীলা-কৌতুক দুই চোখে, পল্লী জননীর স্নেহচুম্বনে আবার যেন

জেগেছে ছায়া ঘেরা মধুর বাল্যস্মৃতি। সহসা দেখেন দুটি সুঠাম সুন্দর কিশোর, আনন্দঘনতনু, তাঁর দেহ হতে বেরিয়ে এসে—শুরু করে নর্মলীলা—কখন দূর বন রেখায় যায় হারিয়ে, কখন বা পাল্কীর কাছে এসে হাস্যে লাস্যে হয় আপনহারা—অনেক্ষণই চলে এই দিব্য লীলা, শেষে তারা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গেই আপনাদের ফেলে হারিয়ে…পরে ভৈরবী ব্রাহ্মণী শুনেই বলেন,—এরাই নিত্যানন্দ—শ্রীচৈতন্য—আর তুমি একাধারে দুইই, তাই এমন দেখেছ বাবা।

শ্রীঠাকুরের প্রেমোন্মাদনা আকুল করে তোলে চন্দ্রামাকে—তাই ডেকে নিলেন নয়নমণিকে কামারপুরে…পল্লীমার স্নেহশীতল বুকে—জননীর বেদন-ঘন-আলিঙ্গনে যদি জুড়ায় সন্তানের ব্যথা, জুড়ায় সব আধি-ব্যাধি—ফিরে এলেন চন্দ্রার বুকে, ফিরে এলেন পল্লীর দুলাল পল্লীর পাখী-ডাকা, ছায়া ঢাকা শ্যামগেহে…এবার কিন্তু আর সেই লীলা কিশোর নয়, ফিরে এলেন ভবতারিণীর আদরের দুলাল আধো ফোটা ঠাকুর—ক্ষণে ক্ষণে সমাধি, ক্ষণে মার সঙ্গে আনন্দ বিলাস—পল্লীবাসীর চক্ষে মনে হয় উন্মত্তের বিকার বিশেষ। শুরু হল ওষুধ, ঝাড় ফুঁক · যিনি ভবরোগ বৈদ্যের মাথার মণি, তাঁর বৈদ্য যে সারা বিশ্বেও মেলে না,—তাই এ রোগের ঔষধ যায় না পাওয়া—রোগও যায় থেকে।

ভয় আর বৈরাগ্যের আলেয়া পল্লী-শ্মশান—সাধকের বেদনামথিত আত্মার আত্মীয় গ্রামান্তের এই শ্মশানভূমি…নির্জন সাধনায় মনকে অভী করবার যোগ্যক্ষেত্র এই দিব্যস্থান—যুগে যুগে সাধকদের দিয়ে এসেছে ডাক—দিয়ে এসেছে অগ্রগতি……

কামারপুকুরের উপান্তে ভুতির খাল আর বুধুই মোড়লের শ্মশান—শ্রীঠাকুরের আবাল্য বিলাসভূমি—মার দর্শনের পরও শ্রীঠাকুর শ্মশানের সাধনা আবার করেন সুরু—শিবাভোগ প্রেততর্পণ, শাস্ত্রমতে হল সুরু… সমস্ত শাস্ত্রমত পূর্ণতর করতেই যাঁর আসা তাঁর কাছে তন্ত্রের এই রহস্যময় পথ অজ্ঞাত থাকবে কেন…? কখন কখন রাত্রের দ্বিতীয়যামও অতীত হয়ে যেত তাঁর এই মরণ সাধনায়—জীবন-মৃত্যুর এই মিলনক্ষেত্রে কিছু কিছু যোগ বিভূতির প্রকাশ এই সময়েই হয়।

কামারপুকুরে চট্টোপাধ্যায় গৃহে গোপনে বসেছে আত্মীয়দের এক বৈঠক —ঠিক হয় গদাধরের এই ভাবান্তরের একমাত্র প্রতিকার তার বন্ধন সৃষ্টি করা। বিবাহের মধুর বন্ধনই একমাত্র উপায়—চেষ্টা চলে কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও মনোমত পাত্রী যায় না পাওয়া—নারায়ণের পাশে প্রয়োজন যে নারায়ণীর—কেটে যায় দিন—স্থির হয় না কিছুই—একদিন সহসা উদয় গদাধরচন্দ্র স্বয়ং। যাকে লুকিয়ে এই ব্যবস্থা, তিনিই এসে উপস্থিত। শিশুর উল্লাসে যেন না জানা কৌতূহলেই বলেন,—ওগো তোমরা কি করছ ?...তার পরই ভাবস্থ···সর্বান্তর্যামী দেন চমক লাগিয়ে, বলেন,— ওগো কোথা খুঁজে মরছ, ঐ দেখগে অমুক গাঁয়ে অমুকের মেয়ে কুটো বাঁধা আছে ···সকলের ত চক্ষুস্থির—যাকে আড়াল করতে গোপনের এই ব্যবস্থা, তারি মুখে এই কথা ! দেবতার ঠাকুরালী একেই বলে—

বারশোছেষট্টী সাল, নববর্ষ তখন সবে সুরু—ধরণীর পূর্বাশায় জেগেছে দাম্পত্য জীবনের নব মাঙ্গলিক··শুভ বৈশাখের এক পুণ্যদিনে শ্রীঠাকুরের বিবাহের লগ্ন হল স্থির। স্থির হল জয়রামবাটীর শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদেশ্বরীর সঙ্গে। কন্যা তখন নিতান্ত শিশু —পঞ্চমীর চন্দ্রলেখা, আকুল কুন্দকলি—আর শ্রীঠাকুর তখন চতুর্বিংশতির শিবকান্ত··· ।

উমা-মহেশ্বরের বিবাহের মত দিব্য হতেও দিব্য এই বিবাহ—এতে ছিল না আড়ম্বরের লেশ মাত্র। কবি কালিদাস উমা-মহেশ্বরের বিবাহ বিন্যাসে লিখছেন,—

দিবাপি নিষ্ঠ্যূতমরীচিভাসা বাল্যাজনাবিষ্কৃতলাঞ্ছনেন।
চন্দ্রেণ নিত্যং প্রতিভিন্নমৌলেশ্চূড়ামণেঃ কিং গ্রহণং হরস্য॥

কলঙ্কহীন চন্দ্রলেখা যার মাথার আভরণ তাঁর আর অন্য কি আভরণ প্রয়োজন—যিনি বিশ্বকে আলো করে আজ বিশ্বেশ্বর তাঁর আভরণের বালাই ত কোন কালেই নাই। ভাবোল্লাসে, মার অনুরাগে তখন গরগর গদাধর তনু নিটোল মুক্তার মত উচ্ছল—আভরণ তখন আবরণ মাত্র·······

কামারপুকুরের পথ—বিবাহের পরের এক পরম লগ্ন। রৌদ্র-করোজ্জল দিন—একটি পাল্‌কী এসে দাঁড়িয়েছে ছায়ামন্থর চন্দ্রার গৃহদ্বারে—

চারিদিকে জাগে এক অপূর্ব চঞ্চলতা। পল্লী-জননীরা আবেগাকুল চোখে এসে দাঁড়ান, পল্লীদুলালদের চপলতা ক্ষণিকের তরে হয় স্তিমিত—সহসা এসে দাঁড়ান শ্রীঠাকুর—যাবেন শিহড়ে—চেলাঞ্চল উড়ছে দূর দখিনায়—আবেগাকুল-নয়ন-নিথরিত-অমৃত নয়ন-পল্লবে যায় না ঢাকা—যেন সপ্তসায়র মথিত করে জেগেছে রূপশতদল—সর্বঅঙ্গে স্বর্গের সুষমা—সকলের চোখে জাগে মোহমদির আবেশ...শ্রীঠাকুর হৃদয়কে বলেন,—হৃদু, এত লোক সমাগম কেন? শোনেন তাঁকে দেখতেই সবার এই আকুতি—শিশুসুলভ লজ্জা ছড়িয়ে পড়ে সারামুখে, ঢুকে পড়েন গৃহকোণে। এমনি হত শ্রীঠাকুরের যখনি ফিরে যেতেন পল্লীগেহে···ভোরের স্বপ্ন জড়িমা ফুরাতে না ফুরাতেই আসতো পল্লীজননীরা কলসী কাঁখে হালদার পুকুরে—আর দর্শনোল্লাসের পালা সুরু হত চন্দ্রার কুটীরে। তাঁরা সাজিয়ে আনতেন গৃহ-প্রস্তুত সামান্য স্নেহোপচার। এরপর আসতেন পুরুষ ভক্তের দল—অপরাহ্নে আবার স্নানার্থিনীদের ভিড়—সন্ধ্যায় পুরুষ ভক্তদের মিলনোৎসব,—শ্রীঠাকুরকে ঘিরে এমনি আনন্দের হাট বসত কামারপুকুরে···দেবতার চরণ ঘিরে নিত্য জাগে নব বসন্ত—

নিত্য অগ্রসারী মহাকালের চক্রকে ফিরিয়ে দেখি—দিব্য বিবাহের এক দিব্য পর্ব—শিশু শিবানীর চক্ষে অনন্ত কৌতূহল, আর মহেশ্বরের চক্ষে মহাভাব···দেহ মনে মহামাতৃকার বিলাস—ক্ষণে ক্ষণে সমাধি··· অমর্তের বিলাস মর্তের বুকে···কবির কথায় Bridal of the Earth and Sky—মর্তের সঙ্গে অমর্তের মিলন।

মা ভবতারিণীর আহ্বান আসে, ফিরে আসেন মার দুলাল পড়ে থাকে পল্লীগেহ, পড়ে থাকে জননীর অঞ্চল, সুরু হয় সাধন লীলা—মার জন্য আকুলতা...উন্মাদের মত মার অবাধ দর্শনের নিরন্তর প্রচেষ্টা—নিরন্তর-প্রার্থনা, স্মরণ মনন...অতল ব্যাকুলতায় নিদ্রাহীন দিশাহীন দিব্যোন্মাদের দিন আবার আসে ফিরে। একথা বারশোসাতষট্টি সালের শেষের।

তেরো

কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের গৃহ—কবিরাজ নবাগতের অদ্ভুত রোগের চিকিৎসায় চিন্তিত। বন্ধুস্থানীয় এক কবিরাজ রোগীর লক্ষণ দেখে সহসা বলে ওঠেন – এ রোগ চিকিৎসার অতীত—এ দিব্যোন্মাদের অবস্থা, নিদানে এ রোগের বিধান নাই…রোগী আর কেহ নয় আমাদের ঠাকুর স্বয়ং, সঙ্গে আছেন পার্ষদ হৃদয়রাম—ভবরোগ বৈদ্যের সঙ্গে তখনকার ধন্বন্তরি গঙ্গাপ্রসাদের মিলন—এ বেশ রহস্যময় লীলা বলেই মনে হয়…এ তাঁর চিকিৎসা না গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসা কে জানে—?

এদিকে জননী চন্দ্রার বুক নিঙরে ওঠে। নিরুপায়ে গ্রামের বুড়োশিব তলায় ধন্না দিয়ে পড়েন পুত্রের কুশল কামনায়; মুকুন্দপুরের শিবের প্রত্যাদেশ হল – পুত্রের উন্মাদ রোগ হয় নাই ঈশ্বরের আবেশ হয়েছে… পূজান্তে কল্যাণী শান্তমনে ফেরেন গৃহদেবতার দেউল ছায়ে। শ্রীঠাকুর সে সময়ের অবস্থা বলতে গিয়ে বলেছেন তাঁর পার্ষদদের,—মার চিন্তায় দীর্ঘ ছয় বৎসর চোখে নিদ্রা ছিল না, পলক ছিল না—সময়ের জ্ঞান ছিল না —নিজেকে নিজে দেখে ভয় হত, কেঁদে ফেলতাম, আর মাকে কেঁদে কেঁদে বলতাম,—মা তোকে ডেকে এই ফল হল—শরীরে এই রোগ দিলি, আবার শিশুর মত বলতাম, তা যা হবার হক, তুই আমায় কৃপা কর—দেখা দে… প্রার্থনার পর মার দর্শন ও অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হতাম…

ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ নিত্য—তাইত' মথুর প্রথম দর্শনের দিন থেকেই অনুভব করে ঠাকুরের প্রতি একটা টান। তখন শ্রীঠাকুরকে সকলে উন্মাদ মনে করে নানা অকথা অকুণ্ঠে করছে প্রয়োগ—ব্যথিত মথুর শুভ অশুভ সব রকম চিকিৎসার চেষ্টায় হননা বিরত। এমন অবুঝ অবস্থায় থাকার ত' কথা নয়…সেদিন শ্রীঠাকুর কুঠীর অদূরে পাদচারণা করছেন, তনুতীর্থে জেগেছে দলমল বিলাস—সহসা মথুর এসে পড়ে লুটিয়ে একেবারে তাঁর চরণে, চক্ষে নেমেছে অবাধ বর্ষণ—শ্রীঠাকুর যত বুঝান তার আকুলতা ততই যায় বেড়ে। শেষে সে সব ভেঙ্গে বলে,—বাবা তুমি বেড়াচ্ছ

আর আমি স্পষ্ট দেখলাম তুমি নও আমার ঐ মন্দিরের মা, যখন এগিয়ে আসছো—আর যখন পেছিয়ে যাচ্ছ, দেখি বাবা বিশ্বনাথ—স্পষ্ট দেখলুম, চোখ মুছে বার বার দেখলুম…। অনেক বোঝানোর পরে মথুরের সে আকুলতা থামে…ভাগ্যবান মথুরের কোষ্ঠীতে ছিল তাঁর ইষ্টদেব দেহধারণ করে তাঁর সঙ্গে ফিরবেন, রক্ষা করবেন—মথুর যে যোগভ্রষ্ট রসদ্দার, চিহ্নিত সেবক।

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন বিষম চঞ্চলতা—মন্দিরের কর্মচারীরা উন্মত্তের মত করে ছুটাছুটি, মথুরামোহনও ছুটে আসে; দেখা যায় স্তব্ধ মন্দিরে আছেন মাত্র তুই জন—শ্রীঠাকুরের মুখে ঈষৎ করুণার হাসি, রাণী অনুতাপ গম্ভীর—আর ভবতারিণী ভবভয়হারিণী দক্ষিণেশ্বরী করুণায় স্ফুরিতাধরা…

কর্মচারীদের কলগুঞ্জনে প্রকাশ—রাণী সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে বসেছেন পূজায় আর শ্রীঠাকুরকে বলেন,—বাবা মার একটা নাম করত। শ্রীঠাকুরও অশ্রুল অনুরাগে ধরেন মার নাম—সহসা দেখা যায় দিব্যভাবে আপনহারা ঠাকুর রাণীর অঙ্গে করেন আঘাত, আর বলেন,—কি—এখানেও ঐ সব চিন্তা…অষ্টনায়িকার একজন হলেও রাণী তখন তাঁর এক মামলার কথায় ছিলেন আপনহারা। মন্দিরের কর্মচারীদের, পরিচারক পরিচারিকাদের কিন্তু দেন থামিয়ে—মার চিহ্নিতা সেবিকার সে সাধন শক্তি ছিল, ছিল নিজ অপরাধ বুঝবার মত জাগৃতি ..শক্তিকে সংহৃত রাখাই শক্তিমানের লক্ষণ।

গুরুভাবের এই বিকাশ অবতার জীবনে এই প্রথম নয়—প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅদ্বৈতকে বেদনার্ত্ত কৃপায় ধন্য করা—আর 'আভে' দেবতার মন্দিরে ভগবান ঈশামসির বিষয়মুখী মানবদের তাড়না—আমাদের স্মরণে সহজেই ভেসে আসে। প্লাবন মেঘের বুকে বজ্র থাকে—আবার বর্ষণও থাকে।

সিদ্ধনায়িকা রাসমণি একদিন সহসা আঘাতিত হন, ফলে হয়ে পড়েন রোগগ্রস্ত—বিদায়লগ্ন আসন্ন বুঝে গঙ্গা তীরে অবস্থানের হল ব্যবস্থা।

আঠারোশোএকষট্টি সালে উনিশে ফেব্রুয়ারী সে এক অন্ধ তমাচ্ছন্ন রাত্রি…রাণীকে করা হয়েছে অন্তর্জলী—সহসা রাণী চিৎকার করে ওঠেন

—সরিয়ে দে—ওসব আলো সরিয়ে দে—মা আসছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় সব আলোয় আলোময় কিছু স্থির হয়ে আবার বলেন,—মা এলে, কিন্তু পদ্ম যে সই দিলেনা-মা—কি হবে? রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর —মহানিশা—কর্মঅন্তে ক্লান্ত সন্তানের মার কোলে ফিরবার এইতো সময়। দেবী রাণীর দেহান্তে মথুরামোহনই কালীবাড়ীর সেবাধিকার লাভ করেন। তবে প্রয়াণ-লগ্নে দৃষ্টিব যে স্বচ্ছতা হয় রাণীর শেষ আশঙ্কাই তার প্রমাণ।

বোধহয় শ্রীঠাকুরের কাজের সুবিধা হবে বলেই মথুরামোহনের এই উন্নতি। রাণীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ এগার বৎসব শ্রীঠাকুরের সঙ্গ ও সেবার অধিকার জন্মজন্মান্তরেরি সুফল। ঐশ্বর্য্য ও তাব যথার্থ ব্যবহার বিশেষ অধিকারীতেই সম্ভব। মথুবামোহন যোগভ্রষ্ট ও যোগ্য সেবাধিকারী ছিলেন তাই সাক্ষাৎ দেহধাবী ভগবানেব এমন সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

...আকুলোচ্ছলা গঙ্গা আর তেমনি আকুলোচ্ছল শ্রীঠাকুরের হৃদয়—সাধন সায়র তীরে আকুল নয়ন মেলে প্রতীক্ষা করছেন যেন কোন দিশারীর আশায়.. সহসা গঙ্গা-বক্ষে তরণীতে দেখা যায় আকুল-কেশা ভৈরবী-মূর্তি, মূর্ত উমা-মহেশ্বরী। শ্রীঠাকুর ত্বরিতে নিজ গৃহে যান ফিবে—হৃদয়কে দিয়ে ভৈরবীকে পাঠান ডেকে, অন্তরে জাগে হারিয়ে পাওয়া আত্মীয়ের দর্শনোল্লাস; ভৈরবী ব্রাহ্মণীও যেন হারান সন্তানকে পেয়ে কলকণ্ঠে বলেন,—বাবা তুমি এখানে,—আর মার নির্দেশে তোমায় কত খুঁজে বেড়াচ্ছি। জননী আর সন্তানের সুরু হয় কত কথা, গোপন সাধন রহস্যের উচ্ছলতা ..বলেন,- মা, আমায় যে সবাই পাগল বলে একি সত্যি—সত্যি কি আমি মাকে ডেকে উন্মাদ হয়েছি? সত্যকার একজন সিদ্ধ সাধিকার দর্শনে এতদিনের যত জানাজানি, যত কানাকানি, যেন শেষ হতে চায় না.... ভৈরবী আশ্বাস দেন,—কে বলে বাবা তোমায় পাগল, এযে মহাভাব —এই ভাব হয়েছিল শ্রীমতীর- এইভাবে আপনহারা হয়েছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। শাস্ত্রে এর শত প্রমাণ যে রয়েছে। আশ্বস্ত হল দিব্যশিশু, আকুল নেত্রে ঝরে পড়ে বেদনামথিত সমস্ত কথা—দরদী হিয়ার স্পর্শে ব্যথা ও অশ্রু আনে শ্রাবণের বর্ষণ—আনে তৃপ্তি—আনে পূর্ণতা...

সঞ্চিত বহু কথায় সেদিন হয়ে যায় বেলা। শ্রীঠাকুর ভবতারিণীর প্রসাদী মাখন মিছরী সব ভৈরবী মাকে দেন খেতে—তিনিও বালগোপাল ভাবে অগ্রভাগ শ্রীঠাকুরকে দিয়ে সে প্রসাদ করেন গ্রহণ। ভৈরবী ঠাকুর-বাড়ীর ভাণ্ডার থেকে চাল, ডাল ভিক্ষা স্বরূপ নিয়ে অন্নাদি প্রস্তুত করে, বসেন ইষ্টের পূজায়—ইষ্ট রঘুবীর শিলা তাঁর সঙ্গেই থাকতেন।...ভাব সমাধিতে ভক্ত-ভগবানে যে লীলা, সর্বান্তর্য্যামী তার একমাত্র সাক্ষী··· বাইরে থাকে শুধু আসন্ন শ্রাবণের শান্তি·· সহসা শ্রীঠাকুর কেমন করে এসে পড়েন, আর দেখা যায়—অর্ধবাহ্যে, নিবেদিত অন্নের অগ্রভাগ গ্রহণে একান্ত নিবিষ্ট, যেন তাঁকেই এতক্ষণ সমস্ত নিবেদন করা হচ্ছিল, যেন তাঁরই আবাহনে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর এত ভাবতন্ময়তা ভৈরবী ভাবনেত্র মেলে শ্রীঠাকুরের এই লীলা বিলাসে চোখের জলে হয়ে পড়েন অবুঝ। শ্রীঠাকুর বলেন,—কি জানি কেন এমন করি···ভৈরবী বলেন,—বাবা বুঝেছি এ কে করেছে? যার পথচেয়ে কতদিন গেছে কেটে—কত অশ্রুগহণ রাত্রি হয়েছে প্রভাত - আজ তাকেই যখন পেয়েছি মূর্তরূপে তখন আর বাহ্য-পূজার প্রয়োজন নাই। সুরধুনীর পূণ্য-সলিলে স্থান পান এতদিনের পূজিত প্রাণের দেবতা রঘুবীর···দেবতা যখন জীবন্ত, চিন্ময়, তখন মৃণ্ময় মূর্তির প্রয়োজন আর থাকে না। মহাজনের পদে—

"আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা—"

ব্রাহ্মণী বলেন,—বাবা কে বলে পাগল—এ যে মহাভাব—ভাবে মুহুর্মুহু আপনহারা,—কীর্তনে পরমানন্দ—এযে শাস্ত্রে আছে···আর তিনি যে আবার আসবেন—

'অদ্বৈতের গলা ধরি কন বারেবার।
পুন যে করিব লীলা মোর চমৎকার॥
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার।'

প্রচ্ছায় শীতল পঞ্চবটী, দাবদগ্ধ ধরণীর পরম পরিতৃপ্তির সেই পঞ্চবটী, ব্যথার পঞ্চবটী, তার তলায় বসে শ্রীঠাকুর আর ভক্ত মথুরামোহন - বালকের সারল্যে ঠাকুর বলেন,—দেখ গো, ভৈরবী আমায় অবতার বলে, আর বলে

যে শাস্ত্রে নাকি একথা আছে—মথুর যুক্তিবাদী ভক্ত। বলেন,—অবতার যে দশটার বেশী নেই—এমন সময় দেখা যায় অশ্রু সরসে ভাবঅবশে নন্দরাণীর বেশে আসেন ভৈরবী স্বয়ং—হাতে মিষ্টান্নের থালি। আসামাত্রই শ্রীঠাকুর মথুরের দেন পরিচয় আর বলেন তার কথা। তেজোদীপ্তা ভৈরবী বলেন,—কেন শাস্ত্রে এ সব আছে, ভাগবতে চব্বিশটী অবতারের কথা আছে—আরো আছে অসংখ্যবার তাঁর অবতীর্ণ হবার সংবাদ—আর পণ্ডিত সমাজে এ কথা প্রমাণ করতেও আমি প্রস্তুত...

মথুর হন নীরব...।

লাহা বাবুদের পাঠশালা

চৌদ্দ

যোগেশ্বরী ভৈরবী বিদুষী ছিলেন; আর তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল বলেই শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশে এই সন্ধিক্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এখন সকলেই, ঐসব সাত্ত্বিক বিকারকে উন্মাদের লক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছেন—এমন কি বালক স্বভাব ঠাকুরও তাই মেনে নিয়ে মার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন,—মা তোকে ডেকে আমার এই হল—শরীরে এমন ব্যাধি দিলি? এমনি দিনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি কিন্তু প্রথম দেখাতেই শ্রীঠাকুরের মহাভাবের লক্ষণগুলি চিনতে পারেন, চিনলেন এই গোপন প্রেমধনকে—আর তার প্রমাণ দিতে পণ্ডিত সমাজকে করেন আহ্বান। প্রথমেই শ্রীঠাকুরের দেহে যে জ্বালা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠত অসহ সেই জ্বালা অবতার শরীরে ঈশ্বর বিরহেই উপস্থিত হয় একথা দিলেন জানিয়ে—আর ভক্তি শাস্ত্রে এর প্রতিকার স্রক্‌চন্দন ধারণ বলে নির্দেশিত আছে, তার ব্যবস্থাও হয় সঙ্গে সঙ্গে... দেখা গেল তিন দিন ঐ ব্যবস্থায় সব দাহ যায় জুড়িয়ে...ভৈরবী যোগেশ্বরী এমনি করেই শ্রীঠাকুর যে অবতার তার প্রথম প্রমাণ শাস্ত্রমুখে দেন ধরে।

বিরাট মনের ক্ষুধাও বিরাট—এই সময় শ্রীঠাকুরের মনে কেবলই খাবার কথা জাগে। খেয়ে উঠেই আবার যেন ক্ষিদে পায়—ভৈরবী মাকে বলেন সে কথা। বলেন,—এটা কি হল বল দেখি—কেবলি খাই খাই। ভৈরবী বলেন,—ভক্তিপথের এও যে একটা অবস্থা বাবা...শাস্ত্রমন্থন করে উপায় বের হয়—একটি ঘরে সব রকম খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে বলেন,—বাবা এই ঘরে থাক, আর যখন যা ইচ্ছা হবে খাবে। শ্রীঠাকুরও তাই করেন...কখন এটা একটু, কখন সেটা একটু খান, নাড়াচাড়া করেন—তিন দিন এমনি থাকার পর সে বিরাট ক্ষুধা যায় মিটে......

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন এক সভা বসেছে—সভার মধ্যমণি, আলুথালু শিশুর মত কৌতূহলী আমাদের ঠাকুর—আর তখনকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ

আর আর সাধক ও পণ্ডিতজন আছেন সদলে—মথুরও আছেন, আর আছেন যোগেশ্বরী ভৈরবী—জননীর মত সন্তানকে আড়াল করে। শ্রীঠাকুরের দেহের বিকার সব উন্মত্তের বিকার না মহাভাবের বিকাশ, সেই মীমাংসায় এ সভা আহ্বান করেছেন মথুর নিজে। প্রথমেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীঠাকুরের দেহের বিকারগুলিকে শ্রীমতী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভাবের বিকারের মতই দিব্য, শাস্ত্রসহায়ে সে কথা দৃঢ়কণ্ঠে প্রমাণ করতে সুরু করেন। শ্রীঠাকুরের অবস্থা তখন আসর রসিক শিশুর মত—বেশ একটা আনন্দ কৌতূহলী আপন-ভোলা আচ্ছন্নে আছেন বসে, সঙ্গে কাবাব-চিনির বেটুয়া।

সব শুনে ভক্ত পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ বলেন,—শাস্ত্রে যে উনিশটী মহাভাবের কথা আছে আর যার প্রকাশ কেবল মাত্র শ্রীমতী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন বেদেই যায় দেখা—যার তুই চারিটী মাত্র সাধারণ সাধকদের জীবনে দেখা দেয়—শ্রীঠাকুরের দেহে যেন সেই উনিশটী মহাভাবের বিরাট ঢল নেমেছে—জগদ্ধিতায়।—

অবাক বিস্ময়ে মথুর আর আর ভক্তেরা শুনেন সে কথা দূরাগত দৈববাণীর মত—এতদূর আশা তাঁরা করেন নি। পুত্রের প্রতিষ্ঠায় যোগেশ্বরী ভৈরবীর জীবন-সানুতে জাগে অলকানন্দার হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস···

শ্রীঠাকুর বলতেন,—আগে ফুল, তারপর ফল; তবে কোন কোন গাছে আগে ফল ধরে পরে ফুল হয়—স্বয়ং অবতীর্ণ ভাগবৎ প্রকাশের আবার কৃচ্ছ্র তপস্যার প্রয়োজন কি···উপনিষদে আছে সৃজনের তপস্যায় ব্রহ্মাও হয়েছিলেন তপ্ত—'স তপো অতপ্যত'...গীতামুখেও ভগবান বলেছেন,—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

যদিও আমার কর্তব্য বলে কিছু নাই তবু আমি কর্ম করছি।

সব রকম সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করলে জগৎগুরুর পদবী গ্রহণ করা ত' সম্ভব নয়। তাই ভবতারিণীরই নির্দেশে শ্রীঠাকুরের এই সাধন-সমুদ্রে নিত্য নিত্য ডুবে যাওয়া···

শ্রীশ্রীভবতারিণীর নির্দেশে যোগেশ্বরী শ্রীঠাকুরকে প্রথম বিধিবৎ সাধনে, প্রেরণা দেন, এ সাধন তন্ত্রের সাধন...এর আগে একমাত্র ব্যাকুলতাই ছিল সাধনার সম্বল—শিশু যেমন মার জন্যে ব্যাকুল হয় শ্রীঠাকুরও তেমনি অবুঝ আকুল ডাকে দেখা পান মার, এ আকুলতা—এ অভ্র-বিলেহ ব্যথা—স্বয়ং ভগবানের ব্যথা—এর নিরিখ কে বুঝবে? ভগবৎ বিরহে গৌর-সুন্দরের চোখে ঝরণার মত জল ঝরত আর মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতীর কৃষ্ণ-বিরহ আজও ভক্তি-রাজ্যে চির-অচিন্ত্য হয়েই আছে।

শ্রীঠাকুরের দিব্য অনুভূতি যে শাস্ত্রসিদ্ধ, মস্তিষ্কের বিকার মাত্র নয় একথা প্রমাণ করতে ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবতার উত্তর সাধিকার পদ গ্রহণ করেন, রহস্যময় তন্ত্রপথে—বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানি তন্ত্র, একে একে সুরু হয় তাদের সাধন। তৈরী হল পঞ্চবটী, বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন—নিত্য অমানিশায় সুরু হয় নব নব সাধন লীলা। গহিন রাত্রির অন্তরালে, ততোধিক গহিন তন্ত্র সাধনার দুএকটি করতেই অধিকাংশ পথিক হয় পথহারা...শ্রীঠাকুরের সেইসব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে কিন্তু তিন দিনের বেশী লাগে না। এইসব সাধনার সময় শ্রীঠাকুরের দিব্য উপলব্ধির ইতি করা যায় না...কুল-কুণ্ডলিনী দর্শন, ষোড়শী দর্শন, অনাহত ধ্বনি শ্রবণ, অষ্টসিদ্ধিলাভ, মহামায়ার দর্শন—এদের মধ্যে ষোড়শী-মূর্তি রূপে অপরূপ—দেহ-সুষমা যেন গলে গলে চারিদিকে জমা হয়ে আছে। এমনি আরো কত...আর নিজের আলো-পুলকিত-তনু—তার প্রকাশে ভাষা যে দিশাহারায়।

এই সব সাধনার ফলে শ্রীঠাকুরের সন্তান ভাবের প্রতিষ্ঠা হয় পূর্ণ—দেহ মনে এসে যায় এক অপরূপ দিব্যতা...এই রূপের কথা বলতে গিয়ে শ্রীমা বলেছেন,—থম থম করে চলে যেতেন গঙ্গায় নাইতে, লোকে চেয়ে থাকত—ঐ উনি আসছেন। দেহে সোনার ইষ্টকবচের সঙ্গে অঙ্গকান্তি মিশে থাকত এক হয়ে।

...বিদ্যুৎবন্ত ললিত-লাবণিম সে শিবতনুর রূপ ঢাকতে শ্রীঠাকুরকে চাদর ব্যবহার করতে হত—মা ভবতারিণীর কাছে জাগত কাতর প্রার্থনা,—ঢুকে যা, ঢুকে যা। ছেলের এ কাতর প্রার্থনা মার কাছে অপূর্ণ থাকে

নাই—এবার শ্রীনিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব—ভৈরবী মার কথা…তাই কি ঠাকুর ধ্যানের বুকে ধরা দিতেও হয়ে যান অধরা।

এই তন্ত্র-সমুদ্রে শ্রীঠাকুরের দীর্ঘ দুই বৎসর যায় কেটে—সন বারশো সাতষট্টির শেষ থেকে বারশো উনসত্তর পর্য্যন্ত।

সাধন কুটীর

পনেরো

মায়ের কৃষ্ণায়ত চিন্ময় দুটি চোখের ইঙ্গিতেই বুঝি সুরু হল বৈষ্ণব সাধনার অভিনব ইতিহাস—সাধনার প্রথমেই সুরু হয় সাধুসন্তদের সেবার ব্যবস্থা—বৈষ্ণব সেবন। কৃপাধিকারী মথুরের আর তর সয়না। সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘর সাধুদের সেবাসম্ভারে হয়ে ওঠে পূর্ণ। লোটা কম্বল, এমন কি সাধনের দ্রব্যাদি—অন্নপানির ত কথাই নাই—

শ্রীঠাকুরের কথা,—ফুল ফুটলে ভ্রমর এসে জুটে—তাই ভ্রমরের মত সাধককূল আসতে সুরু করল দলে দলে। পঞ্চবটীতে বসে যায় সন্তদের দিব্যমেলা, আর মুখর হয়ে ওঠে সন্তদের দিব্য ভজনে—এক এক সময় এক এক রকম সাধুদের ভীড় লেগে যায়, শ্রীঠাকুরেরই কথা,—সব পেট বৈরাগীর দল নয়, ভাল ভাল সাধুরা সব আসতেন—তাদের—সাধনে, ভজনে, আলাপে, সংলাপে দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠত উজ্জ্বল, আর দেখা যেত তাদের মধ্যমণির মত শ্রীঠাকুর আছেন বসে—সাধুদের রাজা, সব পথের দিশারী—দিব্যভাবে দলমল।

এমনি এক প্রেমমঙ্গল দিন, দেখা যায় ভাবরসে বিভোর এক সাধু এসে আসন বিছালেন পঞ্চবটীর কল্পমূলে—সন্ধানীর চোখ মেলে ঠাকুর এক ইঙ্গিতেই ধরতে পারেন এই আধিকারিক পুরুষকে—বুঝতে পারেন একে দিয়ে মার এক বিচিত্র বিলাস হবে অদূর দিক-রেখায়।

প্রথম চার বৎসরে সাধনের যে ঝড় বয়ে গিয়েছিলো—কখন দাস্য ভাবে, কখন সখ্য ভাবে—দিন যে কিভাবে কেটে যেত তার কোনো নিরিখ ছিল না। ভক্তরাজ মহাবীরের দাস্যভাবে বৃক্ষ আরোহণ আর ফল-মূল আহার…দেহ মনের এই একত্র সাধন শ্রীঠাকুরের চিরদিনের রীতি ছিল —শুধু মনের সাধনে, শুধু দেহের সাধনে তৃপ্তি হত না কোনদিনই—দেহেরই মন আর মনেরই ত দেহ…

বাৎসল্য-ভাব সাধনের আগে স্ত্রী-ভাবের আরোপে সাধনা হয়ে গেছে সুরু…সেদিন জানবাজারে রাসমণির বাড়ীতে পূজার মহামহোৎসব…

ভক্ত মথুর দেখেন এক মহীয়সী মহিলা, নানা আভরণে মার পাশে চামর বীজনে নিবিষ্ট—সেবানুরাগে, ভাবে, তনুতীরে বিন্দুদ্দাম বিকশিত …ওদিকে দেবীর শ্রীমুখে চিন্ময় হাসির একটুকরো—দিব্য আবেশে মন্দির যেন থমথম করছে। ভক্ত মথুর পারে না বুঝতে, কে ইনি? অন্তঃপুরে যান ছুটে গৃহিণীর কাছে; অবাক বিস্ময়ে শুনেন,—চিনলে না, ওযে আমাদের বাবা—স্ত্রীবেশে মাকে চামর করছেন। চেনা দুষ্কর। নিজেই বলতেন,—অচিনে গাছ দেখেছ, কেউ চেনে না।

ভাবের রাজা শ্রীঠাকুর যখন যেভাবে থাকতেন তাতেই তন্ময় হয়ে যেতেন, ডাইলিউট্ হয়ে যেতেন—শ্রীঠাকুরেরই কথা,—ভক্তি ভাব, কোমল ভাব…তাই এই ভাব সাধনের সময় শ্রীঠাকুর স্ত্রীবেশেই *বরদেহ করতেন সজ্জিত—দেহমনে* প্রকাশিত হত সেই বিলাস বিভ্রম, চামর করা, মালা গাঁথায়, কেটে যেত কত *দিব্যদিন—দিব্যরাত।*

এমনি করে বাৎসল্য রস সাধনের মুখে শ্রীঠাকুর নিজেকে তৈরী করে নিচ্ছেন, এমন সময় এই জটাধারীর হল প্রকাশ আর মার ইঙ্গিতে শ্রীঠাকুর তাঁর কাছে রামাৎ সাধনে নিলেন দীক্ষা।

বাবাজীর ছিল গোপন সাধন—বাইরে দেখা যেত একটি অষ্টধাতুর রামলালা মূর্তি নিত্যসঙ্গী। সেবা-পূজায়, তন্ময় আকুলতায়, মূর্ত্তি যেন মূর্ত্ত—জীবন্ত—দিব্য…এর অন্তরালে যে অদ্ভুত রহস্য ছিল লুকানো, সন্ধানী দৃষ্টিতে সেটীর পড়ে যায় ধরা—ঠাকুর দেখেন অষ্টধাতু নয়! এ যে চেতনঘন লীলামূর্তি। …দক্ষিণেশ্বরের রম্য একদিন—একদিকে হরছন্দা গঙ্গা, অন্যদিকে পূজাছন্দিত মন্দিরশ্রেণী। শ্রীঠাকুর আছেন বসে নিজ গর্ভগৃহে, লীলাস্ফুরিত দুটি আঁখি—সহসা বাবাজী আসেন ছুটে—চোখে এক মরণ মোহ…স্খলিত দুই চরণ…যেন সর্বহারা… এসেই যেন চিরচাওয়ার ধনকে পান, আঁকড়ে ধরে বুক নিঙরে বলেন,—আমি এত কষ্ট করে রেঁধে বেড়ে তোর জন্যে বসে আছি আর তুই এখানে খেলছিস—আমার সারা জীবনের মরণ সাধনার এই ফল? দয়ামায়া তোর কপালে সাত জন্মেও লেখেনি—বনে চলে গেলি, বাপ কেঁদে কেঁদে মরে গেল—তোর ভ্রূক্ষেপ নেই—তাতে আবার আমার মত

দীনের জন্য তোর আর কি ব্যথা বাজবে বল্? চোখের জলে, অভিমানে যেন ভেঙ্গে পড়েন—তারপর তাকে ধরে নিয়ে যান ছোট ছেলের মত··· একি সাধনা, না সিদ্ধি, না সিদ্ধের সিদ্ধি···।

চির মনের মাণিক, গোপন ধনকে এমনি ভাবঘন শিশু মূর্তিতে পাওয়া যে কত যুগের কত জন্মের সাধনা তা বলা কঠিন···যাই হোক বড় চুম্বকের টানে কিন্তু এই ভাবঘন শিশুর আর জটাধারীকে মনে ধরে না—তার হাতে খাওয়া, তার আদর আবদার যেন মনেই পড়ে না। সে ছুটে ছুটে আসে শ্রীঠাকুরের কাছে। বায়না ধরে এটা খাব, সেটা করব; কখন বা কোলে উঠবে, চলতে যেন পারে না—কখন কোলে আর থাকবে না—রোদে ঘুরে বেড়াবে—রাঙা চরণ ব্যথার ধূলায় কেমন সাজবে তাই দেখতে যেন অবুঝ···রোদের তাতে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে খেলার বিলাস যে যুগে যুগেই হয়েছে—ভুল ত হবার নয়··· ওদিকে বাবাজী অশ্রু-সায়রে থাকে বসে উপচার সাজিয়ে—বিরহ অভিমানে ধুলায় লুটায় তার জটিল শির···লীলা হয় ভক্ত ভগবানে— এবার লীলা দেবতার সঙ্গে দেবতার—যুগে যুগেই এ লীলা সাগরের মত উচ্ছল! হয়ত গঙ্গায় নাইতে যাবেন—রামলালা নিলো সঙ্গ। গঙ্গায় নেমে ঝাঁপাই ঝুর্‌ছে—যত বারণ করা যায় ততই উচ্ছলতা চলে বেড়ে···সরযূর নীল জলে নীলকান্ত-তনুর বিলাস জাগে মনে; উপরে আর কে ওঠে? শেষে ঠাকুর ধরেন চেপে—ভয়ে ত্রস্তে লীলায় জাগে থমক···অসময়ের বায়না—ক্ষিদে পেয়েছে, কি আর থাকবে—কিছু খই হল দেওয়া···হঠাৎ ওকি? ছেলে ওঠে কেঁদে—খইতে ছিল ধান জিভ গেছে চিরে··মায়ে পোয়ে হয় অশ্রুর বোঝাপড়া—যে মুখে রাণীর ক্ষীর, সর দিতে হত কত কুণ্ঠা, সেই মুখে দিয়েছি ধান, আবার জিভ গেছে চিরে—কমল ঠোঁটে অশ্রুর চুমা পড়ে ঝরে—বেড়েই ওঠে ব্যথা। শ্যামল নীলতনু—নাচন ছন্দে কখন আগে কখন পিছে যায় ছুটে—দিনে দিনে লীলার কমল যেন শতদল মেলে ওঠে ফুটে···ওদিকে জটাধারীর বুকে দুকূল-ভাঙ্গা বিরহ। শেষে একদিন জটাধারী এল ·রের কাছে—বিষাদ থমকিত—বর্ষণ ক্ষান্ত মেঘের মত—চোখে অশ্রু

হাসির শরৎ—এসেই বলে—ঠাকুর আমার—আমার লালজী, আজ আশ মিটিয়ে যেমনটি চেয়েছি তেমনটি হয়েই দিয়েছে দেখা—আজ আমার আর কোন দুঃখ নেই। আজ তোমার কাছে থেকে ওর সুখ, সেই আমার পরম আনন্দ—লালজী বলেছে সে আর যাবে না--তোমার কাছেই বেদনার ধনকে রেখে যাব··· তাই তোমাদের দুজনের কাছে চাই বিদায় —চির বিদায়···এমনি করেই কি প্রীতির বন্ধনে ঘিরে আবার নিজেই দাও ছিঁড়ে নিঠুর নির্ম্মম বিরহ-কোমল হাতে··· নিত্য লীলার একি বিলাস —কে জানে·········

—শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী সার্থক—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥

যোগেশ্বরী ভৈরবীর কাছে প্রবর্ত্তকের যে সাধনা, সেই সাধনার সিদ্ধের সিদ্ধি হল সাধকাগ্রণী জটাধারীর কাছে—বাৎসল্য ভাবের দীক্ষায় আর শিক্ষায়···জটাধারীও পেলেন শ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর সাধনার প্রতিষ্ঠা। শ্রীঠাকুরের পূতসঙ্গে বাৎসল্য ভাব সাধনায় তিনি যে এগিয়ে পড়েন একথা তাঁর নিজের কথা থেকেই আমরা বুঝতে পারি··· শ্রীঠাকুর সবাইকে এগিয়ে পড় বলতেন, কাঠুরের গল্পটি বলে—এ শিক্ষা তাঁর জগৎগুরু পদবী গ্রহণেরই ফল।

তবে জটাধারী আর রামলালার সঙ্গে ঠাকুরের যে মধুর লীলা বিলাস তার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া দুরূহ। জটাধারীর মত সাধক যুগে যুগেই বিরল—ইষ্টের দর্শন লাভই বিরল তার উপর সেই ইষ্টকে নিত্য নিত্য চিন্ময়রূপে দেখা আর তার সঙ্গে বিলাস আরো দুর্লভ! আবার শ্রীঠাকুরের সেই চিন্ময় রূপকে, জটাধারীর অতি প্রিয় বহুদিনের সাধনের ধনকে আপন করে নেওয়া আরো দুর্লভ···চিদঘন ভাবমূর্তিকে নিয়ে এমনি কাড়াকাড়ির বিলাস ভাবরাজ্যের রাজা ছাড়া আর কারো জীবনবেদে আছে বলে আমাদের জানা নাই। পৃথিবীতে এ লীলার পুনরাবৃত্তি আজও হয়নি—

ষোল

মানুষের মনে তিনটি ভাব আছে—চিন্তা, বোধ ও ইচ্ছা—পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের এই মত। এরা একত্র থাকে আর এদের পৃথক করাও কঠিন। তবে যখন যেটার হয় বেশী প্রকাশ, তখন সেটিই আমাদের কাছে বেশী কার্য্যকরী হয়। সাধনার রাজ্যে এগুলিকে করা হয়েছে উপায়স্বরূপ। মধুর ভাবে বা ভক্তিযোগে, বোধ বা ফিলিং তত্ত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়, জ্ঞানযোগে, চিন্তা বা থিঙ্কিং তত্ত্বের উপর জোর থাকে, আর রাজযোগে, উইলিং বা ইচ্ছা তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে। যার মনে যে তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে তার ভগবৎসত্ত্বার সঙ্গে সেই ভাবে সাধনায় আশু ফল লাভ হয় এ সুনিশ্চিত। তন্ত্রের সাধনাতেও এই ভাবে সাধনাকে সহজ গতিশীল করা হয়েছে। তবে ভাবের আবেগ-শৈলে, মানুষের পতন হওয়া স্বাভাবিক। চিন্তা বা ইচ্ছার রাজ্য অপেক্ষাকৃত কঠিন আর পতনও তেমনি অপেক্ষাকৃত অস্বাভাবিক। আর ভাবাবেগের পথ সহজ পথ, তাই সাধনায় এই পথের পথিকদের সংখ্যাই অধিক। আর তাদের পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনাও সেই কারণে অধিক। অবশ্য বাংলার আকাশে বাতাসে ভাবের আধিক্য থাকায়, বেদান্ত সাধনার পরিবর্তে তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনার উর্বর ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলার মাটি।

সাধারণতঃ বৈষ্ণব মতে ভাব পঞ্চরসাশ্রিত—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তভাব ছিল ঋষিদের আর দাস্য ভাব মহাবীরের। সখ্যভাবে ব্রজবালকগণ ভগবানকে লাভ করেছিলেন। বাৎসল্যভাবে জননী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন আর শ্রীমতী ছিলেন সর্বভাবময়ী—মধুর ভাবের মূর্ত-বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি—শ্রীমতীর ভাবের অংশ মাত্রও জীবের সাধ্য নয়, বৈষ্ণব আচার্যদের এই মত—রায় রামানন্দ মুখে মহাপ্রভুর আস্বাদন—

> ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
> যাঁহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥

পঞ্চভাবের মধ্যে গোস্বামীপাদগণ ব্রজবনপুষ্ট মধুরভাবকেই সর্বপ্রধান স্থান

দিয়েছেন। অবশ্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, ভাবপঞ্চকের ক্রমান্বয়ে একে তার পূর্ববর্তীর ভাবযুক্ত হয়ে থাকে; আর মধুর ভাব সর্বভাবের শীর্ষে থেকে সর্বভাবের মাধুর্য আস্বাদন করায়। মনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যেকোন ভাবের মধ্যে অন্য ভাবগুলি বীজাকারে রয়েছে। তবে বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা মাতৃভাবের (মেটারন্যাল্ ড্রাইভ্) প্রাধান্যের কথা ব্যবহারিক ভাবে দেখতে পেয়েছেন, একথা পাশ্চাত্য শাস্ত্রে আমরা পাই। শ্রীঠাকুরকে জননী ভবতারিণীও এই কথাই জানিয়েছিলেন সাধনার শেষ রহস্য হিসাবে—মাতৃভাব, সাধনার শেষ কথা—তাই শ্রীঠাকুর সব ভাবসাধনে ডুব দিলেও মাতৃভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন আজীবন।

মার ইঙ্গিতে মধুর ভাব সাধনে অগ্রসর শ্রীঠাকুরের বেশভূষার পরিবর্তন আপনিই হয়েছিল। উপনিষদে আছে "তপসোবাপ্যলিঙ্গাৎ".. তপস্যা করবার সময় যথাযথ চিহ্নধারণ দরকার। শ্রীঠাকুরও তাই যখন যে ভাবে সাধন করেছেন তার উপযুক্ত চিহ্ন বা ভেক ধারণ স্বতঃই করেছেন। এমনি করে শাস্ত্র মর্যাদা রক্ষা করতেই যে অবতারদের আগমন। স্বামিজীও বলতেন,—এবার নিরক্ষর হয়ে আসার উদ্দেশ্য—শাস্ত্র যে সত্য—শাস্ত্রে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ থাকলেও শাস্ত্রের যা মুখ্য কথা যা চিরদিন দ্রষ্টাদের সত্য উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রমাণিত করা। যাই হোক দেখা যায়—তন্ত্র সাধনার সময় রুদ্রাক্ষাদি ধারণ, বাৎসল্য সাধনায় বৈষ্ণব জনোচিত চন্দনাদি ধারণ, আবার বৈদান্তিক সাধনকালে গুরু দত্ত কাষায় ধারণ করে শাস্ত্র মর্যাদা রক্ষা করেন। মধুর ভাবের সাধন সহায়ক স্ত্রীজনসুলভ বেশভূষায় নিজ বরাঙ্গ সজ্জিত করেছিলেন, এই প্রয়োজনে—একদিকে শাস্ত্র মর্যাদা···অন্যদিকে—দেহ মনে সাধনার সঙ্গতি...ভগবান ঈশার বাণী,—আমি পূর্ণ করতেই আসি, নষ্ট করতে নয়।

আজু দখিণাপুরে নব আনন্দ বাধাই···

সেদিন উষার মাঙ্গলিকের মত সবার চোখে এক অপরূপ দৃশ্য পড়ল—

রাই করত অভিসার
শিরিষ কুসুম জিনি কোমল পদতলে
বিপথে পড়ত অনিবার।

যেন দখিনাপুরের নবব্রজে আজ ব্রজেশ্বরী স্বয়ং অবতীর্ণা—রাতুল রক্তোৎপল চরণ আধ ধরণীর ধূলায় পড়ে কি না পড়ে, চাঁচর কেশপাশ, আভরণ সিঞ্জিত বরদেহ—হাতে ফুলের সাজি...সকলে চমকিত হয়ে ভাবে কে বরবর্ণিনী.. ভাগিনেয় হৃদুও দূর থেকে ভাবে কে ইনি.. কাছে এসে দেখে...এযে আমাদের ঠাকুর.. মধুর ভাবে আজ বিরহিণী সেজেছেন-- মথুরামোহন পরমানন্দে এনে দিয়েছেন সব আভরণ ইষ্টের চরণে... কান্তভাবের সাধনা, বিরহের সাধনা, বুক নিঙড়ে ওঠা নয়নাসারে বুক যায় ভেসে—অন্তর মথিত করে নিরন্তর জাগে—কোথায় ব্রজরাজ—কোথায় মধুর মথুরাপুর—বল্লভের জন্য গাঁথেন মালা, বুক ভাঙ্গা আকুতি নিরন্তর হয় নিবেদিত—বিরহ জরজর তনুতে আবার জাগে সেই প্রথম দিনের দাবদাহ—বুক নিঙরে জাগে—কোথা সেই শ্যামসুন্দর নিঠুর নটবর মোহন মুরলীধারী—কখন মা ভবতারিণীর চরণান্তিকে জানান ব্রজরাজের দর্শন প্রার্থনা—কাত্যায়নীর প্রসন্নতা না হলে ত শ্যামলসুন্দরকে যাবেনা পাওয়া...কৈশোরের স্বপ্ন ছিল ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হব—সুন্দর হবে বরতনু--আর থাকবে একটি গরু, সারাদিন তার দুধে মিষ্টান্ন করে রজনী জেগে অপেক্ষা করব শ্যামল কিশোরের অভিসারের—সে বেদনার অভিসার আজ আর স্বপ্ন নয়—সেই ব্রজমাধুরীর অপার্থিব বিলাস ধূলায় বিলাতে আজ বুঝি শ্রীমতীর নব বরবেশ.. ইতিহাসের এ এক নব-ভারতী...শাস্ত্র হয়ে ওঠে উজ্জ্বল.. ভক্তের প্রাণতীর্থে জাগে অনুরাগের বর্ণ... ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহ-বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের কথা শুনা যায় শাস্ত্রমুখে—শ্রীঠাকুরের শরীরেও সেই অনুভব, সেই দাহ, বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ সেই সবই গিয়েছিল দেখা, আর তাঁরই মত কৃষ্ণ বিরহের অসহ যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে মৃতের মত থাকতেন পড়ে...ভাবেতে ভরল তনু হরল গেয়ান।

বৈষ্ণব মতবিবেকে আছে শ্রীমতীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন অসম্ভব—শ্রীঠাকুর এবার শ্রীমতীর কৃপাকণার জন্য, তাঁর প্রসন্নতার জন্য সেই বেদন-গহন রূপসায়রে নিজেকে ফেলেন হারিয়ে...নিরন্তর সেই বররূপের ধ্যানে হলেন তন্ময়—এই বুক নিঙরান আকুলতায় অভিষ্ট যে সরে থাকতে পারে না

কোন দিন—সহসা এল সে সুদিন ··মহাভাবময়ী, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-স্বরূপিনী শ্রীমতী দিলেন দর্শন—নাগরকেশরের কেশরের মত রম্য সে রূপ—সে অরূপ রূপের ত বর্ণনা হয় না…মহাজনদের যুগ যুগ সাধনা হার মেনেছে সে রূপকদম্বের প্রকাশে—

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই
তাঁহা তাঁহা থল কমল দলমলই।
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ
তাঁহা তাঁহা কমল পরকাশ।
যাঁহা লহু হাস সঞ্চার
তাঁহা তাঁহা অমিয়া বিথার
হেরইতে সে ধনি থোর
অব তিন ভুবন অগোর॥

আর আমাদের শ্রীঠাকুরের সে দর্শনে কি হল…

ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর
রাইরূপ হেরি গরগর অন্তর…

দুইরূপ আর দুই থাকে না—এক হয়ে যায়।

ন সো রমণ ন হাম রমণী
দুঁহু এক পেশল মনোভাব জানি…

মধুর ভাবের শেষ কথা—প্রেমাস্পদের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া · আর ভিন্ন দেহমন থাকা ত সম্ভব নয় ··

চণ্ডীদাসে কয়—দুঁহু এক হয়—
হয় বা না হয় ভিন্ন···

কৃষ্ণ আস্বাদনের ছল আর যে রাখা যায় না…

রহে যে বসিয়া—দুঁহু মিলাইয়া
সকল একই তনু…

এরপর শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয়ে ওঠে অবাধ…যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে…মরমী কবিদের কল্পনা সার্থক করতেই যে পরম কবিদের আসা।

…সেদিন আপন ভাবে আপনহারা হয়ে আছেন বসে…বিষ্ণু মন্দির প্রাঙ্গণে…শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের আস্বাদন-বিলাসে থমকিত বিদ্যুতের মত এসে দাঁড়ান জ্যোতিঘন তনু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ…আর শ্রীমূর্তির পদদ্বন্দ্ব থেকে জ্যোতি তরঙ্গ এসে ভাগবৎ স্পর্শ করে শ্রীঠাকুরের বুকে যায় মিলিয়ে—তিন বস্তুকে করে অখণ্ড…'ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান তিনে এক একে তিন'…এই তত্ত্বের প্রকাশ সেদিন এমনি স্বতই হয়েছিল। ভগবান যেদিন ভক্ত হন সেদিন লীলা হয়ে ওঠে এমনি স্পর্শ পুলকের ধন—এমনি গহন নিবিড়।

মধুর ভাবের সাধন শেষ হয় আঠারশো পঁয়ষট্টি সালে। এর পরই আসেন অদ্বৈত সিদ্ধি নিয়ে পরমহংস তোতাপুরীজী, সুরু হয় সাধনের আর এক গম্ভীর অধ্যায়…।

রাধাকৃষ্ণ

সতেরো

দক্ষিণেশ্বরী ভবতারিণী ভবভয়হারিণী আছেন দাঁড়িয়ে—ত্রিনয়নে করুণা-নির্ঝর—আলোছায়ায় মন্দির করছে থমথম···চেতন-ঘন বিগ্রহ যেন কথায় আকুল—আকুল কালো চোখে যেন রয়েছেন পথ চেয়ে···। সহসা এসে দাঁড়ান ভাব গরগর শ্রীঠাকুর···মার মুখ-চাওয়া ছেলে, এসেই একান্ত আকুতিতে জানান অন্তরের প্রার্থনা—আর মাও দেন সম্মতি···সঙ্গে সঙ্গে চলেন তেমনি বেপথু পদে···ফিরে যান গঙ্গাতীরের চাঁদনীতে, যেখানে দাঁড়িয়ে জটাজটিল এক দীর্ঘায়ত পুরুষ—প্রণামান্তে জানান মার অনুমতি··· ইনিই পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী—নর্মদাতীরে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের সাধনায় বেদান্ত বিজ্ঞানে হয়েছিলেন সিদ্ধ—আর নির্লিপ্ত বায়ুর মত যদৃচ্ছা ভ্রমণরত হয়ে চলেছেন তীর্থ হতে তীর্থান্তরে—সিদ্ধ তীর্থঙ্কর···আজ এসে পড়েছেন শ্রীদক্ষিণেশ্বরে···জননীর বোধহয় ইচ্ছা ছিল স্নেহের দুলালকে বেদান্তের শেষ সাধনে দেবেন দীক্ষা আর তোতাপুরীজীরও হবে পূর্ণাভিষেক কালী-ব্রহ্মমন্ত্রে, দক্ষিণেশ্বরের সমন্বয়ের মহাসমুদ্রে ডুব না দিলে ত কারো পূর্ণতা হবে না···আর ঠাকুরও হয়ত সেদিন সেই চাঁদনীতে বসে গাইছিলেন —ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন—আর ভাবছিলেন অনন্ত ভাবসমুদ্রে আবার কবে ডুব দেব, আবার কবে মার অভয় চরণান্তিকে কুড়িয়ে পাব নব তত্ত্বমণি।

দৈব প্রেরিত তোতাপুরী প্রথম দেখাতেই যেন কতকটা বুঝতে পারেন শ্রীঠাকুরকে—সেদিন চাঁদনীতে মার চিন্তায় একান্ত আনমনা—শ্রীঠাকুর আছেন বসে—আলোঘেরা মুখে চোখ পড়লে চোখ যায় ঠিকরে, হয়ে যায় সমাহিত···। প্রথম দর্শনেই পুরীজী হন বিস্মিত, এমন উত্তমপুরুষ ত তাঁর দৃষ্টিতে পড়েনি কোথাও···বাংলার এই চঞ্চল প্রকৃতিতে এমন আধারও আছে!—আহত বিস্ময়ে ধীরে যান এগিয়ে—উত্তম আধার পেলে আচার্যের মন থাকে না স্থির।···ঈশ্বরপুরীর প্রব্রজ্যা সে ত নবদ্বীপ চন্দ্রের জন্যেই।

আকাশের অভিসারেই ত মেঘ ছুটে আসে—তার জন্যেই ত তার কাজল কালো রূপ—।

জগৎগুরুদের জীবনবেদের কথায় কোথাও কারো কোন ক্ষুণ্ণতার হয় না উদয়...পূর্ণতা সাধনের জন্যই ত তাঁরা আসেন—আসেন ধন্য করতে—আপন হতেও আপন করতে...

দক্ষিণেশ্বরে সে সময় শোকতাপজীর্ণা জননী করছেন বাস, দেবতনয়ের সান্নিধ্যে – রিক্ত সরলতা নিয়ে ; নিত্য স্মরণ মনন এই ছিল তাঁর শেষ অবলম্বন। বিশেষ কোন চাহিদা, বিশেষ কোন আশা ছিল না কোনদিনই...আজও জীবনের এই শান্ত সন্ধ্যায় ঠাকুরই তাঁর একমাত্র আশার দেউটি, তাঁর অঞ্চলের নিধি, চির বুক চেরা ধন। শ্রীমান মথুর ভক্তহৃদয়ের একান্ত আকুতিতে গেছেন সেদিন তাঁর চরণ-বন্দনায়। ভাবেন শ্রীঠাকুরকে একটি তালুক লেখাপড়া করে দিতে গিয়ে বিপত্তির কথা...সম্পত্তির নামে শ্রীঠাকুরের রুদ্ররূপ আর নিজের ব্যথাহত চিত্তে ফিরে আসা। চতুর ভক্ত মথুর এবার শেষ চেষ্টায় যান এগিয়ে – বৃদ্ধা জননীকে যদি দিতে পারেন কিছু সম্পত্তি...প্রশ্ন করেন, – ঠাকুরমা আমার কাছে ত কিছু চাওনা আমি ত পর নই, যা প্রয়োজন আছে দেবজননী আমার কাছে নাওনা চেয়ে। বারবার এমনি অনুনয়ে বৃদ্ধা পড়েন চিন্তায়, মনে পড়ে এক আনার তামাক পাতা, মুখে দেবার গুলেরই তাঁর অভাব...এই অর্থসর্বস্ব যুগে, এই নিত্য বর্ধমান বাসনার বহ্নিমুখে শ্রীঠাকুরের মত ত্যাগীশিরোমণিকে বুকে পেতে হলে এমনি সরল নিস্পৃহ জননীরই প্রয়োজন – তেজস্বী মথুরের দুচোখে নামে গঙ্গাধারা – মহৎ দেখে কাঁদতে পারা তবেই কাঁদা ধন্য হয়—চিরন্তনী এই বাণী...

মাতৃভক্তিতে শ্রীঠাকুর ছিলেন আদর্শ। মার মনে পাছে ব্যথা জাগে তাই তোতাপুরীজীর কাছে চাইলেন গোপনে দীক্ষা – পুরীজীও হলেন সম্মত...আর অনিকেত সন্ন্যাসী নিজের আসন বিস্তীর্ণ করলেন পঞ্চবটী মূলে, শুভদিনের প্রতীক্ষায়...

ভারতের ভাগ্যে এমন শুভদিন যুগে যুগেই বিরল...যেদিন কেশব ভারতীর কুটীরে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসমন্ত্রে মুণ্ডন করেন তাঁর কপোলকুন্তল শত

শত আকুল নরনারীর অশ্রু বিনিময়ে, জগতের মুক্তি-তীর্থ সৃষ্টি করতে; সে এক বিষাদ সুন্দর দিন...আর এমনি আর এক অশ্রু-হাসির দিনে পঞ্চবটীর সাধন কুটীরের গোপনে ভাব-বেপথুতনুতে শত সুষমা জড়িয়ে বসেছেন শ্রীঠাকুর আপনাকে নিঃশেষে আহুতি দিতে, জগতের দুঃখ দৈন্যের বিনিময়ে নিজেকে দিতে বিকিয়ে, শুধু জননী যোগেশ্বরীর চোখে জেগেছিল দুটি ফোঁটা অশ্রু—আর ধরণী মৌনমুখে, নিথরিত বুকে শুধু অপেক্ষাই করেছিল ভাবী মঙ্গল মহিমায়...

কৃতশ্রাদ্ধ, মুক্তির দিশারী সেদিন বসেছেন সমিদ্ধ হোমাগ্নি সান্নিধ্যে—পূত বৈদিক মন্ত্রছন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে বিশ্বের হৃদয়-তন্ত্রী—মধুছন্দার মন্ত্রমালায় মধু ক্ষরিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে। সে ধ্বনি বিরাটের চরণ স্পর্শ করে যেন ফিরে আসে নব জাগরণের—নব উদ্বোধনের বাণী নিয়ে...মায়া উপহিত জীব-চৈতন্যের স্বরূপ নিজেতে আরোপিত করে প্রার্থনা মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে, - পৃথ্বী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চ শুদ্ধ হউক - আহুতি প্রভাবে রজোগুণ প্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা... এমনি বহু প্রার্থনায় হোম হয় শেষ। গুরুদত্ত কৌপীন, কাষায় ও নামে ভূষিত শ্রীঠাকুর স্বয়ং ব্রহ্মের মত আছেন বসে আর তাঁর অগ্রে মহাভাগ্যবান পুরীজী বেদান্ত নির্ণীত উপদেশাবলী শিষ্যকে যাচ্ছেন বলে—উছলিত গঙ্গায় সেদিন যেন নিথরিত শান্তি...জননী ভবতারিণীর মুখে ফুটে উঠেছে বেদ হাসি...। আর ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী বলে চলেছেন,—যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা কথা শুনে তাহা তুচ্ছ, তাহাতে পরমানন্দ নাই। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্...ইত্যাদি। সেদিন গুরু যেন সমস্ত শক্তি সমাহিত করে শিষ্যের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভাসিত করতে চাইছেন নির্বিকল্প সমাধি সহায়ে - কিন্তু মায়ের ছেলে শ্রীঠাকুরের হল এক বিপত্তি—জগতের ইতিহাসে কোন সাধকের এ পর্যন্ত যে সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই সেই দিব্য-সঙ্কটে ব্রহ্ম হলেন আবৃত। পুরীজীরও সঙ্কট—শ্রীঠাকুরেরও সঙ্কট—মন নির্বিকল্প হয়েও যেন হয় না - সব বিষয় সহজেই হয় নিরস্ত কিন্তু ভবতারিণীর বরাভয়া মূর্তি - যুগে যুগে যাঁর কৃপায় হয়েছেন ধন্য—হারিয়েছেন নিজের

সত্ত্বা—তাঁকে অ-বিষয় করা হয়না যে…শেষে জ্ঞান-খড়্গা স্বয়ং মা-ই দিলেন যেন এনে—মাতৃমূর্তি গেল সরে…তখন নিত্যমুক্ত শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ শ্রীঠাকুর হলেন সমাধিতে আপনহারা—যেন কপাট পড়ল বার দুয়ারে …নামরূপাত্মক জগৎ হল অন্তর্হিত…দেশকালাতীত আত্মাই শুধু বিরাজিত হয়ে থাকে স্বমহিমায়…আর তোতাপুরী বিরাট বিস্ময়ে চুপে চুপে কুটীর থেকে এলেন বেরিয়ে—দুয়ারে তালা দিয়ে নিজের আসন বিছালেন পঞ্চবটি মূলে, শ্রীঠাকুরের আহ্বান প্রতীক্ষায়…দিন যায় রাত আসে—উদগ্রীব প্রহর গণনায় পুরীজী হয়ে উঠেন আকুল…কুটীরে নাই কোন সাড়া—নাই কোন স্পন্দন—এমনি করে তিন দিন হল অতীত—শঙ্কাসঙ্কুল হৃদয় আর পারে না থাকতে, ছুটে যান কুটীর সান্নিধ্যে—খুলে ফেলেন অর্গল… দেখেন জ্যোতির্মণ্ডলীতে ঠাকুর তেমনি নিবাত-নিষ্কম্পা-দীপশিখার মত আছেন বসে—সমাধির নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে—ভাবেন একি অদ্ভুত মায়া—যে নির্বিকল্প অবস্থা লাভ তাঁর চল্লিশ বৎসর সাধনার ধন তাই মাত্র এক মুহূর্তে অধিগত হল কোন রহস্যে—শিষ্যের লক্ষণ দেখে সন্দেহেব অবকাশ মাত্র থাকে না…আনন্দ বিস্ময়ে ভাবেন কে এই দিব্যপুরুষ—যাঁকে বেদান্ত দীক্ষা দিয়ে আজ তিনিও ধন্য—শাস্ত্রও পূর্ণ…নব উষসীর উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে ছুটে আসে এক ঝলক আলোর মাঙ্গলিক…।

সীতানাথ পাইনের বাড়ী

আঠারো

কিন্তু মার মুখে জাগে এক অলখ অদ্ভুত হাসি...শ্রীঠাকুরের বেদান্তের অদ্বৈত সিদ্ধি ত হল, তবু পুরীজী কেন পারেন না দক্ষিণেশ্বরের মায়া নির্মুক্ত হতে...পুরী গোস্বামীর নিয়ম ছিল তিন দিনের বেশী কোথাও থাকবেন না—নাগা সম্প্রদায়ের মণ্ডলীশ্বর তিনি—বায়ুর মত মুক্ত হয়ে বিচরণ করবেন দেশ হতে দেশান্তরে, এই ছিল তাঁর সহজ সঙ্কল্প—শিশুর মত আবরণহীন, বন্ধনহীন জীবন ছিল পুরীজীর—দিবসের অধিক সময় শবের মত থাকতেন পড়ে ব্রহ্মধ্যানে—পাশে ধুনীর পূতঅগ্নি নিত্য সাক্ষীর মত থাকত জেগে, আর গভীর গম্ভীর নিশীথের গোপনে নির্বিকল্প ধ্যানে নিজেকে দিতেন বিলীন করে—এই ছিল তাঁর নিত্য নিয়মের বজ্রকঠিন বন্ধন...রহস্যময় শ্রীঠাকুর আর চির-রহস্যময়ী জননীর মাঝে কি যেন হয় বোঝা পড়া—গুরুদক্ষিণা ত দিতে হবে...গুরু শিষ্য আছেন বসে; সম্মুখে নিত্য-সাক্ষের ধুনী। প্রশ্ন করেন ঠাকুর,—হ্যাঁগো, তোমার আবার ধ্যান কেন—নির্বিকল্প সিদ্ধি ত হয়ে গেছে। প্রসন্ন ইঙ্গিতে পুরীজী দেখিয়ে দেন তাঁর চির উজ্জ্বল লোটাটি। বলেন,—নিত্য না মাজলে মলিন হয়ে পড়ে না? তেমনি মনকেও নিত্য সমাধিতে নির্মল রাখতে হয়।—গুরুর এখনও বোঝার বাকী। শিষ্য দিব্য-হাসি হেসে বলেন,—যদি সোনার লোটা হয়?...গুরু বিস্ময় বিমুগ্ধের দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন,—সত্য, তাহলে আর মাজা-ঘষার নাই প্রয়োজন—নিত্য-পুরুষের মন যে সোনার লোটা...

তমসা ছাওয়া এক অমারাত্রি—পুরীজী উঠে বসেছেন, সমাধির নিস্তরঙ্গে মনকে করবেন বৃত্তিহীন—হব্যবাহন পবিত্র ধুনী হয়ে ওঠে উজ্জ্বল—পঞ্চবটী হয়ে ওঠে ধ্যান গম্ভীর। সহসা পঞ্চবটীর শাখায় জাগে এক অদ্ভুত কম্পন...চেয়ে দেখেন দীর্ঘাকৃতি এক পুরুষ নেমে আসছেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ অভীপ্রতিষ্ঠ সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন,—কে তুমি? উত্তর আসে,—আমি এই দেবারামের রক্ষক—মহাদেবের অনুচর ভৈরব। পুরীজী হেসে

উত্তর দেন,—উভয়েই ব্রহ্মের প্রকাশ—এস ধ্যান কর…স্মিতহাস্যে ভৈরব যান মিলিয়ে…

পরদিন—তোতাপুরী আর ঠাকুর আছেন বসে—রাত্রের ঘটনা শুনে শ্রীঠাকুর বলেন,—সত্যিই উনি দেবভূমি রক্ষক ভৈরব, আমাকেও দিয়েছেন দর্শন সময়ে সময়ে…।

সেদিন শ্রীঠাকুর একটু চিন্তিত—কোম্পানিবাহাদুরের বারুদখানা তখন দক্ষিণেশ্বরের পাশে—সরকার চাইলেন দেবস্থান অধিকার করতে রাজকীয় শক্তিতে—দেবতার চিন্তা—দেব-ভৈরব পারেন না সইতে। দেখা দিয়ে দিলেন আশ্বাস—রাণী রাসমণির কাছে সে যাত্রা কোম্পানীর হয় হার। আর একবারের কথা, পঞ্চবটীর নিশুত রাত্রি, ভৈরবের হল প্রকাশ। স্বামিপাদ তখন জ্বলছেন তপস্যার অগ্নিতে—জ্বলন্ত ধুনীর কাঠ নিয়ে নিজ অনুচরকে করেন সংযত—এ এক রহস্য বটে। অন্য একদিনের কথা—মথুরামোহনের ছেলের সংকল্প পঞ্চবটীতে করবেন জলসাঘর। শ্রীপ্রভুর জাগে উদ্বেগ, ডেকে বলেন,—কে আছ মহাপুরুষ—দেবস্থান যে যায়। ঝড়ের দোলায় এসে হাজির দেবানুচর—জানান অভয়ের ইঙ্গিত। আর এক রহস্যের কথা—পুরিজী শ্রীঠাকুরকে কিমিয়াবিদ্যা দানের সংকল্প জানান। এই বিদ্যায় ইতর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যায়। গুরু-পরম্পরা প্রাপ্ত এই বিদ্যা সাধুসম্প্রদায় তাঁদের স্বার্থগন্ধহীন প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। মাতৃনিষ্ঠ সন্তান, যাঁর প্রাণে নিত্য জাগ্রত—অষ্ট সিদ্ধি চাই না মা—তাঁর কাছে এ সব সিদ্ধাই যে একান্ত হেয় বলে পরিত্যক্ত হবে একথা বাহুল্যমাত্র। গুরুর এ শিক্ষারও প্রয়োজন ছিল।

পুরিজী পাঞ্জাবের লুধিয়ানার অধিবাসী ছিলেন বলে শুনা যায়, আর সাতশ নাগা সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন মণ্ডলীশ্বর—পরমহংস পদবীতে প্রতিষ্ঠিত। পরমহংস না হলে কেউ মণ্ডলীশ্বর রূপে গণ্য হতেন না—তোতাপুরিজী পরমহংসই ছিলেন। বিশেষতঃ যতদূর জানা যায় তিনি বাল-ব্রহ্মচারীরূপেই গুরু-গৃহে আসেন। যোগীরাজ তাঁর গুরু, গুরুগৃহে গুরু-সন্নিধানে ধীরে ধীরে জ্ঞাননিষ্ঠার ফলে চল্লিশ বছরের সাধনায় নির্বিকল্পে হন প্রতিষ্ঠিত…'চারাগাছে বেড়া দেওয়া' জীবন তিনি পান চিরন্তনের

জন্যে—ফলে জগতে যে মায়ার খেলা কিছু থাকতে পারে, 'সাবাস মা দক্ষিণে কালী, ভুবন ভেল্কী লাগিয়ে দিলি' বলে মহামায়ার কিছু খেলা থাকতে পারে—এ বিষয়ে পুরিজী ছিলেন একেবারে মায়া-উপহিত। ভবতারিণীর কথা, শক্তির কথা শুনে পুরিজী হতেন রহস্যে অধীর—ব্রহ্মজ্ঞানের দম্ভে, নাম করা শুনলে বলতেন,—কাহে রোটী ঠোক্‌তে হো? ভক্তির পথ—ভগবানকে আপন হতেও আপন করে নেওয়ার পথ যে সম্ভব,—এ বিষয়ে তাঁর জানাশোনা ছিল একান্ত অল্প—তিনি শুধু জানতেন শান্তভাবে স্ব-স্বরূপে থাকা···কিন্তু ঈশ্বরও যে মায়ার রাজ্যে মায়াধীশ—এ বিজ্ঞানে আজও তাঁর হয়নি দীক্ষা।

কিন্তু সে পরিচয়ের দিন এসে পড়েছে—ব্রহ্ম এসে পড়েছেন মহামায়ার খাসতালুকে—শ্রীদক্ষিণেশ্বরে—পুরুষকারের সঙ্গে দৈবের আজ মহাপরীক্ষার দিন···মনে পড়ে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসীতে আচার্য শঙ্করের সঙ্গে মহামায়ার ছলনা--গঙ্গা-গর্ভ হতে উত্থানে অসমর্থ আচার্যের কাছে জগজ্জননী জরতী বেশে দেন দেখা, বলেন,—গঙ্গা গর্ভে কেন বাবা?··· আচার্য উত্তর দেন,—মা আমি উত্থান শক্তিহীন···হাসিয়া জননী দেন উত্তর,—কিন্তু, শক্তি যে মান না বাবা?···সহসা আচার্যের প্রজ্ঞা-নয়ন যায় খুলে আর সেই মুহূর্তে বেরিয়ে আসে প্রসিদ্ধ মাতৃগাথা···

শিবঃশক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি (আনন্দ লহরী)

শক্তির চরণে পুরুষকারের ভূলুণ্ঠ প্রণাম···

রাত্রি নিথর, নিস্পন্দ···প্রকৃতির এই প্রকাশ-গোপন-রূপ নিয়ে মহাকালী অধরা অসীমারূপে আছেন দাঁড়িয়ে, অস্ফুট হাসিতে দিক-দেশ-ছেয়ে···ঘুমন্ত আপন ভোলা সন্তানের শিয়রে দাঁড়িয়েছেন স্নেহ স্নিগ্ধ সর্বাণী, সর্বসন্তাপহারিণী বিশ্বজননী···যেন বেদমন্ত্রের নাসদীয় সূক্ত ধ্বনিত হচ্ছে—তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না···তমাচ্ছন্ন জল ছিল কি···মৃত্যুও ছিলনা, অমৃত্যুও ছিলনা···দিন রাত্রির ব্যবধানে আলোও ছিল না···আদিতে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন যেন প্রকাশহীন ছিল সৃষ্টির মহাজলধি—সেই অন্ধকারনির্বাণে নিজেকে বিলুপ্ত করতে গঙ্গাগর্ভে

চলেছেন এক বিরাট পুরুষ…মন সমাধিতে অন্তর্মুখ—ধীর পদক্ষেপে চলেছেন বিলুপ্তির পথে…নদী যেমন চলে সাগর বুকে হারিয়ে যেতে, সীমা যেমন নিত্য হারায় অসীমাতে…মুখে চোখে নাই কোন ক্ষোভ, নাই কোন শোকের রেখা—সহসা তাঁর অন্তর মথিত করে জাগে এক আকুল নিবেদন…এ কি মায়া—অগাধ গঙ্গা আজ জলহীন! ডুবে যাবার মত জলও নাই গঙ্গার বুকে—প্রায় পরপারে এসে পড়েন তবু জানুসন্ন রয়ে গেছে জলরেখা…সহসা সেই অরূপ হয়ে ওঠে রূপায়িত।

…জাগেন মহামাতৃকা…সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিণী ভবতারিণী…রহস্যময়ীর স্মিতাধরে ঠিকরে পড়া করুণা কণায় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অপ্রেমা যায় মুছে। সর্বসন্তাপহরা মার কোলে উঠে ছেলের নয়নপল্লবে নেমে আসে অফুরান শান্তি…অসীম আনন্দ…ফিরে আসে নবজীবনের বাণী নিয়ে, নব-ছন্দের ঋক্ নিয়ে…আজ তিনি জেনেছেন তাঁর আপন মাকে—অসীমা আজ করুণার্দ্র রূপে দিয়েছেন ধরা…গঙ্গাগর্ভ দ্রষ্টার অনুভূতিতে গভীর অম্বারবে ওঠে ভরে…ফিরে আসেন পায়ে পায়ে—অম্বাভবানী ধ্বনিতে গঙ্গাগর্ভ মুখর করে…নির্গুণ ব্রহ্মের আজ সাকার রূপে পেয়েছেন দর্শন…আজ অম্বাভবানী তাঁর স্ব-স্বরূপ দিয়েছেন জানিয়ে—'লীলাও সত্য' —পরদিন শ্রীঠাকুর পঞ্চবটীতে এসে দেখেন সে মানুষ আর নেই।

তিনদিন থাকার ছিল ইচ্ছা, দীর্ঘ এগারমাস হয়ে গেছে সায়। যোগনিষ্ঠ দৃঢ় শরীর বাংলার জল হাওয়ায় হয়ে পড়ে কাতর—তোতাপুরীর দেহে অতিসার রোগের হল সৃষ্টি—সমাধির সপ্তভূমে মনকে আর যায় না রাখা—বার বার নেমে আসে মায়ার রাজ্যে, দেহ পিঞ্জরে, পঞ্চভূতের ফাঁদে—অনেক দিনের চেষ্টাতেও যখন অক্ষম হয়ে পড়েন তখন পুরুষ সিংহ দেহ অধ্যাসকে চান গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিতে। ব্রহ্মলীন পুরুষ হবেন বিদেহমুক্ত, পুরুষকার সহায়ে—পুরুষকার সহায়েই তিনি হয়েছেন শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ…কিন্তু মহামায়ার রাজ্যে একমাত্র পুরুষ সেই পুরুষোত্তম —পুরুষকার যে তাঁরই…আর মহামায়া যে তাঁরই স্বরূপ…তিনি দ্বার ছেড়ে না দিলেত হয় না—শ্রীঠাকুর যা এতদিন পুরিজীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন —এবার শ্রীঠাকুরের কথায় আর রহস্য জাগে না…জাগেন অম্বাভবানী স্বয়ং।

বলেন,—দেখো মার কথায় রহস্য করতে, তাই মা তোমায় এতদিন আটকে রেখেছিলেন। আজ বুঝলে তাঁর স্বরূপ—জগজ্জননীর কৃপা না হলে কিছু হয়না। গাছের একটি পাতাও নড়েনা…সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র কুল কিনারা নাই, ভক্তি হিমে স্থানে স্থানে বরফ হয়ে যায়—অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তিভাব, কখন কখন সাকার-রূপ ধরে থাকেন—ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন—আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—মধ্যে সীতা-রূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণ-রূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই। তাঁর কৃপা পেতে হলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়; তিনিই মহামায়া,—জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে মন্দিরে যাওয়া যায়—বাইরে পড়ে থাকলে সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না…ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। আজ ছোট ছেলেটির মত তোতাপুরিজী সব শোনেন—গুরু শিষ্য সম্বন্ধ যেন কোন সোনার কাঠির ছোঁয়ায় হয়ে গেছে রূপান্তর…শেষে একান্ত আকুতিতে বলেন,—তোমার মাকে এবার বল আমায় ছেড়ে দিতে—এখন বুঝেছি,—তাঁর কৃপাতেই বুঝেছি তাঁর স্বরূপ।

তখন দখিনা বায়ুতে মায়াপুরীর প্রভাতী সুর আসছে ভেসে—অলকানন্দায় সে ধ্বনি হচ্ছে ছন্দিত—গগনে ভুবনে স্পন্দিত হচ্ছে,—'লীলা-লীলা—মঙ্গল লীলা।'

নবারুণের আলোছায়াতে পূর্বাশায় জেগেছে অপরূপ মায়া—মার মায়া …আর মার মন্দির মুখে চলেছেন লীলা গরগর তনু শ্রীঠাকুর; হাততালিতে ছন্দিত হচ্ছে—সাবাস মা দক্ষিণাকালী ভুবন ভেল্কী লাগিয়ে দিলি—আর পিছনে নতমস্তকে চলেছেন জটাজটিল ব্রহ্মসদৃশ তোতাপুরিজী, মুখে শ্রদ্ধার বেদহাসি…এ যেন ভক্তির দিশায় এগিয়ে চলেছে জ্ঞান—দৈবের ইঙ্গিতে চলেছে পুরুষকার…এই মহামিলনে মন্দির ওঠে ভরে—মা যে এই পরম-লগ্নের প্রতীক্ষায় ছিলেন অধীর। কৃপাধন্য পুরিজী মার চরণাম্বিকে জানান বিদায়ের পরম প্রণতি আর ঝরে পড়ে দুটি ফোঁটা আকুতি, সমাধি নিথর নয়ন পল্লবে—আর মার করুণাবিথার নয়ন ভঙ্গে জেগে ওঠে প্রসন্ন স্নিগ্ধ আশিস্…বিদায় লগ্নের পরম পাথেয়…

উনিশ

সচ্চিদানন্দ সাগরের বিরাটশিশু—খেলতে খেলতে খেলায় হয়ে পড়ে শ্রান্ত···নিজেই যেমন বলেছেন,—যারা ভাল মাছ ধরতে পারে, তারা যেমন মাছ তোলার আগে খেলিয়ে নেয়—তেমনি মা ভবতারিণী সাধনার সায় করতে গিয়েও মাঝে মাঝে দিচ্ছিলেন ছেড়ে—আদরে জড়ান তাঁর সন্তানকে।

এমনি একদিন, ক্ষণে ক্ষণে সমাধির অতলে হারিয়ে যাওয়া তনুমন নিয়ে বসে আছেন পঞ্চবটীর শান্তনীড়ে। সহসা স্নেহাস্পদ মথুর এসে একান্ত আকুতিতে লুটিয়ে পড়ে অভয় চরণতলে, সর্বহারা উন্মাদের মত—কেঁদে বলে,—বাবা আমার সর্বনাশ হতে বসেছে, তোমার মেয়ে জগদম্বার আজ শেষ অবস্থা, ডাক্তারেরা সব আশা ছেড়ে দিয়েছে—আজ ইষ্টের সেবাধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে চলেছি। ভক্তের আর্তিতে শ্রীঠাকুর আর পারেন না স্থির থাকতে, করুণার্দ্র কণ্ঠে অভয় দেন,—যাও সেরে যাবে। এরপর আর কোন রোগই ত থাকা সম্ভব নয়···পরে কিন্তু গোপন-লীলার ঠাকুর, অষ্ট সিদ্ধির ঐশ্বর্য যার কাছে খনি-ঢাকা মণি হয়েই রয়ে গেল—কথাটার মোড় ফিরিয়ে বলেন,—ঐ রোগটার ভোগ এই দেহটার ওপর দিয়ে হতে থাক্‌ল।—কয়েক মাস পেটের পীড়া আর সব অসুস্থতায় বরদেহ হয়ে পড়ে খিন্ন। কৃপাধন্য মথুরের কথা বলতে গিয়ে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন,—মথুর যে এতদিন সেবা করেছিল, সেকি অমনি করেছিল—মা এর ভিতর দিয়ে তাকে অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক সব দেখিয়েছিল।

অনাদি-সংস্কার প্রবাহে জীবের নির্বিকল্পে অবস্থা লাভ একান্ত দুরূহ। সাধারণ জীবকোটী এ অবস্থায় একুশদিন মাত্র দেহে থাকতে সক্ষম হয়। বেদান্ত শাস্ত্রে আছে,—ব্রহ্মের কামনালীলায় সৃজনের এই শতপর্ণি শতদল—আর জীবের জীবত্বও ঐ কামনারই বন্ধন লীলা, ঘটে ঘটে, ঘরে ঘরে এই লীলায় সৃষ্টি বিধৃত ও পুষ্পিত। এই বাসনার পঞ্চ স্কন্দকে বুদ্ধদেব বলেছেন,—হে গৃহ-নির্মাতা তোমায় আমি চিনেছি আর গৃহ নির্মাণে

সক্ষম হবে না। সেই জন্মমৃত্যুর বীজ বাসনার নিবৃত্তি হলে আর দেহ ধারণ সম্ভব হয় না; তবে যাঁরা শ্রীভগবানের বিশেষ অধিকার নিয়ে আসেন সেই আধিকারিক পুরুষদের আর অবতারদের কথা ভিন্ন। শ্রীযুক্ত মাষ্টারমশাই যেমন বলতেন,—অন্য সবাই যেন কলে ফেলে তৈরী আর অবতার যেন তাঁর নিজের হাতে তৈরী—এই আধিকারিক পুরুষ ও অবতার পুরুষেরা শ্রীভগবানের কৃপায় ও ইঙ্গিতে নির্বিকল্প ভূমি হতে নেমে আসেন—শ্রীভগবানের নির্দেশিত বিশেষ কর্মের অধিকার নিয়ে। এই সব লোকোত্তর পুরুষের উদয়েই ত উদয় অচলে জাগে স্বর্ণছড়া।

ফেলে আসা অশ্রুসরস সেই দিনগুলি—প্রথম আকুলতা—বুক ভাঙ্গা সেই আকুলতাকে সম্বল করে চলেছে অধরাকে ধরার সাধন—মাও আকুল, ছেলেও আকুল-- কখন মা চুম্বক, ছেলে লোহা—আবার কখন বা ছেলের আকর্ষণ আর মার অদর্শন—এই অশ্রুলীলার বিলাসে চলে যায় দিন···লীলা উচ্ছলা জননী একদিন দেখা দিলেন—নয়ন ঠিকরে জগৎ যেন নড়ছে—নয়ন জুড়ান সে রূপ—বিশ্ব নিঙড়ান সে বাণী···বলেন,—তুই অক্ষর হতে চাস? ···দিব্য শিশু ত জানেনা অক্ষর মানে কি? তাই উত্তরে থাকেন মৌনমুখে—ভাবেন একি লীলা লীলাময়ী। তবে উত্তর হয়ত পেয়েছিলেন মা জননী—আজ দীর্ঘদিন পরে এসেছে সেই অক্ষর হবার পরমলগ্ন—তোতাপুরিজীর শিক্ষায়···

দক্ষিণেশ্বরের রঙ্গমঞ্চে সে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা···অদ্ভুত এক পুরুষ, অচাওয়া অতিথির মত এসে পড়েছেন পুণ্য দেবারামে—এসেই দেখেন পুরুষোত্তম অক্ষর অবস্থা—অবস্থা ত নয়—ধরার ধূলায় দেব-শরীরকে লুটিয়ে দিয়ে ধূলাকে সোনা করে তোলার ছল। চুলগুলি ধূলায় গেছে জট পাকিয়ে—দিন কোন্ দিকে আসে, কোন্ দিকে যায় তার ঠিক ঠিকানা নাই —মুখে মাছি ঢুকছে—শরীরে নাই সান—জীবনের চিহ্নমাত্র হীন—সে সোনার তনু ধূলায় ধূসর···মনে পড়ে স্বর্ণপ্রতিমা উমা মহেশ্বরীর তপস্যা··· দেহ হয়ে গেছে দিনচন্দ্রের কত নিষ্প্রভ। কালিদাসের বর্ণনায়—

'শশাঙ্ক লেখামিব পশ্যতে দিবা সচেতসঃ কস্য মনো ন দূয়তে'

আর মনে পড়ে শ্রীমতীর শ্যামবিরহে জরজর দেহ—

— সোনার বরণ হইল শ্যাম সোঙরি সোঙরি তুহারি নাম।

…কে বুঝবে মহাভাবের এ বিলাস—কে দেখবে ভবোদ্ভব এ মহিমা… বুঝেছিলেন মার নির্দেশ এই বরেণ্য সাধু—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনি চিরদিন নাম, গোত্রহীন—সেই মহাপুরুষ এসেই পারেন বুঝতে ধূলায় ঢাকা এই মনের মণিকে,—কেন মা তাকে টেনে এনেছেন বাঙ্গলার এই গঙ্গাতীরে। এসেই একটি রুলের মত লাঠি নিয়ে ধীর আঘাতে বরাঙ্গে আনতে থাকেন চেতনা—আর সেই অবসরে শ্রীমুখে ধরে দেন মার কিছু প্রসাদ ··ধন্য সেই সন্তের চরণে সারাবিশ্বের প্রণাম হোক জড়ো। তবে জগতের মহান্‌রা অচেনা থাকাই ভালো—অমর্যাদাই যে জগতের নিয়ম।

মার বঙ্কিম-লীলাভঙ্গিম নয়নে জাগে ভ্রূকুটি···দেহ রাখতে হলে আর এ অবস্থায় সন্তানকে রাখা চলে না। তখন সেই অখণ্ডের ঘরে জাগে বাণী,—ওরে তুই ভাবমুখে থাক···ধীরে স্থূল চেতন রাজ্যে নেমে আসে মন—দীর্ঘ ছয়মাসের অবসানে···। নির্বিকল্পের অসম্ভবকে সম্ভব করে শ্রীঠাকুর হলেন বুত্থিত—তখন দেহে আর দেহ ছিল না···

উচ্চ-সাধনার ক্ষেত্র সব রকমে কুশল থাকে— দেহে মনে পারিপার্শ্বিকে একটা স্বচ্ছন্দের প্রয়োজন। শ্রীঠাকুরের মনের ত কথাই নাই—দেহও ছিল সুষমার সঙ্গে দৃঢ়তায় মণিমঞ্জুষা···পল্লীজননীর স্নেহপুষ্ট দুলালের অঙ্গে সর্বকুশলতাই যেন পূর্ণভাবে ছিল জড়ান; তাই দীর্ঘ বারো বছরের মরণপণ সাধনে শরীর ভেঙ্গেও চায়নি ভাঙতে—পড়েও যায়নি পড়ে—দেব বিগ্রহ চিরদিনই লীলা বিগ্রহ।

একে সর্বসমিধের নির্বিকল্প, তাতে আবার দীর্ঘ ছয়মাসের অবস্থিতি, দেবদেহ হল খিন্ন—না জগদম্বা দাসীর রোগ গ্রহণে এল কঠিন দেহের ভোগ, কে জানে···জগতের পাপ তাপ গ্রহণে ভগবান ঈশামসির ক্রুশবিদ্ধ হওয়ায়···দেবমানব বুদ্ধদেবের সারা-বিশ্বের দুঃখকষ্ট নিজ বরদেহে বরণ করে নেওয়ার প্রার্থনায় ধরণী একদিন ধন্য হয়েছে···মনে পড়ে গলরোগের জর্জর ব্যাধিতে শ্রীঠাকুর একান্ত ক্লিষ্ট—তবু ভাবের নাই বিরাম, মুহুর্মুহু সমাধিতে হয়ে যাচ্ছেন আপনহারা···এমনি একদিন দেখেন বিদেহ হয়ে পুরুষোত্তম এসেছেন বেরিয়ে আর তার পিঠময় ঘা—লীলাময় ভাবেন

কখনও ত অন্যায় করিনি তবে কেন এত জর্জরতা···মুহূর্তে মা দেন অভয় ··এসব যে তাঁর আদর করে তুলে নেওয়া ব্যথার মণিহার—জীবের দুঃখ কষ্টে মন হয় অবুঝ, তাই স্পর্শলীলায় আপন করে নেন তাদের জন্মজন্মান্তরীন শোক তাপ—আর তার ফলে দেবদেহের এই সন্তাপ···কর্মফল ত যাবার নয়—তাই সৃষ্টির মহামন্থনের বিষ নীলকণ্ঠেরই কণ্ঠশোভা···এ বিষ যে তাঁরই।

সাধন কুটীর

কুড়ি

শ্যামার দুলালের সাধ ছিল, সাধুর রাজা হব—ভক্তের রাজা হব। ভবভয়হারিণী ভবতারিণীর নয়নকোণা রহস্যে হয়ে ওঠে ঘন, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের মন্দিরে জেগে ওঠে সাধুর মেলা। পেটবৈরাগী সাধু নয়, বড় বড় সব তপস্বী সমর্থী সাধু—আর ধূম লেগে যায় তাদের বেদান্ত বিচারে—ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় যখন অমীমাংসার সমুদ্রে তাঁরা হয়ে পড়েন দিশাহারা, দিশারী দেন গতি-নির্দেশ—শুধু কি নির্দেশ? সাধনরহস্যপুরীর চাবিকাঠি যাঁর হাতে—সপ্তভূমির ভূমাদৃষ্টি নিয়ে তিনিই দেখিয়ে দিতেন সমাধির রহস্য গহন অবস্থা—কথা বলতে বলতে হয়ে যেতেন নিবাত নিথর—আর সাধুরা দিশা পেয়ে দিশাহারা চোখে থাকতেন চেয়ে ধ্যান নন্দিত শ্রীমুখের পানে—কে এই লোকোত্তর পুরুষ—অসীম-গগন-বিহারী, যুগে যুগেই বিরল যাঁর আসা—স্মৃতি-সুরভিত দিক-চক্রবালে জাগে ধ্যান-সুন্দরের সেই বেদ-হাসি—চারিদিকে সাধুসন্তদের দিব্য-মেলা—আর তার মাঝে আলো করে বসে আছেন সন্তদের রাজাধিরাজ·· মর্তে অমরার আমন্ত্রণ।

সেদিন হরি-চরণ-বিচ্যুত সুরধুনী হরিপাদ-স্পর্শে ফেনাস্যময়ী—আর দক্ষিণেশ্বরের চাঁদনীর ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের বাসুদেব—বিশ্বময়, অলকার আলো ছিটান চাঁদনী—সহসা ব্যথাহারী করে ওঠেন আর্তনাদ—ছুটে আসে অনুচর হৃদয় ছুটে আসে সমবেতরা দেখে ব্যথাতুর ভগবানের পিঠে পাঁচটি আঙ্গুল রক্তরাগে উঠেছে ফুটে—চীৎকার করে ওঠে ব্যথার ব্যথী হৃদয়রাম,—কে এ কাজ করলে মামা? রহস্যে দেখিয়ে দেন কলহরত মাঝিদের একি বৈদান্তিক বিশ্বানুভূতি না বিশ্বার্তিহারী নারায়ণের করুণার্দ্ররূপ······।

আর একদিন, ধরার অলকা দক্ষিণেশ্বর সেদিন শ্যাম-শোভায়, হরিতে হিরণে, দখিণার শিহরণে হয়ে উঠেছে স্বপ্নাতুর আর স্বপন সুরভিত, আপনহারা ভাব-বিলসিত তনুতে দাঁড়িয়েছেন বিশ্বময় করুণকান্ত গদাধর

সুন্দর—শ্যাম ধরণীর সঙ্গে এক হয়ে গেছে শোভন শ্যামতনু—সহসা জাগে এক আর্তি—অনুতে অনুতে যে সূক্ষ্ম তনুর বিথার—সেই তনুতে জাগে বিশ্বের ব্যথা···বাইরে দেখা যায় শ্যাম-তৃণদল দুপায়ে দলে কে যেন গেছে চলে— ।

দক্ষিণেশ্বরের দিব্য নটমঞ্চে সেদিন সুরু আর এক অভিনয়···রহস্যময়ী জননীর মত ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার—পঞ্চবটী ছায়াময়, ঠাকুরের শ্রীমন্দির তিমিরায়িত···বাসুদেবকুটীর এক অস্ফুট ধ্বনিতে, বিজাতীয় ধ্বনিতে, ছন্দিত হচ্ছে—আকুল আবেগোচ্ছল আল্লার নামে মর্ত্যগেহে নেমে এসেছে অমর্ত্যের মহিমা···সহসা কুটীর ঘর বিদ্যুৎ-বিলাসে হয়ে ওঠে বিহ্বল—দেখা যায় –দীর্ঘ-শ্মশ্রু বিশিষ্ট গম্ভীর এক পুরুষের দিব্য আবির্ভাব, আর তাঁর সম্মুখে নতজানুতে অবস্থিত শ্রীঠাকুর—দুই দেবমূর্তির অন্তরাল নিমেষে যায় মুছে—আর শ্রীঠাকুর হয়ে যান সমাধি উধাও ।

শ্রীঠাকুরের বেদান্ত সাধনেই ভারতীয় সাধনায় সুদীর্ঘ পরিক্রমার হয় অবসান । এই দেবমনের এমনই অদ্ভুত ছিল গঠন, সাধন সমুদ্রে নিরন্তর বিহার করাই যেন ছিল সেই চিরতৃষিত মনের কামনা···আনন্দনিকেতন দক্ষিণেশ্বর সর্বধর্মের সমন্বয় ভূমিতে পরিণত হয়েছিল সুরু থেকেই । সেদিন প্রেমপ্রচ্ছায় সুরধুনীর কূলে এসে পড়েছেন এক সুফী মহাপুরুষ—গোবিন্দ তাঁর নাম—ক্ষত্রিয় দেহ সেই সিদ্ধ সাধক মার অলখ ইঙ্গিতেই যেন এসে পড়েছেন এক দেবভূমিতে, আর শ্রীঠাকুরের সন্ধানী চোখে পড়তেও লাগে না বেশী সময়—সুরু হয়ে যায় ইস্‌লাম সাধন সুফী মতে—এ সাধন পরম প্রেমের সাধন— এমতে বিশ্বের সকলেই এক বন্ধনে বাঁধা—সবার বাঞ্ছিত ধন, সবার প্রেমাস্পদ সেই এক পরমপুরুষ—মহামহিম—বিভিন্ন ধর্মে তাঁর নামের ভিন্নতামাত্র—ভাগবৎ সত্তার একত্ব, প্রেমের মহত্ত্ব, গুরুর গুরুত্ব, সুফী ধর্মের এই তিনটি প্রধান বাণী—ভাগবৎ সত্তা যেন প্রেমের অগাধ জলধি, আর গুরু যেন মহতী স্রোতস্বতী—আর মানব সাধারণ যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধার—নদীর স্রোতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধার যায় ভরে, তাঁরা প্রেমেই ভরে দেন শিষ্যের ক্ষুদ্রতা···

দেহ মনের মিলিত ছন্দবিলাসে এমনি অভ্যস্ত ছিলেন এই দেব-মানব যে একান্ত অজানিতে দেহ হত মনের নর্মচারী—তাই দেখি ইস্‌লাম ধর্মসাধনে তিনবার নামাজ, আল্লার নাম জপ, ঐ ধর্মাবলম্বীদের আহার গ্রহণ—এমন কি শ্রীমন্দিরে প্রবেশের চেষ্টামাত্র গিয়েছিল হারিয়ে—আর মাত্র তিন দিনেই মহামহিম মহম্মদের দর্শনে হয়েছিলেন ধন্য···। কবে, আর কতদিনে সব মতের সব পথের পথিকরা পাবে এই মহাসমন্বয় সাগরের সন্ধান?

ঠাকুরের ঘরের খাট

একুশ
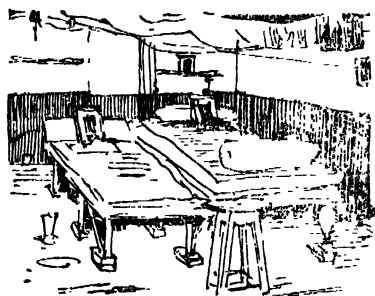
মহাকালের কাছে সময়ের গতি চির-নিস্পন্দিত, চির অচল তাই মহামানবের জীবনের ক্ষণগুলি চিরস্থির যেন রাত্রির অন্ধকারে সন্ধ্যার মাঙ্গলিক।

বৈদিক-ছন্দে সাবিত্রী গায়ত্রীর প্রথম রূপের বর্ণনা আছে রবিমণ্ডল-মধ্যস্থা ; অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধরা···মনে পড়ে শ্রীমাকে শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে ; প্রথম মিলন-লগ্নে জয়রামবাটীতে অনিন্দিতা শুচি শুভ্রা প্রথম উষসীর মত হৈমবতী আর নন্দীভৃঙ্গীর মত হৃদয়রাম রাশি রাশি পদ্মফুলের নিবেদনে চরণপ্রান্ত করে তুলেছে আকুল···পদ্মালয়ে পদ্মালয়া আছেন দাঁড়িয়ে, ব্রীড়ানত নয়ন নিথরে নেমেছে সারা বিশ্বের শান্তি-মৈত্রী-করুণা —যেন রূপ অরুণা···

নির্বিকল্পের পর শ্রীঠাকুরের দেব-শরীর প্রায় ছয়মাস অতিসারাদিতে হয়ে পড়ে খিন্ন। ভক্ত মথুরাদি তখন জননী-জন্মভূমির শ্যাম স্নেহনীড়ে ফিরে পাঠালেন শ্যামা মেয়ের অঞ্চলের ধনকে। শ্যাম-মেখলা জননীর কোলে পল্লীদুলালের যদি বা ফিরে আসে হৃতস্বাস্থ্য। বাংলার এই সব অঞ্চল তখন কল্যাণময়ী জননীর মত সর্ববিষয়ে ছিল শুভদা সুখদা স্বাস্থ্যে-সম্পদে, ধ্যানে-ধর্মে। তখন বাংলার শাল-তমাল-তালবন-নীলার মাঝে ছিল স্বাস্থ্য, ছিল শান্তি—

শ্রীঠাকুর দীর্ঘায়ত তপ-সন্তপ্ত দেহে ফিরে এলেন মার বুকে। পল্লীজননীর শ্যাম অপাঙ্গে যেন ফিরে এল পুরানো দিনের হারানো আনন্দ··· সেই বৃন্দাবন বিলাস—সেই সখা-সখী সঙ্গে লীলালাস্যের অফুরান আনন্দ ···বেদন নিঙড়ান নয়নে যেন আবার জেগে ওঠে স্মৃতি-শিহরিত বাল্য-লীলা সেটি বারশত চুয়াত্তর সালের জৈষ্ঠের এক সোনার দিন।

পল্লীর পটভূমিতে কালচক্রে এসে গেছে পরিবর্ত্তন—জীবন-ছন্দের সে আলো হাসিতে সুরু হয়েছে ইমনের বীণ—সখাসখীদের সে সব দিন হয়ত চিরদিনই গেছে ফুরিয়ে—তাদের জীবন জাহ্নবীতে আজ থমক জাগান

কৈশোরের স্বপ্ন—স্বপ্নের মতই গেছে ঝরে—তবে দিব্য লীলা ত ফুরাবার নয় —সেই লীলা-লাস্যেরও দিন এল ফিরে···তবু—তবু মনে হয় সেদিন যেন আর আসে না বসন্ত ফিরে আসে তবু সে দখিণা—সে মধুকর—যেন আর আসে না···মহাকালের নীল অনন্তে, রামধনুর দিনগুলি চিরদিনের মত যায় হারিয়ে।

সখাসখীরা তেমনি এসে দাঁড়ায় দিনান্তের ছায়ে। আনন্দের হাটবাজার আবার স্থরু হয় পল্লীবিতানে—কত সরস পুণ্য কথার স্বপ্ন আল্পনায় প্রহরগুলি হয়ে ওঠে রঙ্গীন—কল্পলোকের ক্ষণগুলি ভেসে যায় যেন ছড়ান পদ্মকর্ণী, মিশে যায় মৌন মহাকালের অনন্ত নিঃশেষে···

ঝিল্লী জোনাক-জাগা দ্বিযামারজনী। গৃহ কল্যাণীরা সুষুপ্তির শান্তিতে নিষণ্ণ। সহসা ভাববেপথু চরণে এসে দাঁড়ান ঠাকুর—না—ভবতারিণী! ভাবগম্ভীর নয়নে সমাধির সপ্ত-সমুদ্রের বিথার—করুণাম্ভে উচ্ছলিত তনু, বিশ্বের আর্ত্তিহারী আর্ত্ত কণ্ঠে বলেন,—ওগো সব শুলে, আমায় খেতে দিলে না, এই ত আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি···খুঁজে পেতে পাওয়া অতি সামান্য একটু মাছচাটুই আর তাই দিয়ে খেয়ে ফেলেন এক রেক চালের অন্ন। মনে পড়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভাবের ভোজনলীলা শ্রীবাস অঙ্গনে ঃ—

ব্যবহারে জন শত দুইএর আহার।
নিমেষে খাইয়া বোলে কি আছয়ে আর॥

গৃহকর্ম হয়ে গেছে সারা। রঘুবীরের প্রসাদের কণিকাও সেদিন আর নাই। কল্যাণী জননীদের বুকে ঘনায় মেঘ সঞ্চলতা···দেবতা ভিখারী—দেবতা আকুল—ভিখারীর চির অতৃপ্তি নিয়েই ত তোমার আসা। যুগে যুগে এইত তোমার বেদনবঞ্চিত বাসনা! দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্যে জাগেনা চরণের কমলবিন্যাস—যেখানে দীনের আর্ত্তিই সম্বল, সেখানে বিদুরের লুকানো ব্যথাতেই পড়ে দৃষ্টি-প্রসাদ···। যুগে যুগে তাই দীন হীন দেবকী-শচী-মেরীর কোলই করেছ স্পর্শলোল!

বাইশ

দেবভূমি কামারপুকুর—দেবমানবের দিব্য লীলাঙ্কিত এ ভূমি দীনের নাম নিয়েও আজ সে প্রাণধর্মে নয় দীন—বিশ্বের দেউলে এ দেবভূমির আরতি হয়ে গেছে সুরু—দূর সুদূর পাশ্চাত্যের বিনম্র প্রণতিতে আজ এর ধূলিকণা আকুল…কল্পলোকে ভেসে আসে সপ্তসাগরমন্থনধন প্রেমমন্দিরপদে চলেছেন পল্লীর পথে পথে আগে পিছে তৃষিত নয়নের প্রহরা, আর দুই চরণে জেগে আছে ক্ষণ-সমাধি…চলার ছন্দে সেদিন ছড়িয়ে গেছেন অশ্রু-সরস হরি নামামৃত—ফুলিয়া-নদীয়া-শান্তিপুরের প্রেমঅঙ্গনে—আজ ছড়িয়ে যাচ্ছেন, সমাধির অকৈতব মণি—কাল ভুলানো কালো মেয়ের থমক জাগা চরণের ঝলক…তাই কামারপুকুরের ধন্য নরনারীর ভিড়ে পাই ভক্ত চিনু, সে ত ঠাকুরকে বাল্যেই চিনেছিল—প্রসন্নজননী, দীনমেয়ে ধনী, পাইন কন্যা মরমী রুক্মিণী—এমনি নাম না জানা আরো কত…একদিন সমাধি সায়রে আপনহারা শ্রীঠাকুর আছেন বসে, চারিদিকে ঝলমল করছে ভক্ত গ্রহদল—এমন সময় জনৈকা সবাইকে অবহিত করে বলেন,—উনি এখন সচ্চিদানন্দ সায়রে মীন হয়ে খেলা করছেন—গোল করো না সব। অতি সাধারণ পুরচারিণী এই জননীর এমন সহজ যোগজ দৃষ্টি কার দান—মহাভারতের কাহিনীতেই শুধু এর পরিচয় পাওয়া যায়…মনে পড়ে ধর্মব্যাধের কাহিনীতে পতিব্রতা নারীর কথা।

অন্নপূর্ণার দুয়ারে শিব চিরদিনই ভিক্ষুক চিরদিনই প্রার্থী… জয়রামবাটীর সে এক রহস্যরঙীন রাত্রি—স্তিমিত ক্লান্তদীপের শিখা নির্বাণমুখে…পুরজননীদের অবসন্ন দেহে নেমে এসেছে স্বপ্নজড়িমা। সহসা শিশু ভোলানাথ শিথিল পায়ে এসে দাঁড়ায় বিশ্বশোষী তৃষ্ণা নিয়ে, আকুলতা নিয়ে…ভক্তের দুয়ারে ভগবানের এ আকুতি নিত্যকার। বিশ্বের দেউলে বিশ্বদেবতার নিত্য আকিঞ্চন—এ মহাভিক্ষুকের আশা পূর্ণ করবে কে?…তবু এ ছলনা, এ লীলার বিলাসে রচনা করেন নবনব কল্পলোক…গৃহ সেদিন অতিথি অভ্যাগতের আগমনে রিক্তভাণ্ড—

পুরজননীরা হয়ে উঠেন আকুল···এই অসময়ের চিরবাঞ্ছিত, চির বঞ্চিত অতিথিকে কি দিবে তার যোগ্য উপায়ন—জননী সারদেশ্বরী তখন ছিলেন উপস্থিত—তাঁর শ্রীহস্তের পরিবেশনে সেদিন নারায়ণ হন পরিতুষ্ট। দ্রৌপদীর সামান্য শাকান্নের মত এই অন্নাবশেষই কি আজ দেশে দেশে নিয়ে আসছে পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা···এমনি কত কতদিন—সুরধুনীর দুই কূলে সেদিন বুক জুড়ানো আঁধারঘন এসেছে নেমে—এমনি আকুল করা কালোরূপে মা জাগেন শিয়রে—যাদের নয়নে নাই ঘুম, যারা অথির নয়নে জাগে পথ প্রহরায় তাদেরি দুচোখ ভরে লুকোচুরির রঙ্গিণী দেয় ধরা। ক্ষীণ দীপালোক ক্ষীণতর হয়ে এসেছে দ্বিযামা রজনীর মোহে। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে জাগেন নারায়ণ··· কল্যাণী সারদেশ্বরী তখন নবহতে—তাঁর শ্রীহস্তের নিবেদন—সুজির পরমান্ন জনৈকা ভক্ত মেয়ে যান নিয়ে প্রভুর মন্দিরে···দেখেন এক বিরাট আবির্ভাবে দেউল করছে থমথম—আলোছায়ায় কাঁপন ধরা সে ভূমিতে প্রবেশে জাগে শঙ্কা—ভোজনলীলায় ভক্ত ভীতি বিস্ময়ে দেখেন শ্রীঠাকুর নয় মা-ই ভিতরে জ্বলজ্বল করছেন—সব নিবেদনের ধন যে তিনিই···আমাদের হৃদয় দেবতার, আমাদের আরাধ্য দেবতার কাছে, পৌঁছায় না আমাদের নিবেদনের দৈন্য তাই দেবতা থাকেন নিত্য অতৃপ্ত, নিত্য উপবাসী—আর তারই ক্ষণ প্রকাশ-- মানবের বহু সৌভাগ্যে অবতার পুরুষের জীবনে। শ্রীঠাকুরের কথা, ভক্তের জন্যেই অবতার।

এই যাত্রালগ্নে যোগেশ্বরী ভৈরবী শ্রীঠাকুরের সঙ্গেই ছিলেন। নানা কারণে এই যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা। হয়ত গুরুপদবী যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা সঙ্গে থাকলে মর্যাদা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা থাকে। যোগেশ্বরী এই লগ্নেই শ্রীঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে বারাণসীর বানপ্রস্থে করেন যাত্রা, আর যাত্রার আগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীঠাকুরের চরণে ফুলগন্ধ নিবেদনে নিজেকে করেন নিবেদিত···তাঁর যোগৈশ্বর্যময় দিব্যলীলার এই খানেই হয় নিরাবৃত্তি।

সাতটি দিব্যমাস এমনি করে আলো হাসি আর আনন্দে হয়ে আসে শেষ। বারশো চুয়ান্ন সালের মার্গশীর্ষে শ্রীঠাকুর ফিরে আসেন দখিণাপুরের দেবারামে···কামারপুকুরের ক্ষণ-বসন্তের হয় অবসান—দিব্যধামে আবার নেমে আসে বিষাদের নিথরতা···

তেইশ

গীতামুখে শ্রীভগবান বলেছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

অবতার বরিষ্ঠের ত' কথা নাই—অবতারদেরও প্রতি পদক্ষেপে ফুটে ওঠে পথের দিশা, সন্ধানী আলো—তমসা ছাওয়া যুগচক্রবালের দিশারী যে তাঁরাই···সর্বকল্যাণ গুণের আকর এইসব লোকোত্তর পুরুষদের জীবনালোকে পাই প্রকৃত পথের নিশানা, কল্যাণ মার্গের নিরিখ··· তাই দেখি শ্রীঠাকুরকে তীর্থঙ্করের দিব্যরূপে—নিত্য ছুটে গেছেন সাধুদের মেলায় লীলায়িত কৈশোরে—সাধনার মন্থন পাত্র হাতে ছুটে গেছেন তীর্থ হতে তীর্থান্তরে—কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা এইসব তীর্থ চরণায়িত হয়েছে, অমৃতায়িত হয়েছে—বুক পেতে হয়ে উঠেছে মহীয়ান···বেদোদধির মন্থন শেষে অমৃতের পাত্র যখন কানায় কানায় হয়ে উঠেছে ফেনিল তখন দেখি ছুটছেন হরিরস মদিরোন্মত্ত—কোথায় ব্রহ্মানন্দ কেশব, কোথায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পরমহংস দয়ানন্দ—ছুটে গেছেন পেনিটির মহোৎসবে, কলুটোলার হরিসভায় লীলারসে গরগর···শুধুই কি লীলা—লীলার পিছনে আছে এক বিরাট প্রয়োজন—জগদ্ধিতের অসীম ইচ্ছা··· ফিরে চাওয়া চোখে পাই প্রেমঘনতনু—করুণ কান্ত—গৌর কিশোরের প্রেমাবেশে তীর্থ হতে তীর্থান্তরে ছুটে চলা—ধূলার নূপুর পায়ে—নয়নামৃতে ঝরে পড়া অকৈতব হরিপ্রেম—রূপে সুরধুনীর দুইকূল আকুল··· আর চোখে পড়ে, ধীর গম্ভীরে চলেছেন ঈশামসি—দীন দ্বাদশ দিশারীদের সঙ্গে নিয়ে অমরার বার্ত্তা বহন করে চলেছেন জুডীয়াতে—চলেছেন জেরিকোতে—দুহাতে শুধু কুড়িয়ে নিচ্ছেন অপমান, অপবাদ—কণ্টকের মুকুট···

সন বারশো চুয়াত্তর সালের মাঘ মাসের মাঝামাঝি, শ্রীঠাকুরকে মধ্যমণি করে রাজ আড়ম্বরে মথুরামোহন করেন তীর্থযাত্রা দেওঘর তীর্থে

করুণাবতার শ্রীঠাকুর ঘটালেন এক বিশেষ বিপত্তি--দেবস্থানের পথরেখায় পড়ে পল্লীজননীর কয়েকটি রিক্তনীড়—নিরাভরণ দীন-সন্তানের বসতি—দীনের নারায়ণ, বিশ্বের ব্যথাহারী ব্যথায় হলেন অধীর,—এদের একদিন খাওয়াতে হবে আর একখানা করে কাপড় দিতে হবে,—মার দেওয়ানকে।

মথুর রাজসিক ভক্ত—দীন নারায়ণের সেবায় তার মন ওঠেনা—প্রকাশ্যে জানান অসম্মতি···আর্ত্তিহারী নারায়ণের নয়নপল্লবে তখন শরতের শিশির—যে ব্যথার অমৃতে আজ জগৎ অমৃতায়িত—সেই ব্যথার ঢলে মথুরও যান গলে—বিশেষ যখন শ্রীঠাকুর তাদের মাঝে গিয়ে বসে পড়েন আর বলেন,—এদের যে কেউ নেই আমি ছাড়া—আমি এদের কাছেই থাকব। মথুর কলকাতায় লোক পাঠিয়ে সে যাত্রা এই অঘটনকারী কল্যাণময়ের হাতে পান নিষ্কৃতি। রাণাঘাটেও কৃপাধন্য মথুরের ভাগ্যে আর একবার ভগবানের এ করুণার্দ্র-রূপ দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল।

মর্ত্তের মানুষের অমর্ত্তের দেবতাকে মর্য্যাদা দেওয়া ত সহজ নয়—সম্ভবও নয়—তাই বোধ হয় ভক্ত ভগবানের বিলাস-গুলিও ক্ষণ বিধ্বংসী·· ভক্ত মথুরের মন তীর্থপথের চঞ্চল পথিক, ক্ষণিক বিস্মৃতিতে ভুলে যায় আপনার ইষ্টকে। শ্রীঠাকুর মধ্যপথে একবার কার্য্যান্তরে পড়েন নেমে—লৌহশকট যাত্রাপথে দেয় পাড়ি; যন্ত্রের ঔদ্ধত্যে·· সাগর সৈকতে ফেলে আসা, পথ চাওয়া নবকুমারকে আমরা কতক অনুমানে আনতে পারি, কিন্তু শ্রীভগবানকে ফেলে যাওয়ার পথকে আমরা নিরুদ্ধ নিস্পন্দে শুধু প্রণাম জানিয়ে হই ক্ষান্ত—তবে সে পথ আমাদের দুর্ভাগ্যেরই পথ ··শ্রীঠাকুরের অদৃশ্য ইঙ্গিতে জনৈক বিশিষ্ট রেলকর্মচারী, রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি নিজস্ব স্বতন্ত্র গাড়ীতে শ্রীঠাকুরকে তুলে নিয়ে শ্রীভগবানের কাণ্ডারী হবার সার্থকতা করেন অর্জন। ···জগন্নাথের রথচক্র চির গতিশীল—আমাদের অহং সে চক্রে চির নিষ্পেষিত হয়···এই আমাদের ভাগ্যলিপি।

মণিকর্ণিকা—স্বর্ণময়ী কাশীর মণিপ্রদীপ এই মনিকর্ণিকা চিরমুক্তির তীর্থ—অমর্ত্ত্য আর মর্ত্ত্যের অমৃত সেতু। সেদিন সূর্য্য-করোজ্জ্বল পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কূলে শিখাময়ী এই শ্মশানক্ষেত্রের এক রম্য প্রভাত—শুচিশুভ্র শান্ত নিথর, জীবনের এই শেষ পৈঠা সেদিন এক নব অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় ছিল

দীপ্ত, গঙ্গাতরঙ্গ যেন কার আবাহনীতে রচনা করছিল জলের আলপনা—সহসা গগন, গঙ্গা সব যেন আলোকে পুলকে হয়ে ওঠে আকুল—হয়ে ওঠে ধ্যানসুন্দর··· ··· ···

দেখা যায় ভাগীরথীর দুইকূল উজ্জ্বল করে নৌকার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন ভাব-নিথর শ্রীঠাকুর, চোখে মুখে প্রভাতী তারার নিথর—সঙ্গের অনুচরদের মাঝেও জাগে কোলাহল···হয়ত একটা অঘটন যাবে ঘটে—মথুর, হৃদয়ের কাছে এ দৃশ্য নূতন নয়, তাঁরাও অবহিত হন, তাঁরাও এসে দাঁড়ান···ক্রমে সমাধি-মন্থন মনে জাগে চেতনা—বলেন সব কথা···সে এক রহস্য লোকের কাহিনী।

কাশীর পঞ্চতীর্থ দর্শনের চিরাচরিত প্রথায় শ্রীমান মথুর ঠাকুরকে একটী নৌকা করে নিয়ে বেরিয়েছিল সেদিন প্রভাতে। ভাব বিলসিত ঠাকুরও শিশুর সরলতায় আয়ত দুইচোখ মেলে দেখছেন কাশীর রম্যশ্রী···সহসা চোখে পড়ে মণিকর্ণিকা—দেখেন চিতাধূম ধূসরিত মণিকর্ণিকা আলো করে দাঁড়িয়েছেন কাশীর বিশ্বনাথ নিজে—মুক্তি যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর—পিঙ্গল জটাপীড় বিশাল সেই মহান্ পুরুষ, শবদেহের কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্রে করছেন তাদের কপালমোচনের ব্যবস্থা—আর শিবের পাশে আছেন শিবগেহিনী ভবানী স্বয়ং···আর কিছু কি দর্শন হয় নি? গোপন-লীলার নব-বিশ্বনাথের সঙ্গে কাশীর বিশ্বনাথের মিলন—দুই ভাবদেহের এক হয়ে যাওয়াই মনে হয় এই সমাধির রহস্য। কাশীর কৃপাতীর্থে সব সাধনার শেষ কথা নির্ব্বাণ-মুক্তি জীবের অনায়াসে লাভ হওয়ার এই ত কারণ—অকারণ কৃপার এক কণায় সমস্ত বিশ্বের মুক্তিও ত তুচ্ছ কথা—

কাশীর সচল-বিগ্রহ ত্রৈলঙ্গ-স্বামীপাদকেও শ্রীঠাকুর এই যাত্রায় দর্শন করেন, স্বহস্তে পরমান্ন দেন মুখে তুলে আর সাধনের একটী প্রশ্নে তীর্থ-মাহাত্ম্য করে তোলেন পূর্ণতর। ত্রৈলঙ্গ-স্বামিজীও নিজের নস্যকৌটা তাঁর কাছে ধরে দেন শ্রদ্ধা নিবেদনে···তীর্থঙ্কর মহাপুরুষের অবস্থিতিতে তাঁদের আগমনে—তাঁদের সেবা পরিচর্যায় তীর্থ হয়ে উঠে উজ্জ্বল, তাই তীর্থে তীর্থকৃত্যগুলির এত শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি।

কাশীতে শ্রীঠাকুরের, হরশির-বিলসনা, চন্দ্ররেখায়িত গঙ্গার বুকে এক বিশেষ বিলাস ছিল—নৌকাবিহার—কেদারনাথের মন্দির এই দর্শন পর্যায়ে পড়ে। কেদারের মন্দিরে তাঁর ভাবোচ্ছল অবস্থায়, ঐস্থানের মাহাত্ম্য সহজেই মনে আনে। ভক্তজননী শ্রীমাও এখানে এসে এর বিশেষত্ব উপলব্ধি কোরেছেন, বলেছেন,—এই কেদার—সেই কেদার··· ··· ···

মণিকর্ণিকার ঘাট

চব্বিশ

কাশীধামে এসেও রাজসিক মথুরের রাজ-ঐশ্বর্যে চলাফেরা যায়নি বাদ। এখান থেকে মথুর তীর্থকৃত্যে কয়েকদিনের জন্য যান প্রয়াগে—কিন্তু সন্ন্যাসীর রাজা, সাধুর রাজা শ্রীঠাকুর যে চির-গলিত হস্ত—তিনি শুধু তীর্থ দর্শন করেই আবার শিবপুরীতে আসেন ফিরে। পক্ষাধিককাল কাশীবাসের পর বৃন্দাবনকে করলেন ধন্য। সেই বহু-বিস্মৃত কথা…যেদিন গৌর-কিশোরের প্রেমাশ্রু-সিঞ্চনে জেগেছিল নব মুকুলিত ভাব-কদম্ব, আর আজ—গোপন গৌরচন্দ্রের মধুর ভাব-বেপথু চারণে ব্রজের সিদ্ধসাধকদের নয়নে ফিরে এসেছিল চিরপুরাতনের সেই প্রেমবিলাস।

গঙ্গামাঈ ছিলেন এমনই এক সিদ্ধ-সাধিকা। শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন যুগের প্রয়োজনে, আর কলমীলতার দল, পার্ষদেরদল সঙ্গেই আসেন—এঁরা না এলে লীলা হয় না পুষ্ট—পরিবেশের হয়না পূর্ণতা। জ্যোৎস্নামত্ত যামিনীতে তারার কুচির প্রয়োজন চন্দ্রের শোভায়, আবার তারকিত রাত্রিরও চাই চন্দ্রিম বিলাস। শ্রীঠাকুর তাঁর এ যুগের পার্ষদদের নির্দেশ করতেন পূর্বযুগের নাম ক্রমে—কেউবা ঋষি-কৃষ্ণের দলের, কাকেও বা বলতেন মহাপ্রভুর গণ।

গঙ্গামাঈ ছিলেন সেই হারানো ব্রজ-বিপিনের শ্রীমতীর প্রধানা সঙ্গী, ললিতা সখী—এ যুগেও ছুটে এসেছেন এ যুগের কৃষ্ণচন্দ্রের ক্ষণদর্শনে নিজেকে করতে ধন্য…দূর থেকে রসাস্বাদনের এক নিবিড়তা আছে—ভীড়ের মধ্যে মনকে হারিয়ে হয় না রসাভাস—এঁরা চান এমন একটি পরিবেশ যেখানে ভগবানের প্রেম-মাধুর্য্য থাকে নিত্য অবগুণ্ঠিত…চন্দ্রালোকের মুক্তাধারায় এঁরা যান হারিয়ে কিন্তু গহন কুঞ্জের রহস্য বিলাসে এঁদের প্রেম হয় রসনিবিড়। গঙ্গামাঈ তাই বেছে নিয়েছিলেন দূর বৃন্দাবনের কুঞ্জ পরিবেশ…বৃন্দাবনে নিত্য-বিরহ-লীলায় চিরদয়িতের জন্য বেদন আনন্দে দিন যেত কেটে—সন্ধানীর চোখকে যায় না ঠেকান—ভীড় জমে ওঠে সাধুসন্তদের—ভীড় জমে ওঠে মধু-পিয়াসী ভক্তভ্রমরের।

প্রেমবিহ্বলতায় আর ভাব-বিলাসে তাঁর কুঞ্জ হয়ে উঠত বেণু নিঙড়ানো যমুনার মত আবেগোচ্ছল—দেহের দুকূলে জাগত মগ্নপুলকের স্বপ্ন-শিহর—নয়নে জাগত অশ্রুর নির্ঝর তখন প্রেম-বৃন্দাবনে বুঝিবা ফিরে আসত সেই পুরানো দিনের হারানো কথা·· ব্যথাহত হলেও স্মৃতির সুরভিতে নিত্য জাগে পিপাসিত হৃদয়ের এক পরমতৃপ্তি···অসীম বিরহের এইত সীমার পৈঠা···

জীবনের এক একটি পরমক্ষণ আসে—আসে এক একটি মাহেন্দ্রলগ্ন যাকে ভুলতে গিয়ে যায় না ভোলা—মনের মণিকোঠায় হয়ে যায় চিরন্তনী···সাধকের চোখে এইগুলি হয় দিশারী আলো—কবির গাথায় এইগুলি হয়ে উঠে ছন্দের মণিমঞ্জুষা—দার্শনিকের প্রাণে তত্ত্বপ্রকাশ আর সাধারণের কাছে চির রহস্যময়ের, চির অধরার ধরা দেওয়ার ছল··· ।

সেদিন গঙ্গামা'র কুঞ্জে এল এমনি এক পুষ্পলগ্ন—ভাবতন্ময় চোখ মেলে বসে আছেন জীবনের শেষ পৈঠায়—কত বিনিদ্র পথ চাওয়া রাত্রি হয়েছে গহিন—কত অশ্রুর অভিষেকে পাষাণ দেবতার মেলেনি সাড়া···সহসা জীবনের জীর্ণদুয়ারে ওঠে কার আকুলকরা ডাক·· জীবন দেবতাই ত এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ব্যর্থ বসন্তের কুঞ্জে চেনাজনকে চিনতে হয় না দেরী—শত যুগের আর্ত্ত পিপাসিত প্রাণকে চেনাতে হয় না চিরদয়িতের থমকিত চরণ···তাই প্রথম দর্শনেই গঙ্গামাঈ তাঁর ইষ্টকে পারেন ধরতে—এ যে মূর্ত্ত কৃষ্ণপ্রেম, শ্রীমতি স্বয়ং···

আপন ইষ্টকে ইনি সুমিষ্ট দুলারী শব্দে অভিহিত করতেন। প্রথম দর্শনেই দুলারী ব'লে শ্রীঠাকুরকে টেনে নিতে সিদ্ধ সাধিকার হয় না ভুল—এর পর সুরু হয় বৃন্দাবনের নিত্যলীলা—সুরু হল প্রেম বিবর্ত্ত—সেই ফেনিয়ে ওঠা অশ্রুহাসির মান, মাথুর—এরপর দুলারীকে ঘিরে দিনের পর দিন চলে গঙ্গামায়ের আনন্দবিলাস—কখন নিজের হাতে খাইয়ে দেওয়া, নয়নাসারে সম্বিতহারা হয়ে, কখন বা পুলক কদম্বিত তনুতে পড়েন এলিয়ে দুলারীর বরদেহে··· ।

নিজে মহৎ না হলে মহৎকে যায় না চেনা—যুগে যুগে যারা কল্যাণদীপ দিয়েছে জ্বেলে আঁধারের বুকে—তাদের চেনার চোখ যুগে যুগেই বিরল।

দুলারী আর ললিতাসখীর মিলনের ক্ষণ, অবসান জানেনা—জানেনা বিরাম, বিশ্রাম—নদী যেন পেয়েছে মহাসাগরের কোল, অচাওয়া অভিসারে বিরহ বিচ্ছেদের লগ্ন হয়ে যায় ভুল···

এদিকে দক্ষিণেশ্বরীর লীলায় পড়ে গেছে ছেদ—ভুবনভুলানো লীলার বোধনেই যেন নীরাজনার আয়োজন...

সহসা শ্রীঠাকুরের চিত্তের নিভৃতে জাগে মার করুণ দুটি আঁখি, নহবতের নিঃসঙ্গে আছেন বসে তাঁরি পথে দুই চোখ মেলে,—কে তাঁকে বুড়ো বয়সে দেখবে, সেবা করবে···আর ত থাকা হয় না।

যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরকে জন্ম দিয়েছেন আর সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন···

গঙ্গামার জীবনে অকালের দখিণা যেন কার অভিশাপে হয়ে গেল ঝরা পাতার হিমেলা—

নয়নক নিদ গেও বয়ানক হাস
সুখ গেল পিয় সাথ দুখ মঝু পাশ।

সব ঠিক হয়েছিল—গঙ্গামা তার পরম পাওয়া দুলারীকে রাখবে কাছে —করবে প্রাণান্ত সেবায় আকুল···সহসা শ্রীঠাকুর বলেন,—না আমায় যেতে হবে...বজ্রাহতের মত গঙ্গামার জীবনে নেমে আসে অসীম বিরহের রাত্রি··· মৃত্যুর মত অসহ।

লীলা নিত্য—তাই নিত্য-ব্রজে ব্রজেশ্বরের বাঁশরী কোনদিনই হয় না নীরব। তবু শ্রীঠাকুরকে চলে আসতে হয় পক্ষাধিক পরে। প্রকাশ-লীলায় ছেদ আছে—বিরহ-মিলন আছে— তাই প্রকাশ-লীলা এত মধুর!

শিবপুরীতে তন্ত্রগুরু ভৈরবী যোগেশ্বরীর সঙ্গে ঠাকুরের হয়েছিল পুনর্মিলন। শ্রীঠাকুর তাঁকে নিয়ে আসেন বৃন্দাবনে। আর এই বৃন্দাবনেই ঘটে তাঁর লীলাবসান—ভৈরবী জননীর বহুদিন যশোদা ভাবে অবস্থানের চরম পরিণতি এই ব্রজের ধূলে মিশে যাওয়া—তাই ত শ্রীঠাকুর তাঁকে এনেছিলেন এই লীলাতীর্থে—এটি ঘটে বারশো পঁচাত্তর সালে।

সত্য-শিব-সুন্দরের যাঁরা পূজারী—সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ যাঁদের জীবনবেদ—তাঁদের চলার পথে তাই শ্রীভগবানের বিভূতির হয় সহজ

প্রকাশ। গীতা মুখে ভগবান তাই বলেছেন—যা কিছু বিভূতিযুক্ত হয়, সত্ত্ব, শ্রী-যুক্ত আর উর্জ্জিত সবই তাঁর তেজ-অংশ সম্ভূত। তাই কবি, শিল্পী এদের স্থান শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকেই। আর সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ অবতার পুরুষদের ত কথাই নাই—তাঁদের স্পর্শেই সত্য-শিব-সুন্দরের জাগরণ …অরুণায়িত পূর্বাশায় কমলদলের হাসি যে আপনি ফোটে। সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপ যাঁরা তাঁদের আবির্ভাবেই ধূলায় জাগে সত্য, জাগে শিব, জাগে সুন্দর—তাইত কৃষ্ণ-অবতারের পর ভারতে যে গীতার সুরলহরী বয়ে গিয়েছিল, তারি প্রকাশ আজো নানা কাব্যে, নানা গীতে পাই… গৌরকিশোরের সংকীর্ত্তন আজো মহাজন পদাবলীতে সারা ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে সুর-তরঙ্গিণীর অমৃতধারার মত! বুদ্ধদেবের করুণা-মৈত্রীর বাণীও নানা সংঘারামের ভাস্কর্য্যে অপরূপ শ্রীনন্দিত হয়ে রয়েছে আজো। রাসেল প্রমুখ দার্শনিকেরা ভগবান ঈশামশিকে রোমান শিল্পকলার ধ্বংসের কারণ বলে নির্ণয় করেন। কিন্তু আমরা দেখি যে অপরূপ শিল্পের নিদর্শনে 'নোত্তরদেম' প্রভৃতি ভজনালয়গুলি গড়ে উঠেছে ও বর্ত্তমান সভ্যতার শিল্পপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠেছে, সে সব যে খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের ফল নয় একথা বলা চলেনা।

তখন কাশীতে বীণ্‌কার মহেশ সরকারের প্রসিদ্ধি ছিল—শ্রীর প্রতিষ্ঠা, —সুন্দরের প্রতিষ্ঠা—শ্রীঠাকুর না হলে আর কে করে? তাই ছুটে যান বীণ্ শুনতে; আর শুনতে শুনতে অসীমের ছন্দে সুরসুন্দর হয়ে যান আপনহারা।

গয়াতীর্থ শ্রীঠাকুরের আবির্ভাবভূমি—তাইত হয়না যাওয়া সেই পরমধামে, মথুরের একান্ত বাসনা সত্বেও। অবতার আর অবতার-প্রতিম পুরুষদের মনের একটি সহজ গতি ভূমার দিকে—লয়ের দিকে। তাই কোন স্থানে, কালে বা পাত্রে যদি সেই লয়মুখী মনের উদ্বোধন হয় তবে দেহে আর দেহ থাকা হয়ে পড়ে দুরূহ। শ্রীঠাকুর ঐ দেবস্থান দর্শনের ইচ্ছা করেন সংবরণ।

দীর্ঘ চারিমাস অন্তে তীর্থদেবতা ফিরলেন তীর্থরাজ দক্ষিণেশ্বরে—ভবতারিণীর নয়নতীরে হাসি এল ফিরে…বারশো পঁচাত্তর সালের জ্যৈষ্ঠের

এই ঘটনা। মার চরণছন্দে অশ্রুসরস নতিতে ফিরে আসার সংবাদ দিয়ে নবহতে চন্দ্রা মার চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন, আর মার আশীষ মাথায় ধরে শ্রীঠাকুর পরমানন্দে আবার দক্ষিণেশ্বরের নর্মলীলায় হয়ে যান আপন-হারা—বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজ দেবপুরীতে দেন ছড়িয়ে—বলেন,—আজ হতে এই ধাম হল ব্রজধামের স্বরূপ। যে তীর্থে স্বয়ং ভগবানের মরণান্ত তপস্যায় হল সর্বধর্মের প্রতিষ্ঠা, দেবতার শত অশ্রু-হাসিতে উচ্ছল যে ভূমি—সে ভূমিতে আবার রজের কি প্রয়োজন?···বোধহয় দ্বাপর-লীলার যোগসূত্রে এই সারূপ্য-সাধন।

নহবত
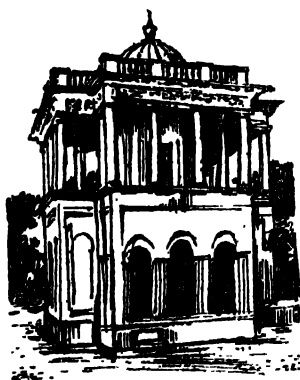
পঁচিশ

অধরার ধরা দেওয়া, অরূপের রূপায়িত হওয়া—অবতার লীলা, —এই ত নরলীলা—এই ত আঁধারের রূপায়ণ। সেদিন গহিন হতে গহিন হয়ে উঠেছে মায়ের অব্যক্ত রূপ—পঞ্চবটি হয়ে উঠেছে দর্শন বিঘাতক—অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন—মায়া আবরণের স্তরবিন্যাসে ভয়াল···

সহসা সেই সূচিভেদ্য অবলুপ্তি যেন জেগে ওঠে কার তীব্র উচ্ছ্বাসে—ও রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ—ওরে আমরা ত মানুষ নই, দেবতা!

অন্ধকারের বুক চিরে পাগল হয়ে ছুটে বেড়ায় এই বাণী—গঙ্গার অন্য কুলেও জাগে তার সাড়া···পাগলের মত হৃদয়রাম বলে,—মামা মামা আমরা ত মানুষ নই—তার চোখে তখন অকূল অন্ধকারের বুকে জেগেছে প্রমার প্রকাশনী···দেখেছে শ্রীঠাকুরের স্বরূপ রূপ জ্যোতিঘন তনু, আর নিজেকেও চিনেছে দেবানুচর রূপে—চির চিন্ময়—চির ভাস্বর···সে হারিয়ে ফেলে বাস্তবকে—ক্ষণিকে হয়ে পড়ে উন্মাদ···

সেই উন্মত্ত চীৎকারে শ্রীঠাকুরও হয়ে পড়েন ত্রস্ত—তাকে স্থির করবার মন্ত্র—নির্ভর প্রাণেরই মন্ত্র—সে মন্ত্রে তিমিরায়িত রজনী যেন আরো গহিন হয়ে ওঠে···মা—মা—দে—মা—জড় করে দে···

যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য—যাঁর ইচ্ছায় যুগ-যুগব্যাপী জড়ের বুকে নেমে এসেছে প্রাণের স্পন্দন—হেসে উঠেছে সোনার কাঠির পরশে শত যুগের ঘুমআঁখি—তাঁর ইচ্ছাতেই আবার চেতনের চোখে নামে জড়তার মোহ···এ আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ কে জানে···?

সেবকের চোখে তখন নেমেছে মৃত্যুর আঁধার, অর্গল-লুণ্ঠিত আকুলতায় সে বলে,—মামা একি করলে, আমাকে জড় করে দিলে! আধার আর আধেয়—কৃপা আর পাত্র, দুয়েরইত প্রয়োজন···সমন্বয়ের জগতে কেউ কাউকে এড়িয়ে থাকতে পারে না···তাই অযোগ্য আধারে কৃপা পারল না কুলাতে···শুধু বুক ভাঙ্গা কান্নাই হয়ে রইল চিরন্তনী···

পত্নী-বিয়োগ-বিধুর হৃদয়রামের তখন নববৈরাগ্য—শ্রীঠাকুরের সাহচর্য্যে তীর্থদর্শনের পর এই আঘাতে মন হয়ে পড়ে একান্ত বিষন্ন-বিধুর, শ্মশান-রিক্ততায় পরিপূর্ণ···পূজা আরাধনায় নিষ্ঠা হয়ে ওঠে নিবিড়। শ্রীঠাকুরের অনুকরণে ধ্যান জপাদিতে মন হয়ে ওঠে নিবাত—আর সেই সঙ্গে শ্রীঠাকুরের কাছে জানায় ঐকান্তিক প্রার্থনা গভীর উপলব্ধির সহজলভ্য প্রকাশ। শ্রীঠাকুর গাইতেন,-- কল্পতরু মূলে রই, যখন যে ফল বাঞ্ছা করি সেই ফল প্রাপ্ত হই—কল্পতরু মূলে তার সে বাস এতদিনের সেবাপরিচর্য্যায় সেবকের অন্তরে, সহজ প্রেরণায়, একথা নিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তার মন সহজ করেই ধরে নিয়েছিল যে দিব্যদর্শনের চাবিকাঠি শ্রীঠাকুরের হাতে নিত্য দিনের জন্যই রাখা আছে। তাই সে জানায় তার প্রার্থনা শ্রীঠাকুরের কল্পমূলে। এরপর হৃদয়ের হল এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—জ্যোতিঘন মূর্ত্তি দর্শনাদিতে ভাবাবেগে সকলের কাছে সে এক দর্শনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মথুর বলে,—বাবা এ আবার কি? আমরা যে তোমার চিরসেবক, নন্দী-ভৃঙ্গী—আমাদের এসব কেন?

শ্রীঠাকুর বলতেন,—এগিয়ে পড়—প্রথমে চন্দনকাঠের বন, তারপর রূপোর খনি—তারপর সোনার খনি—তারপর হীরের খনি···হৃদয় পড়ে থাকবার মন্ত্র পায়নি; সেও তপস্যার পাল ভরে চলে এগিয়ে—সেদিন পঞ্চবটীর আঁধার-থমকে শ্রীঠাকুর চলেছেন, চরণে ভাব-বেপথু ছন্দ, মুখে মার নাম—যুগের অন্ধকার শতচন্দিম-প্রকাশে হয়ে উঠেছে শান্তির স্নিগ্ধতায় নিবাত নিথর—সহসা শাণিত চিৎকারে অন্ধকার হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন,—মামাগো পুড়ে মলাম, পুড়ে মলাম। ত্রস্তে শ্রীঠাকুর যান এগিয়ে, দেখেন চির-পবিত্র পঞ্চবটীর সাধনপীঠে যন্ত্রণা-কাতর হৃদয়—করুণার্দ্র স্নেহস্পর্শে হটকারী সেবকের জ্বালা যায় জুড়িয়ে···হৃদয়ের একান্ত সাধ জেগেছিল শ্রীঠাকুরের মত উপলব্ধিতে ধন্য করে তুলবে তার জীবন, তাই পঞ্চবটীতে দুঃসাহসের অভিযান। গুরু নির্দ্দেশিত পদ্ধতি আর ক্রম, ধর্মজীবনের এই পাথেয় বিহীনে আঘাটায় বহু তরণী হয়েছে চূর্ণ-বিচূর্ণ।

হৃদয়রাম শ্রীঠাকুরের ছিল অসীম কৃপার পাত্র। হৃদয় এই সময় নিজ আবাস শিহরে আয়োজন করে শারদীয়া পূজার। শ্রীমান মথুরের

পুজামণ্ডপ, শ্রীঠাকুর না হলে হয়ে পড়ে শ্মশানশূন্য, তাই শ্রীঠাকুরকে তার চলত না ছাড়া। শ্রীঠাকুরও তাই সেবককে আশ্বাস দিলেন সূক্ষ্মশরীরে হৃদয়ের পূজার মণ্ডপে হবেন উপস্থিত। আরো উপবাসক্ষিন্ন মনে পূজার একাগ্রতা হয় না, তাই হৃদয়রামকে কিছু আহারের অনুজ্ঞাও এই সঙ্গে দেন। যথা সময়ে পূজা আরতিতে দেবীর পাশে তনুজ্যোতিতে শ্রীঠাকুর কৃপাবিষ্ট সেবককে করেছেন ধন্য—করেছেন তৃপ্ত।

চিনু শাঁখারীর বাড়ী

ছাব্বিশ

নবদ্বীপ এখন আর বাণীপীঠ নবদ্বীপ নাই। দেশ বিদেশের বিদ্যার্থীর বাগ-বৈভবে গঙ্গাকূল আর মুখরিত হয় না। গদাধর, গঙ্গেশ, রঘুনাথ এদের কণ্ঠ এখন নীরব। নিমাই-পণ্ডিতের যুগও নটরাজের নটছন্দে হয়ে গেছে গতিহারা...তবু স্মৃতি সুরভিত সুরধুনীর হাতছানিতে আজো প্রাণ হয়ে ওঠে আকুল—তবু শত দেউলে মুখরিত লীলার নদীয়া পথিক প্রাণকে দেয় ডাক।

অনেকের কাছে প্রত্যক্ষবাদী বলে কোঁতে, বেন্‌থাম্‌ প্রভৃতির নাম আজো ঋষিপদবীতে হয়ে আছে অক্ষুণ্ণ—আজো অনেকে রাসেল্‌ প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদীদের আনম্রশিরে জানায় শ্রদ্ধা...শ্রীঠাকুর স্বয়ং অবতার হয়েও মহাপ্রভুর অবতারত্ব, প্রত্যক্ষবাদীর বিচারে, বৈজ্ঞানিকের বিচারে যাচাই করে নিয়েছেন মেনে, বিশ্বাসের যোল আনায়। বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্মবিজ্ঞানের প্রমাণ শ্রীঠাকুরের সারা জীবনের ছিল সাধনা—তাই ছুটে গেলেন নবদ্বীপে, গুপ্ত বৃন্দাবনে—বড় গোঁসাইএর বাড়ী, ছোট গোঁসাইএর বাড়ী। মন্দির-বিগ্রহ সব দর্শন হল সারা। কিন্তু দেবতার কোন সাড়াই যে তৃষিত নয়ন পায় না—পায় না পিপাসিত শ্রবণ—

ক্ষ্যাপার খুঁজে ফেরা পরশমণির চির-হারান রতন হয়েই ডুবে থাকে নিরাশার আঁধারে...সব জায়গায় এক এক 'কাঠের মুরদ' হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে প্রাণ শুষ্কতায় ওঠে ভরে...রিক্ত তৃষ্ণায় নৌকায় উঠেছেন—এমন সময় রহস্য যবনিকা যায় সরে...শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে পরম পরশ-মণির প্রকাশ যেন শত বীণাবেণুকে করে তোলে ব্যথিত...ঐ এলোরে ঐ এলো...যে পরম রূপের প্রকাশে কবি সুরদাস অন্ধ হয়ে জানিয়েছিলেন প্রার্থনা সব রূপের চির-নির্বাণ, আজ সেই রূপোত্তমের দর্শনে শ্রীঠাকুর হয়ে পড়েন সম্বিৎহারা। সাধারণ রূপেরই একটা মাদকতা আছে—আর সব রূপের রূপময় যিনি, তাঁর দর্শনের মদিরতায় চেতন হারান যে সাধারণ কথাই—গৌর কিশোরের আর নিত্যানন্দের ঢল ঢল

কাঁচা লাবণি মাখা সোনারতনু শ্রীঠাকুরের দেবদেহে এক হয়ে যায় আর সব অবতারদের সমষ্টি শ্রীঠাকুরও হয়ে পড়েন অন্তর্দশায় আপনহারা, পরে যেমন, ভৈরবী যোগেশ্বরী বলেছেন,—এবার নিত্যানন্দর খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।

নদীয়া বিনোদই বৃন্দাবনের লীলাস্থান গুলির করেন প্রকাশ, ধর্ম-সংস্থাপনের এও যে এক অঙ্গ, এর জন্যইত যুগে যুগে দুখের ঘরে আসা। নদীয়ার অপ্রাকৃত স্থানগুলি আজ গঙ্গাগর্ভে চিরবিলীন, তাই শ্রীঠাকুরের ঐ দর্শন গঙ্গাগর্ভেই হয়।

পানিহাটির রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী

সাতাশ

স্বর্গের দেবতা যখন ধূলায় আতুল হয়ে আসেন, খেলার ছলে, তখন ধূলার ধনই হয়ে যান। সোনার তনু ধূলায় রাঙ্গান এ এক অপরূপ লীলা—আমাদেরই মত কান্নাহাসির মাণিক হয়ে মাটির ঘরে গড়াগড়ি দিয়ে কি সুখ, কি যে আনন্দ—স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার করে নানান দোলায় দুলে যাওয়ায় কি যে যাদু আছে কে জানে···

অবতারেরও শরীর ধরতে হয়, সুখ দুখও আছে, আত্মীয় স্বজনের বিয়োগও ত সইতে হয়, আলোছায়ায় খেলাঘরও বাঁধতে হয়—

অগ্রজ রামকুমারের পুত্র অক্ষয়, মাতৃহীন বালক, অতি শৈশবেই শ্রীঠাকুরের স্নেহ শিশিরে মানুষ; কামারপুকুরের নর্মলীলার অবসানে, অক্ষয় মাত্র দুই কি তিন বছরের দিব্য শিশু—দীর্ঘদিন পর আজ সে সপ্তদশের দীর্ঘায়ত যুবক, সুন্দর, সুঠাম···শ্রীমৎ তোতাপুরিজীর বিদায়লগ্নের কিছু পরেই দক্ষিণেশ্বরীর দেউলে রাধা-গোবিন্দের প্রাণঢালা পূজায় অক্ষয় এসে দেয় যোগ—এটি বারশো বাহাত্তর সালের প্রথম দিকের কথা—

লীলার রাজ্যে দেবতারও মহামায়াকে হয় মানতে। ভাগ্যের পরিহাসের হাসিতে দিতে হয় যোগ। দেবতার স্নেহরসসিঞ্চিত প্রাণ—অক্ষয়ের পূজা জপে ছিল অপূর্ব্ব নিষ্ঠা—রাধাগোবিন্দের পূজায় সে হয়ে যেত আপনহারা ···লোকারণ্যের মন্দির, সমারোহের মন্দির তার কাছে হয়ে যেত শূন্যপুরী ···ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার এমনি যেত কেটে। মন্দিরের পূজার পর আবার শিবের পূজায় নিজেকে নিবিষ্ট করে রাখত গঙ্গার উপকূলে, এরপর স্বপাকের ব্যবস্থা; পরে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠে নিজেকে দিত বিলিয়ে। দেববংশে দেবতারই উদ্ভব হয়। উপনিষদও বলেন···ব্রহ্মজ্ঞের কূলেই ব্রহ্মজ্ঞের জন্ম হয়। একথা সত্য। শ্রীঠাকুরও যেমন বলতেন,—কলুমে আমের গাছে কি নেকো আম হয়? সবদিকেই অক্ষয় ছিল দিব্য মানুষ···

মুমূর্ষু সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘন হয়ে আসে গঙ্গার দুই তীর—রহস্য যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে আসে ধরণীর দুই চোখে···কুঠির ঘরে ক্ষীণ প্রদীপশিখা

নির্ব্বাপমুখী—স্তিমিত থমকিত গৃহে শুনা যায় গভীর-গম্ভীর আশ্বাসের স্বর,—অক্ষয়, বল—গঙ্গা-নারায়ণ ওঁ রাম···তিন তিনবার সেই ধ্বনি জীবন মৃত্যুর মাঝে যেন দিব্য এক অমৃত সেতু করল রচনা—ধীরে ধীরে মৃত্যুর অন্ধকারে নেমে আসে অমৃত লোকের প্রশান্তি—ধীরে ধীরে অমর্ত্যের পথে যাত্রা করে মর্তের আর্ত, ব্যথা জর্জর প্রাণ।

অক্ষয়ের দিব্যজীবনে ছিল দুরপনেয় এক অভিশাপ···বিবাহের উৎসব হবে তার কাছে মরণের পরিহাস—তার ভবিষ্যৎদর্শী পিতা রামেশ্বরও কোন দিন তাকে কোলে করেননি; বলতেন,—মায়া বাড়াবার দরকার নাই। যাই হোক আত্মীয়দের বিশেষ চেষ্টায় অক্ষয়ের অশুভ বিবাহ বারশো ছিয়াত্তর সালের বৈশাখে সম্পন্ন হয় আর তার পরই বিষম জ্বর বিকারে অক্ষয় হয় শয্যাগত—শ্রীঠাকুর প্রথম হতেই দেন সাবধান করে। কিন্তু ললাট-লিপিতো মুছে ফেলা যায় না, তাই অস্তাচল আসে ঘনিয়ে। অক্ষয় শ্রীঠাকুরের চরণে প্রণাম জানিয়ে—শ্রীমুখের অভয়বাণী শুনে যাত্রা করেন বিশ্বনাথের পরমধামে···

শ্রীঠাকুরের মাঝেও ত ছিল সাধারণ মনের এক করুণকান্ত স্নেহ নির্ঝর···অক্ষয়ের মৃত্যুতে শ্রীপ্রভু সাধারণ মানুষের দেহবুদ্ধি অঙ্গীকার করে যে বিষম ব্যথা পেয়েছেন সেকথা নিজমুখেই দিয়েছেন জানিয়ে। লোকের কাছে শোক মোহের অতীত বলে পরিচয় দিয়ে, তুরীয় বলে প্রচারের চেষ্টা কোনদিনই করেননি। শোনা যায় শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের অন্তর্ধানে, মহাপ্রভুর বিরহজ্বালায় শরীর এত সন্তপ্ত হয়েছিল যে শুষ্কপত্র দেহে পড়লে ধূপশলাকার মত উঠত জ্বলে। শ্রীঠাকুরের এই মানুষ-ভাব মনস্বী মোক্ষমুলারকে করেছে অভিভূত, আর অকুণ্ঠে সেকথা দিয়েছেন ধরে তার বিখ্যাত পুস্তকে।

শ্রীঠাকুরের কথা,—আহা পুত্র শোকের মত কি আছে? খোলটা থেকে বেরোয় কি না? অক্ষয় মোলো তখন কিছু হলনা। কেমন করে মানুষ মরে বেশ দাঁড়িয়ে দেখলুম···যেন খাপের ভেতর থেকে বার করে নিলে, তলোয়ারের কিছু হল না—খাপটা পড়ে রইল···খুব আনন্দ হল, হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম—পরদিন এখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি

কে যেন প্রাণের ভেতরটা গামছা যেমন নিংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্ছে—অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি করছে। মানুষের মাঝে যেমন থাকে প্রজ্ঞা আর পশুত্বের খেলা—অবতারদের মাঝেও তেমনি জেগে থাকে চিরন্তন দেবত্বের মাঝে মাটীর মানুষের ক্ষুদ্রতা—কিন্তু সে ক্ষুদ্রতা বিদুরের ক্ষুদের মতই চির অপার্থিব—চির মধুর—চির মোহমেদুর…

এখানে শ্রীঠাকুরের দর্শনে, পরলোকের এক অপরূপ রহস্য ভেদ হয়। মৃত্যুর পরে জ্যোতির্ময় আত্মা যেন তলোয়ারের মত চকিতে যায় বেরিয়ে, খাপ ছাড়া তখন তার আকার থাকে, তবে সেটি জ্যোতির্ময় ও সূক্ষ্ম। যা পড়ে থাকে দেহ—সেটা খাপের মতই জড়। সাধারণতঃ তলোয়ারটাই কর্ম করে, খাপটা জড়বৎ থাকে; তেমনি দেহান্তেও সেই চিন্ময় আত্মা দেহ থেকে যায় বেরিয়ে আর শ্রীভগবানই তাকে টেনে নেন যেমন তলোয়ারটি মানুষেই নেয় টেনে।

অক্ষয়ের পর শ্রীঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বরই নিয়েছিলেন বিষ্ণু মন্দিরের পূজার ভার।

শ্রীমান মথুর এরপর শ্রীঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে যান জমিদারী ও পৈতৃকগৃহ দর্শনে, রাণাঘাট, সাতক্ষীরা প্রভৃতি স্থানে। ভক্ত মথুর জমিদারী দর্শনের সময় স্বীয় ইষ্টকে হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়ে নিজে শিবিকা করে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে ঠাকুরের খাজাঞ্চি বলে যে পরিচয় দিতেন এটি তারি নিদর্শন।

যুগীদের শিব মন্দির

আটাশ

ভাগবৎ ভক্ত ভগবান, তিনে এক একে তিন—শ্রীঠাকুরের এই মহাবাণীতে যেন সমস্ত বিশ্ব বিধৃত রয়েছে। ভাগবৎ বলতে শাস্ত্র-নিচয় আর শ্রীভগবানের সৃষ্টিমাত্রেই ভক্ত পর্য্যায়ে পড়ে। স্তরভেদে ভক্তের আবার বিভিন্নরূপ। উত্তম, মধ্যম, অধম--বহুরূপে তার প্রকাশ। অজ্ঞেয় ও অবিশ্বাসী এরাও ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য। অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক রাসেলের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—ভগবানের প্রচ্ছন্ন জয়গানে উচ্ছ্বসিত।

সেদিন কলুটোলার হরিসভার আসরে নেমে এসেছে এক হরিবাসরের রাত্রি—চন্দনে, আলিম্পনে, ধূপে, সৌরভে, সুমধুর হরিকথায়—মাটীর মর্ত্তে যেন অমর্ত্তের শ্যামশোভা হচ্ছিল স্পন্দিত—কেবল শূন্যমুখে পড়েছিল মহাপ্রভুর শুভ্রসুন্দর পুষ্পাকীর্ণ আসনখানি...গ্রীক দর্শনে সক্রেটিসের কথার সঙ্গে আমাদের শ্রীঠাকুরের কথার অদ্ভুত সঙ্গতি দেখতে পাই। আরিস্টটল বলেছেন,--তিনি নিজে অচঞ্চল থেকে আমাদের করেন আকর্ষণ। আর শ্রীঠাকুর বলেছেন,—তিনি যেন চুম্বক আর ভক্ত যেন ছুঁচ...কিন্তু শ্রীঠাকুরের কথা সক্রেটিসের উপরের কথা। শ্রীঠাকুর আরও বলেছেন,—আবার কখন ভক্ত হন চুম্বক আর ভগবান হন ছুঁচ। চুম্বকের স্পর্শে লোহা চুম্বক হয়ে যায় একথা বিজ্ঞানের এক নিকষিত সত্য। কাজেই ভগবৎ নামে ও চিন্তায় ভক্ত যে চুম্বক হবে একথা আর প্রমাণ প্রয়োগে বুঝতে হয় না।

যাই হোক্ সেদিন সেই দিব্যমন্দির সন্ধ্যায় ভাগবৎ আর ভক্তের মিলন আকুতিতে ভগবানের হল আবির্ভাব, স্থূলে আনন্দঘন-মূর্ত্তিতে-- দেখা গেল ভাব-বিগলিত-তনু আমাদের ঠাকুর দাঁড়িয়েছেন শ্রীচৈতন্য আসনে—উভয় হস্তে মহাপ্রভুর প্রেমমুদ্রা—নয়নে আনন্দাশ্রু, প্রেম বিজৃম্ভিত ঈষৎ হাসিতে উছলিত—সমাধি নিথরিত দেহে প্রেমমূর্ত্তি স্বয়ং মহাপ্রভুর হয়েছে আবির্ভাব। ভক্তকণ্ঠে মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে আর কীর্ত্তন উচ্ছ্বাসে সেদিনের সভা-সমাপ্তির সে অপূর্ব্ব কাহিনী কলুটোলার হরিসভার এক গরিমাময় সার্থকতা!

উচ্চবিজ্ঞানের তত্ত্বে দেখা যায় জগতে বৃহৎ বস্তুর সন্নিকটে স্থান কালের এক অসমতলের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন প্রভৃতির এই মত। শ্রীঠাকুরের হরিসভার আবির্ভাবে যে উচ্চ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার নীচেই এক বৈষম্যের হল উৎপত্তি।

শ্রীঠাকুরের স্থানান্তরে গমনের পরই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা জল্পনা কল্পনা চলে। আর এর পরিসমাপ্তি হয় কালনার ভগবান দাস বাবাজীর কাছে নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির বিধি প্রার্থনায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখে ঐ বিবরণে, সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী ভবিষ্যতে চৈতন্য আসন রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মহাপুরুষদেরও ক্ষণিক ভুলের বিলাস আছে। বৃন্দাবনে ব্রহ্মারও ভুল হয়েছিল। তিনি কৃষ্ণবাসুদেবকে অসামান্য বলে ধারণায় অক্ষম হন, ফলে গোবৎস ও গোপবালকদের হরণ, আর ভগবানের ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিতে বৃন্দাবনে ঘরে ঘরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে লীলার কথা ভাগবৎ শাস্ত্রে রসমেদুর বর্ণনা আছে।

ভগবানদাস বাবাজীরও শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। তাই দেখি সেদিন পুণ্য-তরঙ্গিণী গঙ্গা-পথে শ্রীঠাকুরও উপস্থিত কালনার আশ্রম প্রাঙ্গণে। বরদেহ শ্বেতশুভ্র বসনে আবৃত—গোপন লীলার ছলে ধরা দিতেই যেন আসা—একে অবতার লীলাই গোপন লীলা, আর গুপ্তনট আমাদের এই ঠাকুরের লীলা আরো লুকানো—তাই হৃদয়ের সমভিব্যাহারে এসে দাঁড়িয়েছেন কালনার সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর দেউলদ্বারে। হৃদয়কে করেছেন অগ্রদূত আর নিজে আছেন প্রতীক্ষারত। সিদ্ধ দাসজী বিনয়ের অবতার। বহু সম্মানে হৃদয়কে করলেন আপ্যায়িত। হৃদয় ঠাকুরের আগমন বার্তা নিবেদনের আগেই সিদ্ধ মহাপুরুষ সাধনা-প্রসূত দিব্যদৃষ্টিতে শ্রীঠাকুরের সমাগতি পারেন জানতে যাই হোক শ্রীঠাকুর সাদরে হলেন অভ্যর্থিত। শ্রীঠাকুর কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পান বাবাজী মহারাজের জনৈক সাধুর প্রতি তিরস্কার বাণী। অবতার বরিষ্ঠদের জীবনের ব্রত ধর্মের গ্লানি অপনয়ন করা। ভগবান বুদ্ধকে দেখি—দেবদত্তের বিরোধিতায় নিযুক্ত। ভগবান ঈশামসিকে দেখি—জিহোভার মন্দিরে

কাঞ্চন-কলুষের পণ্যশালায়... আচার্য্য শঙ্করকে দেখি দিগ্বিজয়ের পথে ধর্মের জয়রথে...তাই শ্রীঠাকুর, বাবাজী মহারাজের নিরভিমান চিত্তের ক্ষণভিন্ন অশান্তির সংস্কার অর্ধবাহ্যে, ভাব ভূমিকার রহস্যময় লোক হতে।

সিদ্ধ হলে কি হয়—শ্রীঠাকুর বলতেন,—সিদ্ধ হলে কি আর দুটো শিং বেরোয়, সিদ্ধ হলে নরম হয়। সিদ্ধ ভগবানদাসজীও তাই শ্রীঠাকুরের মহাভাবের প্রেরণার শিক্ষা নম্রশিরেই নিলেন। এর পর ভাবগর্ভর হরি কথা, অঙ্গনের মঙ্গল দীপটিকে স্নিগ্ধ নিবিড়তায় যে ভরে তুলেছিল একথা সহজেই মনে হয়। সিদ্ধ ভগবানদাসজী শ্রীঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা প্রত্যক্ষে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন আর পূর্বাপরাধ স্মরণে তৃণ দীনতায় ক্ষমাভিক্ষায় এই লীলার পটক্ষেপ হয়।
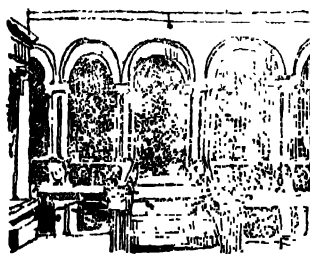
কলুটোলার চৈতন্য সভা

ঊনত্রিশ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাত্র সার্দ্ধ-তিনজন রসদ্দার ছিলেন। এবার শ্রীঠাকুরেরও মাত্র সার্দ্ধ-তিনজনের ভাগ্যেই ঐ ভার ছিল। দীর্ঘ চৌদ্দবৎসর শ্রীঠাকুরের সেবার ভার মথুরের সৌভাগ্যেরই পরিচয়। দিব্য সেবাধিকার বহু ভাগ্যেরই কথা। অবতারের সাক্ষাৎকার যুগে যুগেই বিরল—আর তাঁর স্বরূপ জানা আরো বিরল—তাঁদের কৃপাতেইত এটী সম্ভব হয়। পরশমণি শ্রীঠাকুরের স্পর্শে মথুরের জীবনে ঘটে এক বিশেষ রূপান্তর। এর ফলে শ্রীঠাকুরের রসদ্দারের কথায় ও কাজে এসে গিয়েছিল এক অপার্থিব দিব্যতা। সে একদিনের কথা—মথুর অসুস্থ, শয্যালীন, জানবাজারের গৃহে, অনেকদিন শ্রীপ্রভুর চরণ দর্শনে বঞ্চিত—চিত্তে জাগে আকুল তৃষ্ণা, দর্শনের পিপাসা—ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবান আর কি পারেন স্থির থাকতে? হয়ত এও এক পরীক্ষা—হয়ত মথুরের মনে ছিল কিছু দ্বন্দ—ভক্ত ভগবানের লীলায় প্রবেশ নিষেধ। দুঃখ, ব্যাধি, অশান্তি এদের এক পরম পরিণতি আছে—আছে এক চরম প্রয়োজন—যে অহং আমাদের পরমার্থের পথে রচনা করেছে বিরাট এক বাধা সেই অহং হয়ে পড়ে আপনহারা—তার স্থূলতা যায় হারিয়ে। জমিদার মথুরের দর্প আর অহংএর গুঁড়ি গেছে সরে—ভক্ত মথুর প্রতীক্ষারত—আছেন শ্রীঠাকুরের পথ চেয়ে—সহসা যেন স্বপ্নমথিত বেশে এসে দাঁড়ান আর্ত্তিহারী স্বয়ং—করুণ-কান্ত নয়ন—ভক্তের ভগবান। রোগ কাতর চক্ষে তখন নেমেছে ভক্তির মন্দাকিনী—আবেগে দুটি হাত জুড়ে প্রার্থনা করেন,—একটু কৃপা—আর সেই সঙ্গে ভবসাগর পারের পাথেয় শ্রীগুরুর চরণ-রজের একটী কণা—শরীরের জন্যে ত নয়—এ যে সর্বপ্রয়োজনের পারের আয়োজন! শ্রীঠাকুরের শিহরিত তনুতে নামে ভাবগঙ্গা—আর মথুর আকুল নয়নে সে পরম-কাণ্ডারীর চরণে নিঃশেষে নিজেকে দেন বিলিয়ে…

দীর্ঘ পনেরটি বর্ষ এমনি দিব্য সেবাধিকার মহাকালের মন্দিরে রয় জড়িয়ে। মথুরের জীবন-প্রদীপ ক্ষীণ হয়ে আসে। বারশো আটাত্তর সালে

আষাঢ়ের মেঘ-মলিন একদিনে মথুরের এল বহু দূরের ডাক—অসুখের সংবাদ হৃদয়রাম নিত্য দিতেন এনে। শেষের সেদিন শ্রীঠাকুর তাকেও আর পাঠান নি। নিজ মন্দিরের আধো ছায়ে হলেন সমাধিস্থ, আর সমাধিভঙ্গে মথুরের দেবীলোক প্রস্থানের কথা করেন প্রকাশ। সেবক-প্রধানের জীবন-যবনিকার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঠাকুরের জীবন-নাট্যের আর এক অঙ্কের হয় সমাপ্তি—মহাকালের, মহানাটকের অন্তহীন লীলা—চির-ছন্দে চলাই শুধু জানে।

জানবাজারে মথুরের গৃহ

ত্রিশ

যুগচক্র যায় ঘুরে—ফাগুনের বনান্তে নবজাগরণীর পূর্ব্বাশা দেয় দেখা —বাঁকুড়ার শ্যাম-পথ-রেখা বেয়ে চলেছেন তীর্থকামী কয়েকটি নরনারী —শ্রান্ত নয়নে জেগে আছে ভক্তির আকুতি—চলেছেন কালীক্ষেত্রে, সুরধুনী তীরে স্নান পুণ্যের উদ্দেশ্যে—

ব্যথার রাত্রি চিরদিনই গহিন—তার চেয়েও গহন গাহন রাত্রি নেমেছে দুঃখজর্জর ধরণীর বুকে—রহস্য নীরব চটিতে মাত্র একটি প্রাণী আছে জেগে—নিথর রোগকাতর দেহ, আর বেদনাহত আচ্ছন্নে জাগে শুধু দূর দুটী করুণায়িত দিঠী···সহসা চমক জাগে সারা তনু মনে সারা বিশ্বের আর্ত্তিহারী—যুগে যুগের জ্বালা জুড়ান, করুণার্দ্র করে কে যেন সারা দেহে দেয় অমৃতের প্রলেপ—চেয়ে দেখেন রূপ ত নয়—ভরা চাঁদের নীলিমা অঙ্গে মেখে এসে বসেছে—কালোর আলো এক মেয়ে যেন আঁধারকাঁদা মেঘের বুকে বিদ্যুতের বিলাস—নীলকান্তমণির হাসি—যেন আলোয় জ্বলে যাওয়া নয়ন-পল্লবে তৃপ্তির রূপাঞ্জন—বিশ্বের সব আলোকে লজ্জা দিতেই যেন বসেছে এই কাল ভুলানো মেয়ে, বেদন লুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন জাগে,— তুমি কে গা—প্রসাদ প্রসন্নে আসে উত্তর,—আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি···

দক্ষিণেশ্বর!—সুখ স্বপ্নের দখিণাপুরী! সপ্ত-সায়র সেঁচা তীর্থ— চির আশা-মন্থন দেবায়তন! অবাক বিস্ময়ে আবার জাগে প্রশ্ন, আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব—উত্তর আসে,—সেকি, তুমি যাবে বৈকি—সেবা করবে, তোমার জন্যেই ত তাকে সেখানে আটকে রেখেছি। শিহর লাগা পুলকে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে,— বটে, তুমি আমার কে হও গা···সারাবিশ্ব কান পেতে শোনে—নিরন্ধ্র নিথর চিত্তে—অবুঝ অবোধ প্রাণে শোনে,—আমি তোমার বোন হই···এ কি রহস্য কে জানে? আজও কি কেউ বুঝেছে মূর্ত্ত-অমূর্ত্তের ধরা দেওয়ার কি এই অভিনয়···। সব দুঃখ, সব জ্বালা যায় জুড়িয়ে—অগাধ প্রশান্তিতে

তনুমনে নামে তন্দ্রাবেশ···ধরা ছোঁয়ার জগৎ যায় হারিয়ে···কূজন মুখর ভোরের আলোয় জননী জেগে দেখেন, দেহ মনে অসুস্থতার নাই কোন চিহ্ন—সুখ স্বপ্নের রেশের মত শুধু জাগে আয়ত মেদুর দুটী আঁখি··· দক্ষিণেশ্বরের আবাহন ইঙ্গিতের মত···পিতা রামচন্দ্রের সঙ্গে ছায়াতল বাহিনী গঙ্গার মত চলেন শ্যামা-নন্দিনী, সাগর-সঙ্গমে—দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে··· ··· ···

তুমি এত দিনে এলে—শ্রীঠাকুর করেন প্রশ্ন—লোকমুখে শ্রীমা শুনেছেন কেবল একটি কথা—দেবতা হয়েছেন উন্মাদ—চক্ষুকর্ণের বিবাদ যায় মিটে। দেবতা চিরদিনই দেবতা—সেই সমাধিস্নিগ্ধ দেহ—করুণানিমিল নয়ন—বিশ্বার্ত্তিহারী তেমনি প্রেমহসিত বয়ান—চিরপিপাসিত নয়নে জাগে সব হারান দুটি ফোঁটা বকুলঝরা অশ্রু—আর দেহছন্দে সব সমাপনের একটি প্রণাম !

যুগের সারথি হতেই তো অবতীর্ণ হওয়া—ধর্মের প্রতিষ্ঠাই তো অবতরণের রহস্য···পাশ্চাত্যে মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠার নিরিখ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, নানাভাবে মাতৃজাতিকে উদ্বুদ্ধ ও মুক্ত করার চেষ্টার মাহেন্দ্রলগ্ন ; এর সূত্র খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখি অমা-মথিত দ্বিজামা এক রজনী—ফলহারিণী কালিকা-পূজার এক পুণ্যতিথি··· ··· ···

তারকিত শত আঁখি মেলে সেদিন কালো মেয়ে প্রতীক্ষারত—নয়ন আসন্নে পরমলগ্নের এক সুখের থমক—আনন্দোচ্ছল সুরধুনী যেন নিরুদ্ধ আশায় কম্পিত—দক্ষিণেশ্বরে একদিকে সেদিন উৎসব সজ্জার রাত্রি, আর অন্যদিকে শ্রীঠাকুরের মন্দিরে জ্বলে উঠেছে একটি নিবাত প্রেম-প্রদীপ —সামান্য উপায়নে—ধূপে দীপে, প্রাণের পূজার মন্ত্রই হচ্ছে ছন্দিত···উদার অভ্যুদয়ের মুহূর্তগুলি ত ইতিহাসের হারানো পাতা—গভীর গম্ভীরে জাগে মধুছন্দের মন্ত্রমালা—ষোড়শী মাতৃকার আবাহনী—হে বালে—হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ, ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কঁর—রহস্যপূজার কন্দরে বসেছেন শ্রীঠাকুর আর আলিম্পনমণ্ডিত আসনে জননী সারদা—ত্রিপুরা-সুন্দরী নিজে···সব সমাপ্তির পূজা—ফলহারিণী ভবানীর এই পূজাই শ্রীঠাকুরের

শেষ পূজা—নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার শেষ আয়োজন—আপন জপমালা দেবীর চরণে নিবেদনে জানান প্রণাম—হে সর্ব্বমঙ্গল্যে—শিবগেহিনি, নারায়ণি তোমায় প্রণাম! প্রণাম!!

এর পরের কথা—ব্রহ্ম আর শক্তি হয়ে যায় অভেদ—দুই আত্মা সমাধিতে হয়ে যায়—অদ্বয়।

বিশ্বের মাতৃপ্রতিষ্ঠা এই দিনেই ঠিক হয়েছিল—মাতৃজাতির চিরকল্যাণের দ্বার সত্য করে এই দিনই হয়েছিল অপাবৃত—বিশ্বনাথ এই দিনেই নিজেকে করেন বিশ্বজননীর চরণে সমর্পণ—শিব যে অন্নপূর্ণার দ্বারে সর্ব্বহারা···বারশো আশির জ্যৈষ্ঠে ফলহারিণী তিথিই এই মহালগ্নের তিথি।
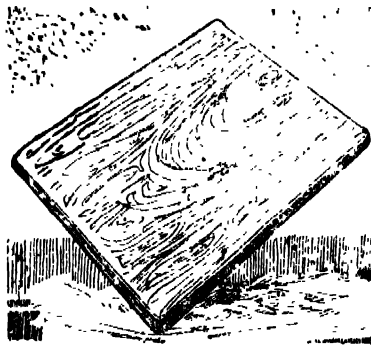
ষোড়শী পূজায় শ্রীশ্রীমায়ের পিঁড়ি

একত্রিশ

শ্রীঠাকুর বলতেন জাবর কাটার কথা। বলতেন, কোনো দিব্য অনুভূতির পর জাবর কাটতে হয় সেটি নিয়ে, স্মৃতির তীর্থে তাকে করতে হয় চিরন্তন ···এই ঘটনার পর শ্রীমার শ্রীঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্যে প্রায় বৎসরাধিক যায় কেটে। সব তপস্যার একটা পরিণতির কথা থাকে—অভীষ্টলাভের কথা থাকে—সাধারণ তপস্যার পরিণতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিধা লাভ—কিন্তু দিব্য পুরুষের তপস্যা—ভূমার জন্যে তপস্যা, বহুজনের হিতের জন্যে বহুজনের সুখের জন্যে তপস্যা···

শ্রীঠাকুরের এই বিশ্বযজ্ঞ মানবেতিহাসে কি মহান ফলপ্রসূ হয়েছে সে বিচারের দিন আজও আসে নাই—তবে শুধু নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলেই চলবে না—জগন্নাথের রথরজ্জুতে, চক্রধারীর ধর্মচক্রে আমাদেরও দিতে হবে হাত। বিশ্বযজ্ঞে আমরাও যে ঋত্বিক···

এই সময় দুই পরম আত্মার মিলন ক্ষণগুলি যেন অম্লান দুটি ভোরের তারার মত থাকে ফুটে, পূততোয়া ভাগীরথীর বুকে; কখন শ্রীঠাকুর সমাধিতে থাকেন আপনহারা, সারা রাত্রি—তাঁর পাশে থাকেন মা জননী, মূর্ত্তিমতী ভবতারিণী স্বয়ং—কোনো কোনো দিন হৃদয়রামকেও নিতে হয় ডেকে—শ্রীঠাকুরের সমাধিভঙ্গের সহায় হতে······

মা—মা একি বলছিস গো···কম্প্র করুণ ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে উদ্যানবাটী···। শরণ ছন্দিত করে বেপথু নয়নে মার চরণে জানান পরম আর্ত্তি,—মা—মাগো একি করছিস্ মা—অশান্ত বুকে তখন নেমেছে এক বিপরীত ভাবগঙ্গা—ভগবান ঈশামসির ভাবধারা—নিজেকে পারেন না ধরে রাখতে, সব চেষ্টা সব আকুলতা হয়ে যায় ব্যর্থ···নয়নোচ্ছলে দেখেন ঈশামসির আলেখ্য থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতিকণা, ঈশা সম্প্রদায়ের মন্দিরে ভক্ত সাধককুলের পূজা প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের অপরূপ রূপায়ণ—অবশে অপলকে শুধু চেয়ে থাকেন—পূর্ব্ব সংস্কার আসে ক্ষীণ হয়ে—

আর তার পরিবর্ত্তে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ভাব বিলাসে তনুমনে নামে বিজাতীয় সংস্কার বন্যা।

ভুল হয়ে যায় দক্ষিণেশ্বর—মুছে যায় ভবতারিণীর করুণাঘন নয়নান্তের প্রসাদ দৃষ্টি--ভুল হয়ে যায় এতদিনের সাধনার ধারা—তিন দিন, তিন রাত্রি এই দর্শন লীলায় ঠাকুর হয়ে থাকেন আপনহারা। কুমড়ে পোকা ধরা আরশুলার কথ ঠাকুর যেমন বলতেন—আর বলতেন, -ডিমে তা দেওয়া পাখী—তেমনি উদাস বিভোর নয়নে থাকেন বসে—চোখে নামে অপার্থিব ঈশামসির বিলাস-লীলা---তৃতীয়দিন পঞ্চবটী আলো কোরে এসে দাঁড়ান ঈশামসি স্বয়ং—শোভন সুন্দর, নয়ন বিশদে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি ইহুদিজাতি-সুলভ নাসিকার কিছু খর্ব্বতা—যুগ যুগ মথিত করুণাবতারের দেহ যায় মিলিয়ে শ্রীঠাকুরের সমাধিবিলীন দেহে—যেমন পরে বলেছিলেন —দেখছনা এক-এক, এই দেহে এমন করে রয়েছেন।

ভক্ত ও রসদ্দার শম্ভু মল্লিকের উদ্যান গৃহ, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন— শ্রীঠাকুরেরও সে গৃহে যাতায়াত ছিল। সেদিন শ্রীঠাকুর শম্ভুর গৃহসংলগ্ন ম্যাদোনা মূর্ত্তি দর্শনে ঐ ভাবে ঈশামসির পেয়েছিলেন দিশা—পেয়েছিলেন সাগরপারের পরশমণি।

বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। বর্ত্তমান মানুষ যুক্তিবাদের মানুষ। বিনা বিচারে মেনে নেওয়া প্রগতিশীল মন সায় দেয়না। তাই দেখি শ্রীঠাকুর প্রচলিত ধর্মমতগুলি নিচ্ছেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে আর সুরু করছেন পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান। একে একে চব্বিশটী তন্ত্র, বৈষ্ণবমত-বিবেক পঞ্চভাবাশ্রয়ের হলো সায়। অদ্বৈত বেদান্তের বেদ্যকেও হল জানা। এরপর বৈদেশিক সাধনায় পেলেন মহম্মদের দর্শন—আর ঈশামসির পথে লাভ করলেন ঋষিখৃষ্টের একাত্মবোধ। নিজে যেমন বলতেন,—রত্নাকরের তীরে বাস করে যেমন মনে হয় আরো কত রত্ন আছে দেখি সাগর গর্ভে, তেমনি কত ভাবে, কত রূপে শ্রীভগবানকে লোকেরা ডাকে, তাঁর দর্শনের চেষ্টা করে, সে সব পথের পরিচয় পেতে মন হত অস্থির। এমনি করে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলি সত্য বলে পরিচয় করেই না বলতে সক্ষম হলেন,— যত মত তত পথ, সব পথই সত্য। সব শিয়ালের এক রা। আর এমনি

করেই সব মতের সব পথের অবতার, প্রফেট্ বা মুরশিদ্ পদবীতে হলেন প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ—একত্বের যুগ—এ যুগের মানুষ সারা বিশ্বকে একসূত্রে চায় বাঁধতে—এ যুগে মানবাত্মা সামান্য জাতির বা দেশের গণ্ডীতে চায় না বদ্ধ হতে—তাই এ যুগের ঠাকুরও নিলেন সব ধর্মের সাধনা ও সিদ্ধি—অবতারদেরও আছে ক্রম, আছে বিবর্ত্তন--তাই স্থান-কাল দৃষ্টে আমাদেরও স্বামিপাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয়,– হে অবতার বরিষ্ঠ তোমায় জানাই আমার পরম প্রণতি !

সি. এম. এস. চার্চ্চ

বত্রিশ

ভক্তবীর গিরীশ ঘোষকে শ্রীঠাকুর দেখেছিলেন, মা ভবতারিণীর দক্ষিণ জানু থেকে বাইরে আসতে। শ্রীঠাকুর বলতেন,—গিরীশ ভৈরবের অবতার। ভৈরবের অবতার না হলে শ্রীঠাকুরকে এমন করে কে পাঁচসিকে পাঁচ আনা ভক্তি দিয়ে ধরতে পারে ? কলকাতার বাগবাজার পল্লীতে সেদিন প্রদোষের অন্ধকার এসেছে ঘনিয়ে, গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপে আর মঙ্গলশঙ্খে দিনান্তের শুভসূচনা উঠেছে জেগে।

তখনকার এই অঞ্চল ছিল নিভৃত পল্লীজননীর মতই প্রশান্তিতে ভরা —আধো আলো, আধো ছায়া বুকে নিয়ে ধীরে নেমে আসত সন্ধ্যার আঁচল খসা আবেশ ··· নাট্যসম্রাটের গৃহদ্বারে সেদিন এসে দাঁড়িয়েছেন ধীর পদক্ষেপে যোগীন মহারাজ, পরে যিনি স্বামী যোগানন্দ নামে শ্রীমার একান্ত সেবক ও অনুগত হযেছিলেন। নাট্যসম্রাট সেদিন ছিলেন অনুপস্থিত। বালক ভক্ত যোগীন ছিলেন প্রসিদ্ধ সাবর্ণি চৌধুরীর বংশের ছেলে—সহজেই শান্ত আর নম্র। ভক্তবীর গিরীশের গৃহে আসা তখন অনেকেরই ভীতির কারণ ছিল। বৈঠকখানা ঘরে নানা চিন্তায় আছেন বসে ভক্ত যোগীন,— সহসা ঘোষজা মহাশয় এসে উপস্থিত—তিনি তখন একান্ত মত্ত··· । এসেই জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন,—কে হে ছোকরা-· পরিচয় পেলেন—পরমহংসদেব পাঠিয়েছেন এক বাণ্ডিল বাতির জন্যে—শুনেই তিনি দুয়ার ধারে পড়েন বসে··· ভক্তবীর অভিনয়ে সে যুগে ছিলেন বিশেষ কুশলী, এ কথার লোক প্রসিদ্ধি আজও আছে। তাঁর নিজের কথায় পাই—জীবনে তাঁর দুটি বিষয়ে কৃতিত্ব ছিল, নাট্যসম্পাদনে আর নাট্যাভিনয়ে। মা ভবানী একদিন স্বপ্নে দর্শন দিলেন তাঁর একটি দিক হরণ উদ্দেশ্যে। ভৈরব নির্ভীক উত্তরে মঞ্চের কৃতিত্বই মার চরণে দেন বলিদান। এরপর থেকেই তাঁর অভিনয় গৌরব ম্লান হয়ে আসে-—মা ভবতারিণীর দিব্যলীলা চিররহস্যায়িত। হরিশ্চন্দ্র নাটকে চণ্ডালের অভিনয়ে— আঁখ উপাড়ে লেব বলে রক্তিম চক্ষুতে যখন এসে দাঁড়াতেন

তখন প্রেক্ষাগৃহে এক বিভীষিকার হতো সৃষ্টি…যাই হোক সেদিন বোধ হয় রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনয়ের পূর্বসূচী ছিল––সেই অবস্থাতেই তিনি নানা নটভঙ্গীতে শ্রীঠাকুরের এই প্রয়োজনে বারবার জানান প্রণতি, শ্রীদক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে। সেদিনের বাগবাজার পল্লী গৃহারণ্য ছিলনা। শ্রীদক্ষিণেশ্বরীর মন্দিরশীর্ষ বাগবাজার অঞ্চল হতেই দৃষ্টিতে পড়ত।

এরপর যোগীন মহারাজের ভীত স্তিমিত চোখের উপর সুরু হয় এক অদ্ভুত নটরঙ্গ—ভক্তবীর গিরীশ উন্মত্ত ভঙ্গীতে সুরু করেন শ্রীঠাকুরের স্তব—এ স্তব, খেউর স্তব—শ্রীঠাকুরের চতুর্দ্দশ পুরুষকে জড়িত করে তিক্ত উক্তি—আর তার পর্বে পর্বে ভূলুণ্ঠিত প্রণতি। ঘনায়মান সন্ধ্যা নিবিড়তর হয়ে আসে, ভয়াবহ রজনী বালকের চক্ষে যেন নিথরতর হয়ে আসে—ভীতি জড়িত বালকের চক্ষু তখন পলায়নের সন্ধিতে ইতস্তত দর্শনা-কুল––কিন্তু দুয়ারে ভৈরবাবতার আছেন বসে—পলায়নের পথমাত্র নাই; ক্রমে গিরীশের সহজ চেতনা আসে ফিরে, তিনি ভৃত্যকে এক বাণ্ডিল মোমবাতি দিতে আদেশ দেন—সেদিন পলায়মান সন্ধ্যায় একটি ভক্তের পলায়ন যে অন্তর নিঙড়ান ব্যাকুল প্রার্থনারই সুফল, দক্ষিণেশ্বরের অন্তর্যামীই তার একমাত্র সাক্ষী!

আর একদিন দক্ষিণেশ্বরের লীলাব্রজে বসে আছেন নব-ব্রজরাজ। শ্রীঠাকুরের নিজের কথা,…সেদিন তীর্থঙ্কর বেশে ধূলি-ধূসরিত চরণে আবার এসে দাঁড়িয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে—আর শ্রীহস্তে বৃন্দাবনের রজ ছড়িয়ে বলেন আধো-ফোটা কথায়,—আজ হতে এস্থান বৃন্দাবনের মত তীর্থ হল…ভক্তবীর আছেন বসে, চিন্তাসমাকুল চিত্তে। সহসা শ্রীঠাকুর বলে ওঠেন,—গিরীশ সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ মনন করবে—শ্রীপ্রভুর তখন অর্ধবাহ্য দশা—ঘোষজা ভাবেন, অভিনেতার সকাল সন্ধ্যার কোন নিরিখ নাই—আর তার ওপর তিনি ভৈরবের অবতার। চোখে ভেসে আসে কৈশোরের চপলতা…যে কাজে নিষেধ সেই কাজেই ছিল দক্ষতা। দেবতার উদ্দেশ্যে কুটোবাঁধা ফলটি না হলে তাঁর চোখে আসত না নিদ্রা। বাইবেলে কথিত ইভ্-এর মত তাঁর নিষিদ্ধ ফলই ছিল প্রিয়। নিয়ম কানুনের গণ্ডী না ভাঙ্গলে স্বস্তি হত না মনে; ভাবেন আর ভাবেন, চিন্তার হয় না শেষ।—তাও যদি না পার *

তবে,—অন্তর্যামী বলে ওঠেন,—খাবার শোবার আগে তাঁকে ডাকবে। দেবভৈরবের চিন্তা গভীরতর হয়ে আসে ; তার জীবনে খাওয়া ও শোওয়া দুইই অসাধারণের পর্যায়ে পড়ে—নিয়মও নাই, বন্ধনও নাই। ব্যথিয়ে ওঠে সারা চিত্ত—গুরুর এই সাধারণ উপদেশের মর্যাদা দিতে মন মাথা নাড়া দিতে থাকে বাসুকীর ফণার মত, নত মস্তকে অন্তর মথিত নীরবতায় গিরীশ শ্রীঠাকুরের চরণ চিন্তাই একমাত্র উপায় স্থির করে থাকেন বসে। লীলাকমলে তখন অলকার করুণা-গঙ্গা—সহসা বেদকণ্ঠে জাগে অশ্রুত এক বাণী,—তবে আমায় বকল্‌মা দাও। যেন বহু যুগের পরপার হতে সে ধ্বনি, সে বাণী, তৃষিত বিপর্যস্ত ভক্তের কর্ণে অমৃত করল সিঞ্চন—তনুমন বিলুণ্ঠিত একটি প্রণামে ভক্তবীর জানান তাঁর অন্তরের পরম স্বস্তি—পরম দৈন্য··· পরে তাঁরই মুখে শুনি,—এবার আমায় উদ্ধার করতেই দেহ ধারণ করে আসা।···মত্ত ভক্তবীরের আর একদিনকার আকুলতা,—দাও বর ভগবান—সেবা করব—একটি প্রার্থনা—ছেলে হয়ে আসতে হবে···

সেবার অধিকার তিনি পেয়েছিলেন,—শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর একটি ছেলে হয় ; মাত্র চার বছর সে ছেলেটি বেঁচে ছিল, ভক্তবীরও তাকে শ্রীঠাকুরের মতই পরম সেবা যত্নে ভরিয়ে রাখেন। ভক্তবীর গিরীশ কখন মার দিকে তাকাতেন না। পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসের ভক্ত বলতেন,—এ পাপচক্ষে মাকে দেখব না। তাঁর গৃহটী ছিল বলরাম মন্দিরের কাছে। হঠাৎ একদিন ছাদে আছেন, শুনলেন, শ্রীমা বলরাম মন্দিরের ছাদে আছেন দাঁড়িয়ে, ত্রস্তে ঘোষজা চোখে কাপড় দিয়ে নীচে নেমে আসেন পাছে মার দিকে পড়ে দৃষ্টি! তাঁর সেই ছেলেটিই কিন্তু একদিন নটসম্রাটকে মার কাছে জোর করে নিয়ে যায় হাতে ধরে—অশ্রুল কণ্ঠে তিনি যতই বলেন,—ওরে মার কাছে আমি যাব না—আমি মহাপাপী—সে ততই জোর করে হাত ধরে টানে। শেষে জোর করে উপর তলায় সেই দেবশিশুই নিয়ে যায় ভক্তবীরকে—অনেক দিনের অভিমানের অন্তে ঘোষজা বলেন,—এই ছেলে থেকেই মা তোমায় পেলুম। মা তখন বাগবাজারে।

শ্রীঠাকুর তখন কাশীপুরে···দ্বাপরে ভক্তের অভিশাপ মাথায় কুড়িয়ে আরক্ত শ্রীপাদপদ্মে গ্রহণ করেছেন ব্যাধের শর···আর এ যুগের

শত শত ভক্তের জন্ম জন্মান্তরের আর্তি নিজ অঙ্গে নিয়ে সেদিন ছিলেন শরশয্যায় নিষন্ন···

ইংরাজী বৎসরের শুভ উদ্বোধনের সে দিন—উদ্যান বাটীর হিরণ্ময় পথে দাঁড়িয়ে আছেন ভক্তবীর, সঙ্গে আছেন গৃহীভক্তেরা— প্রভুর প্রসঙ্গে প্রসন্ন করে তুলেছেন স্থানটি, পূর্বাশায় অনিমিখ দুই নয়ন রেখে—সহসা এসে দাঁড়ান নারায়ণ স্বয়ং—জয়ঘোষে আর জয়মন্ত্রে দিক যায় ভরে—তমসার নিবিড়তার মধ্যে শুকতারার মত শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে জাগে,—গিরীশ তুমি কি দেখেছ, যার জন্যে লোকের কাছে একে অবতার বলে বেড়াও? ভক্তবীর তখন রজরঞ্জিত প্রাঙ্গণে নিজেকে দিয়েছেন লুটিয়ে—শ্লথকণ্ঠে বলেন,—ব্যাস, বাল্মিকী, যাঁর কথা বলতে অক্ষম, তাঁর কথা আমি কি করে বলব?—সমাধির শিহর জাগে দেব তনুতে—ক্ষীণ চন্দ্রে জাগে বেদ-হাসি—কণ্ঠে জাগে দেব-বাণী—তোমার চৈতন্য হোক···পৌষের হিমস্নিগ্ধ সেই অরুণোচ্ছল প্রভাতে ভারতের তথা জগতের ভালে কি লিখন লিখে দিয়েছিল তা স্বয়ং বিধাতাই জানেন—তবে সেদিন দিব্য আবেগের দিব্য অনুভূতি—সমবেত সকলের জীবনেই এনে দিয়েছিল এক নব-প্রভাতের সূচনা--এক নব মুক্তিতীর্থ···

কাশীপুর উদ্যানবাটী

তেত্রিশ
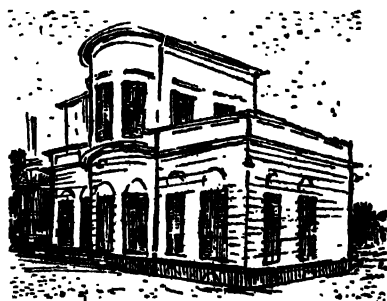
পতিতোদ্ধারিণী সুরতরঙ্গিণী সেদিন ফেনিলোচ্ছল আনন্দচঞ্চল—দিনান্তের শান্ত শোভায় স্পন্দমান—স্তব্ধ দুই তীরে শ্যাম-তমালের রেখা যেন নিথরিত দৃষ্টিতে আছে চেয়ে। গঙ্গার তীরে ধীরে ধীরে ভেসে চলা একটি তরণীতে যুগসন্ধানী দুটি প্রেম কজ্জলিত আঁখিতে যেন কিসের উৎকণ্ঠা—সহসা সেই আকুল দিঠিতে উছলে ওঠে আনন্দ শিহর—যেন চিরচেনা আপনজনের মিলেছে সন্ধান! গঙ্গার গহিনকূলে কামারহাটির এক উদ্যানবাটীর জীর্ণ বাতায়নে দেখা যায় আপনহারা ভাববিহ্বল দুটি আকুল নয়ন—একি আকর্ষণ না শক্তি সঞ্চার···মনে পড়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা—রামকেলীর পদধূলি অরুণচরণে রঞ্জিত করে চলেছেন হরিনামের বন্যায়—আর সঙ্গে চলেছেন সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদবৃন্দ—কীর্তনকলয়িত দিকচক্রবাল হয়েছে পুলকাকুল—সহসা সুরধুনী সচকিত করে ফুকারিয়া ওঠেন,—নরোত্তম, নরোত্তম—মৌনমুখে সকলে চেয়ে থাকেন শ্রীপ্রভুর মুখচন্দ্রে—এ লীলার সন্ধান যায় না পাওয়া···দীর্ঘ দিন পড়ে নরোত্তম আত্মপ্রকাশ করলেন, তখনই এই রহস্যের হয় সমাধান—এই আকর্ষণ, এই আহ্বান কার অবতরণ সঙ্কেত··· আর মনে পড়ে বৃন্দাবন লীলায় মালিনীকে; বৃন্দাবনের আনন্দসুন্দরকে ফল দেওয়ার ছলে মাতৃ-হৃদয়ের আকুল আকুতি- লীলার পুনরাবৃত্তিতে সেই গোপালের মার আবার এই লীলার স্বর্গে নেমে আসা—আর নন্দপুরচন্দ্রকে আবার চন্দ্রা-চিতনন্দনরূপে খুঁজে পাওয়ার এই সূত্রপাত·· ভগবানের যদি অবতীর্ণ হওয়া সত্য, তবে তাঁর লীলাসঙ্গীদের অবতরণের প্রয়োজন আছে, নইলে লীলা যে পুষ্ট হয় না। গোপালের মার পূর্বনাম অঘোরমণি। গুরু পুরোহিত বংশে তাঁর জন্ম—পিতা নীলমাধব, কামারহাটির গোবিন্দ দত্তের কুল পুরোহিত ছিলেন। বালবিধবা গোপালের মার নিষ্ঠা বিষম, শুচিবাই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

দক্ষিণেশ্বরের সে এক মঙ্গলময় দিন। প্রহরাধিক হয়ে গেছে অতীত—সহসা অঘোরমণির কণ্ঠে সচকিত হয়ে সকলে ছুটে এসে দেখে গোপালের

মা স্তম্ভিত হয়ে আছেন দাঁড়িয়ে—শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ রহস্যে আরক্তিম...... জানা গেল পরিবেশন মুখে শ্রীঠাকুর হঠাৎ গোপালের মার ভাতের কাঠিটি ফেলেছেন অশুচি করে—শুচি করার গোপন ছলেই। সেদিনের সে অন্ন গোপালের মার কোন প্রয়োজনেই লাগেনি—এমন কি রন্ধনের কাঠিটিও গঙ্গাগর্ভে পেয়েছিল স্থান।

রাত্রির গহিনে ডুবে আছে সুপ্তির ধরণী, মর্ম্মরিত উপকূল—গঙ্গায় ঈষৎ কম্পিত ঊর্মিতে এক অব্যক্ত ছন্দহিল্লোল—ছায়া আর আলোয় এক অপূর্ব মায়ালোক করেছে রচনা—রাত্রির তখন শেষ যাম, গঙ্গার প্রত্যন্তশায়ী প্রায়ান্ধকার গৃহে গোপালের মা জপ-নিবিষ্টা—সহসা ধ্যাননিষন্ন নেত্রে জাগে এক অপরূপ বিলাস—নব-নীরদ-দলিত-কান্তি বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত এক বাল-গোপালের মূর্তি—প্রেমস্ফুরিত নীল নয়নে চপল হাসি উচ্ছলিত—আকুল প্রসারিত দক্ষিণ মুঠিতে দ্যুলোকের অমিয়া...অশ্রুসরস পুলকাকুল এক চীৎকারে অন্ধকার যেন সচকিত হয়ে উঠে—বহুবাঞ্ছিত বহুবঞ্চিত গোপন ধনকে বুকে ধরে উন্মত্ত হৃদয় যেন জুড়াতে গিয়ে অসীম আকুতিতে যায় হারিয়ে—আনন্দ সুন্দরের লীলা তখন স্ফুরিত..গোপালের মার কোলে উঠেই ধরে খাবারের বায়না—ক্ষীর, সর, ননী—এসব চাই...

উছলিত অশ্রুতে দুকূল-হারা মন যেন কোন বাধাই মানতে চায় না—নিজের দুঃখ দুর্দশার কথায় কেবলি অশান্ত ধারায় ঝরে পড়ে বেদন নিবেদন—বলে,—বাবা অক্ষম দুঃখী, অনাথ—কোথায় ওসব পাব. রাজ্য-সাম্রাজ্য ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় দুর্য্যোধনের পরমান্ন ফেলে বিদুরের ক্ষুদে, সুদামার শুখানো চিঁড়ায় যাঁর পরমানন্দ—পুরীর সিংহদ্বারে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে পুলকমুগ্ধ করতে পর্য্যুষিত অন্নে যাঁর প্রসাদ দৃষ্টি, তাঁর কেন দীন জননীর ব্যথা অসহ করতে দুরন্ত এ প্রার্থনা কে জানে.. অক্ষম অনিচ্ছায় গৃহ সঞ্চিত সামান্য নাড়ু এনে দেন অবোধ ছেলেকে শান্ত করতে।

দুরন্ত ছেলে খাবার বায়না অন্তে সুরু করে তার খেয়াল খুসীর খেলা—মালা নেয় কেড়ে, কখন কাঁধে, কখন কোলে চাপে, কখন চুলে ধরে, কান্না-হাসির মুক্তো পান্না ছড়িয়ে আকুল করে তোলে মার চিরতৃষিত ক্ষুধিত প্রাণ—চির অভ্যস্ত জপ সেদিন আর অজপা রয় না—আনন্দ দুলালকে

পেয়ে বৈধী জপের বাধা সেদিন কোথায় যেন যায় ভেসে—সেদিন বিধি বন্ধনের অন্ধকারে নেমে এসেছে লীলার অরুণাভিসার…গৃহ কোণে বালারুণের মত দাঁড়িয়েছেন বালগোপাল—তাঁর চরণ থমকে জীবনের সব অন্ধকারই যে আলোয় আলোয় আলো হয়ে যায়—

বালগোপাল

চৌত্রিশ

লীলার স্বর্গে সেদিন প্রথম অরুণোদয়—অনুরাগের অরুণোদয়—কুড়িয়ে পাওয়া সাতরাজার ধন এক মাণিক,—এই পরম পাওয়ায় মানুষ হয়ে যায় পাগল,—সর্বহারা শৈল-সানুতে যেন দুকূল উছলে নেমে আসে পরম আনন্দের ঢল। ব্যথাহত মরণ মলিন দীর্ণ এই জীবন, প্রেমের মণি-প্রভায় হয়ে যায় বিভোর···চুপে চুপে, ক্ষণগণা দীর্ঘ রজনীর বুকে চেয়ে থাকা দুই অতন্দ্র নয়নে যখন নেমে আসে অমৃতের পুলক, তখন কি যে হয়—আর কি বা রয়—তার বর্ণনা লেখনীর কলঙ্কে কখন বিমলিন হয়নি—প্রেমের অলকায় সে অমরলিপি চিরনন্দিত। মর্ত্তের সঙ্গে অমর্ত্তের চিরমিলনের এ বার্ত্তা বহুবাঞ্ছিত স্বপনের মতই থাকে জেগে···যুগ যুগ সঞ্চিত এ পরম ধন মানবের ভাগ্যে ক্বচিৎ আসে - বিশেষ এই মোহমলিন যুগে—

রায় রামানন্দ সেদিন পুণ্যতোয়া গোদাবরী তীরে নবহেমকান্তি-কান্ত গোরা রূপের পেয়েছেন দর্শন—সেদিনটি প্রেম-ব্রজের এক পরম দিন—প্রেমাভক্তির মন্দাকিনী ধারায় সেদিন রোমাঞ্চ জেগেছিল ধরণীর বুকে; একে একে সাধ্যকথা ভক্তশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ মুখে প্রভু শুনেন আর ভগীরথের মত প্রেমগঙ্গাকে উজানমুখে চলেন বইয়ে—

প্রভু কহে এহো হয় —আগে কহ আর
রায় কহে অবশ্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ সার।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥

এই বাৎসল্য প্রেম পঞ্চরসের চতুর্থ পর্যায়ে—পরম ভাগবত নারদের কথায় এই ভক্তি, পরম প্রেমরূপা, যার স্পর্শে ধরণী অমৃতায়িত হয়—মানুষ তৃপ্ত হয়—উন্মত্ত হয়—স্তব্ধ হয়! সেই প্রেম অনির্বচনীয়া - আর মূকাস্বাদেই এর পরম প্রকাশ—আবার ভক্তের কথা বলতে গিয়ে উচ্ছলিত হয়ে বলেছেন —একান্ত অভ্যন্তরচারী এই ভক্তের মহিমা অবরুদ্ধ কণ্ঠে অশ্রুরোমাঞ্চিত

পুলকে, ভক্ত, ভগবানের মহিমায় হন আপনহারা। তাঁদের স্পর্শে ধরণী পবিত্র, কুল পবিত্র, আর তীর্থ সুতীর্থ, কর্ম সুকর্ম হয়--শাস্ত্র পুণ্যতর হয়। আর যুগপাবন--এই ভক্তেরা যুগে যুগে ভগবানেরই আপনজন—তাই কুরু-যুদ্ধের সর্ব কোলাহল মথিত ভগবানের পরম আশ্বাসের বাণী,—আমার ভক্তের বিনাশ নাই।

শিশুসুন্দর সেদিন লীলারসে গোপালের মাকে করে তুলেছে আকুল —চঞ্চল শিশু খেয়াল খুসীর খেলায় তখনি কোলে ওঠে—তখনি কাঁধে চেপে বসে—তখনি ছুটে বাইরে যায়। সহসা গোপালকে বুকে জড়িয়ে গোপালের মার জাগে এক অপূর্ব আবেগ…দক্ষিণেশ্বরের আবছা হাতছানিতে বুঝি জেগেছে ছন্দ—দূরাগত বাঁশরীতে যেমন বৃন্দারণ্যে জেগেছিল ভরাচাঁদের আকুতি…বুক নিঙড়ান আঁধারের আছে চুপি চুপি ডাক, আলোর আকুতি আছে—আবার আঁধারের আবেদন যেন বেশী…বেড়িয়ে পড়েন মা আর ছেলে—ছেলে ধরেছে মাকে জড়িয়ে তার কোমল ভুজ-বল্লরী দিয়ে, আর বৃদ্ধা অপটু হাতে আঁকড়ে নিয়েছে পরম পাওয়া, অনেক চাওয়ার ধনকে…ব্যথিয়ে জমা অশ্রু যখন ঝরে পড়ে আনন্দ শিহরের তপ্ত স্পর্শে, তখন চোখের কোণে চেপে রাখাই যে তার পরম সার্থকতা—সভায় শোভার রতন সে তো কোন দিনই নয়।

ছুটে চলে আপনহারা বেগে কামারহাটির পথ রেখা বেয়ে—কখন বুকে চেপে ধরে চপল গোপালকে—কখন মুখখানি তুলে, চুমায় চুমায় করে তোলে আকুল কমল কোমল কপোল। লোকে দেখে এক বৃদ্ধা উন্মাদের মত চলেছে, ভোরের আলোর মত—হুঁসহারা— দিশাহারা…লুটিয়ে পড়া আঁচল যেন মুছে চলেছে পিছনের সব চিহ্ন—বেদনার পুরাতন সব পরিচয়।

সেদিন দখিণাপুরীতে সানাইএর সুরে জেগেছে ভৈরবীর এক নূতন রূপ…শিশুর থমক ভাঙ্গা ছায়ার মত জাগে যে ছন্দ, অফুট ফোটা কুঁড়ির বুকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছায়ার মত জাগে যে আলাপ, মলয়ানিলে ভরা চাঁদের বুকে জাগে যে হিল্লোল—

দখিণাপুরী আলো করে সেদিন বসে আছেন দখিণাপুরচন্দ্র—

প্রতীক্ষারত। নয়ন ভঙ্গে, দেহছন্দে জেগেছে এক অপরূপ নব সুষমার সঙ্গীত—যেন বৃন্দাবনের পূর্বগোষ্ঠ—

বসন পহিরণ আন
আলথাল কেশ নাহি লেশ-সান॥

দক্ষিণ দুয়ারে সহসা ডাক পড়ল,—গোপাল—গোপাল.. বিশ্বের মাতৃ হৃদয় নিঙড়ান এ ডাক যেন দুয়ারে দুয়ারে কর হেনে যায়—ডেকে যায় সর্বহারা প্রাণ, বিশ্বের প্রাণপুরে শিহর জাগে—শিহর জাগে সন্তানহীন সব প্রাণে—শিহরিত হয় সুরধুনীর শান্তনীর· শিউরে ওঠে সদ্যজাগা পিউ পাপিয়ার দল...আর আমাদের গদাধর সুন্দরের দেহ ছন্দে জাগে বাল-গোপালের সোহাগকাড়া নয়ন ভঙ্গ... ।

অবশে এসেই বসে পড়েন গোপালের মা·—আর গোপাল বেশে শ্রীঠাকুরের লীলার সাগর ওঠে ফেনিয়ে···যুগে যুগে জাগা সে লীলার সাগর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ভক্তকে—আর তার সঙ্গে ভগবানও গেছেন ভেসে—হাসি অশ্রুর মোহনায়···

এমনি করেই শ্রীভগবানের জন্যে সব হারিয়ে ভেসে গেছেন মেবারের রাজরাণী মীরা—এমনি দুকূলহারা ভক্তিতে ভেসে গেছেন রাজপুরোহিতের কন্যা, দেবী করমা···যাঁর প্রীতির নিবেদত অন্নের অপেক্ষায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ বল্লভ ভোগ গ্রহণে হয়েছেন বিরত—এমনি করেই ম্যাক্সিমিনিয়ার সম্রাটকে ঈশ্বরবিশ্বাসী করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন বলি, এলেকজান্দ্রিয়ার দেব-কুমারী ক্যাথারিন্—সেই স্রোতেই সম্রাট কনষ্টানটাইনের মহিষী, দেবী হেলেনা হয়েছেন জেরুজালেমের দীন-তীর্থচারিণী···

পঁয়ত্রিশ

শ্রীঠাকুর বলতেন,—অনুরাগের বন্যা যখন আসে তখন সব একাকায় হয়ে যায়—যখন মাঠে এক বাঁশ জল উঠে পড়ে তখন আর আলপথে ঘুরে যেতে হয় না...প্রথম অনুরাগে সব সমান বোধ হয়—প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলো ওড়ে তখন আমগাছ, তেঁতুল গাছ সব এক বোধ হয়...।

এতদিন গোপালের মার ছিল জপধ্যানের বিধিবাদের উপল পথ বেয়ে সাবধানে চলা—এতদিন পাখার প্রয়োজন ছিল হাওয়ার প্রয়োজনে—এখন বইতে সুরু করেছে কৃপার দখিণা—এখন শুধু পাল তুলে দেওয়ার প্রশান্তি—

আসার পথে থাকে দ্বিধাদ্বন্দ্বের আকুলতা, থাকে আশা-নিরাশার ভয় বিহ্বলতা, আর ফেরার পথে থাকে শান্তির আনন্দ—প্রাপ্তির নিবিড়তা—আসার পথ ভিজিয়ে দেয় শিশুর ক্রন্দন আর যাবার পথরেখায় ছড়িয়ে পড়ে প্রসন্ন হাসির শুচি শুভ্র ছন্দ...তবে মাধবের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই, না হলে আসা যাওয়ার কূলে থাকে শুধুই দুকূল ভাঙ্গা অশ্রু।

গোপালের মা ফিরে চলে কামারহাটির কুটীরে—বুকভরা প্রসন্নতা কুড়িয়ে পথধূলি হয়ে উঠে অনুরাগের রঙে রাঙ্গা অকালে হোলির রঙে রাঙা হয়ে ওঠে ধরা ব্রজ,—ফাল্গুনের রাঙাদিন; সঙ্গে আছেন প্রেমার্ত্ত প্রাণের মূর্ত্ত বিগ্রহ বালগোপাল—মেঘ-কজ্জলিত দুই নয়নে চপল হাসি চাপা, গোলাপের সুবাস নিঙড়ান দুই চরণ, অঙ্গে নব বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত-অমৃতায়িত করে চলেছেন ভক্ত হিয়া...

মনের আগোচরেই আমাদের আকুল প্রশ্ন জাগে...জীবনের ক্ষণ অবসরে কেন এমন হয় না—কেন চলার পথে এমন দেখা পাই না—সব ব্যথা, সব ক্ষুধা মেটাবার এই তো পথ—কৃপার তো হেতু নাই—সেই অরূপ রূপে সেই মানস-হরণ হাসিতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালে এত কি পাষাণ হিয়া যে সে-রূপে গলবে না—ভুলে যাবে না সব বন্ধন, সব ক্রন্দন, ধরার সব কিছু? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই রহস্য ছলে দিয়েছেন,—সে মিটিংএ আমি ছিলাম না। অবশ্য ভক্ত কেদারের মুখের কথা নিয়েই

বলেছেন একথা—ছলনাময়ের আবার মার চরণে এ প্রার্থনাও আছে,—মা একবার করে দেখা দিস্. না হলে কি নিয়ে থাকবে। এ-প্রশ্ন আমাদেরই মুখের প্রশ্ন—এ অভিযোগ আমাদেরই প্রাণের অভিযোগ—দেবতার মুখে এ শুধু ঠাকুরালী—ভক্ত যখন ছুঁচ হন, ভগবান হন চুম্বক, ভগবান চুম্বক হলে ভক্ত হন ছুঁচ—ভক্ত যখন ভাব-সাগরে দেয ডুব, ভগবান তখন তাকে নিয়ে যান ভাসিয়ে—আর ভক্ত যখন ভাসতে চায়, ভগবান দেন ডুবিয়ে—

কামারহাটিতে এদিকে স্বরু হয়ে গেছে গোপালের লীলাঞ্চন; নূপুরিত চরণে জেগে উঠেছে বসন্তের বন জ্যোৎস্না, শুষ্ক বৃন্তে নবপত্রালির লাস্য—গোপালের মা যতই তাঁর এতদিনের ধ্যান জপে মন দিতে চান অভ্যাস বশে, ততই গোপাল দেয় বাধা—মালা নেয় কেড়ে—ধ্যান-গম্ভীরতা অজস্র-চুম্বনে যায় হারিয়ে—শুতে গিয়ে আবদার জুড়ে চেয়ে বসে বালিশ, শুকনো নাড়ু দিলে মুখ নেয় সরিয়ে—খেতে খেতে দেয় খাইয়ে; বৃদ্ধার- এতদিনের শান্তি আজ অশান্তির আনন্দে হয় দুকূলহারা। জপে-ধ্যানে, খাওয়া-শোওয়ার কোন বাঁধনই যেন সেই বাঁধনহারা চায় না রাখতে; বহু সাধনার ধনকে পাওয়া যেমন দুরূহ, তার তালে তাল রাখা তারো চেয়ে কঠিন—গোপালের সঙ্গে কামারহাটির বামণীর জীবন্তে, জাগ্রতে এমনি লীলা চলে দুইমাস ধরে—এই দিব্য লীলার অতন্দ্রে নিরন্ধ্রে দীর্ঘদিন থাকা অসম্ভব—তাই লীলাতে নেমে আসে ছেদ—শ্রীঠাকুরের আদেশে তিনি তাঁর জপের মালা ইত্যাদি গঙ্গায় দেন ফেলে নিশ্চিন্তে নির্দ্বন্দ্বে। নারায়ণের লীলার স্রোত স্তিমিত হয়ে এলেও দর্শনাদি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ভক্তি মন্দাকিনী নিত্য স্রোতময়ী—মরুপথে পথহারা সে-ত হবার নয়।

লীলা থেকে নিত্য আবার নিত্য থেকে লীলা—এই সঞ্চরণ, ভাব-সাগরের মহামীনের সঞ্চরণ ক্ষণে সপ্তলোকে লোকাতীত হয়ে যাওয়া, ক্ষণে লোক-ললাম লীলা-স্ফুর্তিতে ভক্ত সঙ্গে বিহার করা, হাস্য-লাস্য—লীলার লহরে দুকূল ঘন হয়ে আসে। আবার স্রষ্টা সাক্ষীরূপ, আচার্য গুরুরূপও ছিল চিরজাগ্রত—চির সহজ—

সেদিন নৌকাবিহারে আসছেন দখিণাপুরের লীলার হাটে—শ্রীজগন্নাথের পুনর্যাত্রা উৎসব হয়ে গেছে সাঙ্গ—ভক্ত সঙ্গে চলেছেন ভক্তের ভাব বিগ্রহ

শ্রীঠাকুর—সুরধুনীর শান্ত শোভা করে তুলেছেন আনন্দ মেদুর—ভক্ত সঙ্গে ভক্ত সখা লীলা রসময় সহসা হয়ে পড়েন রুদ্রগম্ভীর—গোপালের মাকে ক্ষণনয়ন ভঙ্গেও দেন না ধরা—সুরভি সন্তপ্ত বসন্তানিল সহসা হয়ে যায় নিথর, সঙ্গীত মুখর উৎসবময়ী রজনী যেন হয়ে পড়ে দিশাহারা—শ্রীঠাকুরের মৌনমন্থর ভাবে সকলেই হয়ে পড়ে অস্থির; শ্রীঠাকুরের দিকে সকলেরই প্রশ্ন দৃষ্টি—দেখা যায় শ্রীঠাকুরের দৃষ্টি বার বার ফিরে আসে একটি পুটলীতে আহত হয়ে—জানা গেল গোপালের মার পুটলি—ভক্ত বন্ধু পরিবারের দানে সমৃদ্ধ এই পুটলি—সাধুর সঞ্চয় নিষেধ—তাই ত্যাগীর রাজার এই ভাব বৈলক্ষণ—মৌনকথার এ শিক্ষা গোপালের মা ভোলেননি সারা জীবনেও।

হালদার পুকুর

ছত্রিশ

আষাঢ়ের বর্ষণ প্রত্যাসন্ন দিন—শ্রীঠাকুর বলেছেন,—কামারহাটির বামণী কত কি দেখে, একলাটি নদীর ধারে! একটী বাগানে নির্জন ঘরে থাকে—আর জপ করে। গোপাল কাছে শোয়—শিহর লাগে দেব দেহে লীলার অনুস্মরণে… ফিরে বুঝি আসে সেই সব দিন, রামলালা বিগ্রহ নিয়ে দেবতায় ঠাকুরালী… দেখে গোপালের রাঙা রাঙা হাত—সঙ্গে বেড়ায়—কথা কয়!

পরপারের কথা মানুষের কাছে চির অবগাহ গহিন—পরলোকের সন্ধানে মানুষ যুগে যুগেই সন্ধানী। আমাদের ষড়দর্শনের ত কথাই নাই—গ্রীক দার্শনিক প্লেটো থেকে আরম্ভ করে আধুনিক দর্শনও পরলোকের এই বধির যবনিকা সরিয়ে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে কেবলই দেখতে চায়—কি আছে সেই রহস্য লোকে—সেই ছায়ার রাজ্যের কথা সব যুগেই মানুষের চিত্তকে করে তুলেছে উৎকণ্ঠিত—উদ্বেগ মথিত।

নীড় বিরহী মানুষ আজ পরকালের সুখ-সুবিধার কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই মরণ সন্ধানে ব্যস্ত। তাই মার্কিন দেশে প্রেততত্ত্বের এত অনুশীলন। যদিও আত্মাকে হারিয়ে পাশ্চাত্য আজ অমর অনাত্মাতে (বায়োলজিক্যাল্ ইম্‌মর্ট্যালিটি) আশ্রয় নিয়েছে।

কামারহাটীতে সেদিন অলসমন্থর মধ্যাহ্ন—তন্দ্রা গহিন চোখে নেমেছে ক্লান্তির ছায়া—শ্রীঠাকুর শয়ন-নিষন্ন—পাশে মানসপুত্র রাখাল মহারাজ—শ্রীঠাকুরের আহারাদি হয়ে গেছে সারা। সহসা অতন্দ্র দিশারীর দৃষ্টি পথে এসে দাঁড়াল দুই প্রেত—নরকের সব বীভৎসতার মূর্তরূপ—জানায় তাদের দুর্দশা—তাদের অশান্তি.. আলোর প্রকাশ যেমন আঁধারে পায় না থই—কুসুমিত বনজ্যোৎস্না মৎসগন্ধারমণীর চোখের ঘুম নেয় কেড়ে, তেমনি নরকের অধিবাসীদের অসহ হয়ে পড়ে স্বর্গের মহিমা—তারা মিনতি জানায় শ্রীঠাকুরের অদর্শনের—শ্রীঠাকুরও তাদের কল্যাণ মানসে ফিরে আসেন জগদম্বার খাস তালুকে—শ্রীদক্ষিণেশ্বরে। কামারহাটীতে শ্রীঠাকুরের এই আসা গোপালের মার আকুল আহ্বানেই।

পরে একদিন প্রশ্ন প্রসঙ্গে জাগে এই দুই প্রেতপুরুষের ভবিষ্যতের কথা—শ্রীমা এর উত্তরে জানান তাদের মুক্তির বাণী—শ্রীঠাকুরের দর্শন অমোঘ—ভগবদ্দর্শনের পর আর কোন অশুভ সংস্কার থাকতে পারে না...অবতার, যিনি তারণ করতে আসেন—এটি শ্রীঠাকুরেরই মুখের কথা—তাই ভোগক্ষেত্র পরলোক আজ মুক্তিক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে···তাঁরই কৃপায়।

পরম ভাগবৎ নারদের জীবন-বেদে ব্রহ্মানন্দের মধ্যে কলহানন্দেরও একটি স্থান ছিল। শ্রীঠাকুর বলেছেন ঈশ্বর বালকস্বভাব; তাই তাঁর ভক্তদের মধ্যেও এসে যায় বালখিল্য রূপ। শ্রীঠাকুরের লীলাঙ্গনেও দেখি মতবৈষম্যের লঘু পরিবেশের সৃষ্টি করা—স্বামিজীর সঙ্গে নাগমহাশয়ের, গিরীশবাবুর সঙ্গে স্বামিজীর প্রীতির বিসম্বাদ ছড়ান রয়েছে—কথামৃতের পাতায় পাতায়।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরের ভক্তমেলায় এসেছেন শিবাবতার স্বামিজী আর আমাদের গোপালের মা। শ্রীঠাকুরের রঙ্গ ওঠে উথলে··লীলার একদিকে বেদান্ত তত্ত্বের নরেন্দ্রনাথ, এযুগের সব্যসাচী—জ্ঞানে, ধ্যানে সহস্রদল কমল—আর একদিকে দীন হীন নামের কাঙ্গাল কৃপাধন্য গোপালের মা—একদিকে নরেন্দ্রনাথের বিচারের ক্ষুরধার, আর অন্যদিকে সরল গোপালের মার প্রেমার্ত্ত অশ্রুল বিশ্বাস। সবাই ভাবে জয় পরাজয়ের কথা—শেষে প্রেমার্দ্র প্রাণেরই হয় জয়—বাঁধভাঙ্গা অশ্রুর অভিষেকে জ্ঞান পড়ে থাকে বাইরে।

দেহকে শাস্ত্রে রথ বলেছে—আত্মা তার রথী··আবার বিরাট সৃষ্টিও যে তাঁর চিরাঞ্চনের জয় রথ...তাঁরই অধিষ্ঠান, আরাধনার স্থান...চিরচলার-ছন্দে, চির অর্চনার আনন্দে এই জয়রথের নিত্য যাত্রা—শিশু নীহারিকার মত নিরুদ্দেশের পথে চিরচঞ্চলিত—চির অনর্গলিত এর গতি—অণুর মাঝেও যিনি—বিরাটেও সেই তিনি···চলার মাঝে অচল··ধরাতে অধরা—আমাদের গদাধর গোপাল...

মাহেশে জগন্নাথের জয়রথ ঘর্ঘরিত গতিতে চলেছে। রথযাত্রা লোকারণ্য—বাঁশীতে আর শিশুর হাসিতে উৎসব মুখরিত—মুহূর্তে যেন দেবতার ক্ষণা-ভিসারে নেমে এসেছে অমর্তের মহিমা...লীলাও যে নিত্য...

গোপালের মার নয়নপল্লব থেকে সরে যায় মোহাঞ্জন...সহসা উচকিত চীৎকারের উন্মত্ত উদ্দামে দেখেন জলে, স্থলে, গগনে, ভুবনে অন্তরে, বাহিরে দেবতা—প্রাণময়—মনোময়—সর্বময়.. তাঁর নিজের কথা,—সেদিন আমি আর আমাতে ছিলুমনা—নেচে গেয়ে কুরুক্ষেত্র করেছিলাম...মনে আসে খৃষ্টভক্ত সল্ চলেছেন দামাস্কাসের পথে—সহসা ভগবৎ জ্যোতি-সাগরে দিশাহারা হয়েই ত পেয়েছেন দিশা।
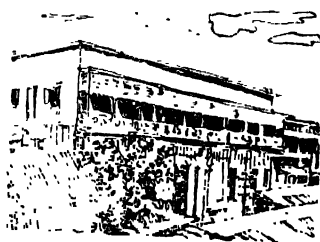
বলরাম বাবুর বাড়ী

সাঁইত্রিশ

লীলাও নিত্য...তাই শ্রীঠাকুরের অদর্শনেও গোপালের মার সঙ্গে গোপাল গদাধরের নিত্যলীলার হয় না ছেদ...সেদিন সিমলা নরেন্দ্রভবনে বসেছে ভক্তের মিলনমেলা—গোপালের মা সহসা এসে উপস্থিত। সকলে করে বসে গোপালের মার কাছে কিছু প্রশ্ন। বৃদ্ধা তখন গোপালের কাছে জানায় ভক্তদের আকুতি চিন্ময় চপল কি সে কথা কানে নেয় গৃহ থেকে গৃহান্তরে সে চলে ছুটে--নূপুরিত চরণে ছন্দ তুলে, কোন কথা কানেই যায়নি যেন। তখন গোপালের উদ্দেশ্যে নানা অভিযোগে লীলামুখর হয়ে ওঠে সে স্থল। শেষে যেন গৃহান্তরে কা'কে হঠাৎ ফেলেন ধরে—আর তার সঙ্গে ক্ষুব্ধ অনুযোগে বলেন,—আমায় কি এমনি দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় রে? এরপর একটি মিঠে চুমায় শিশুসুন্দরের সেদিনের লীলাছন্দ হয় শেষ।...তাইত শুনি দেবর্ষির মুখে—

তুলসী দলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীনীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্য ভক্তবৎসলঃ॥

তিনি যে নিজেকে বিকিয়ে দিতেই বসে আছেন।

মনস্বিনী নিবেদিতা কিন্তু চিনেছিলেন এই সহজ দিব্য-জীবন—তাই তিনি গোপালের মার অসুস্থতায় তাঁকে নিজের কাছে এনে রাখেন আর সেবা-সম্পদে তাঁর শেষের দিনগুলি করে রাখেন প্রসাদ প্রসন্ন...মহৎ দেখে কাঁদতে পারাই ত ধন্য কাঁদা।.

সেদিনও আষাঢ়ের পূর্বাশায় আলোর জোয়ার রচনা করেছে ইহপরকালের অমৃত-সেতু—শিশুসুন্দরের, চির-সুন্দরের—অমলিন হাসিই যেন ফুটে উঠেছিল সেই সমাপ্তি উষায়—এমনি এক বর্ষণমুখর দিনে বাসুদেবময় হয়ে উঠেছিল তার অমৃতায়িত জীবন আর তেমনি বর্ষাসন্ন দিনেই হল তার পরিনির্বাণ—কালের নেমি আবর্তনে মহাশূন্যে রাখে না কোন পদ-চিহ্ন কিন্তু স্মৃতির সুরভি রয়ে যায় চির অম্লান। লীলার সূর্য সেদিন অস্তাচলচুম্বী—কৃপাসিদ্ধ গোগালের মা শুয়েছেন গঙ্গায় অর্ধ-নিমর্জনে—কীর্তনের রোল

অশ্রুল হয়ে উঠেছে গঙ্গার ক্ষুব্ধ বুকে—নগ্নপায়ে, অশ্রুমুখে কাছে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা—অমর আত্মা সেদিন রামকৃষ্ণ-লোকের অমৃত পথযাত্রী…

একদিন গোপাঙ্গনাদের আর্তি জেগেছিল ব্রজবনে—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়তঃ ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।

হে প্রিয় তোমার জন্মে ব্রজধাম নন্দিত.. আজ বিংশ-শতাব্দীও শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর একাদশজন পার্ষদের জন্মে সত্যই ধন্য…

ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ নিত্য। পাশ্চাত্যের মনস্বী হোয়াইট্ হেড্ বলেন, —ভগবান যেমন ভক্তকে সৃষ্টি করেছেন, ভক্তও তেমনি ভগবানকে করেছে সৃষ্টি।

শ্রীঠাকুরের সঙ্গে সেদিন ঋষি দেবেন্দ্রনাথের দিব্যকথায় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হয়েছে সৃষ্টি…শ্রীঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলেন,—এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে—এক একটি ঝাড়ের দীপ। এ জগৎ কে জানতো? . ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য; ঝাড়ের আলো না হলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।… যুগে যুগে তিনি এসেছেন বেথেল্‌হেমে পিটার প্রমুখ দ্বাদশ দীনার্তদের নিয়ে…এসেছেন নৈরঞ্জনার কূলে ধর্মচক্র প্রবর্তনে পাঁচজন নামগোত্রহীন তপস্বীর সঙ্গে—আবার এলেন সুরধুনীর পশ্চিমকূল আলো করা গোরারূপে, আর সঙ্গে এলেন—শ্রীপাদ, শ্রীবাস এঁরা সব…গঙ্গার পূর্বকূলে এবার এলেন এগারটি অফুট কুঁড়ির মিলনমাল্যে—বিরাটের গলায় আজও যা অম্লান হয়ে দোদুল। এঁদের চরণ চিহ্নেইত ধরণীতে রচনা হয় তীর্থবর্ত্ম…এঁদের লীলা সম্পুটেইত রচনা হয় কত রামায়ণ—মহাভারত—কথামৃত—কত না কাব্য কাহিনী—কত না অবদান কল্পলতা—চন্দ্রিম রাতির মোহমদির পরিবেশে, তারার ক্ষণপ্রভারও পরম প্রয়োজন…।

আটত্রিশ

ব্যথার বারাণসী কাশীপুর। গৌরীমা হয়তো কোন দিনই এখানে আসেননি। সে দৃশ্য ভক্তের যে অসহ্য। তবু সারদা-রামকৃষ্ণ লীলার অধ্যায়ে গৌরীমার অবদান সামান্য নয়। ঠাকুর সে'দিন দক্ষিণেশ্বরে লীলায় বলেন,—বলতো গৌরীদাসী তুই কাকে বড় বলিস। —মা ছিলেন পাশেই, রঙ্গছলে দেহে ছন্দ জাগিয়ে গৌরীমা বলেন—

রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী
লোকের বিপদ হ'লে ডাকে মধুসূদন ব'লে
তোমার বিপদ হ'লে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী ॥

শ্রীমা লজ্জায় সারা, হাত চেপে ধরেন গৌরীমার—শ্রীঠাকুরও ভক্তের কাছে হার মেনে যান চলে—শিবানীর দরজায়, শিব যে চিরদিনের ভিক্ষুক।

দক্ষিণেশ্বরের আর একটি মুক্তাঝরা দিন—মা নেমেছেন স্নান পুন্যোদক গঙ্গায়, উপরের সিঁড়িতে গৌরীমা। সহসা ত্রস্তে মা আসেন ছুটে—গৌরীমাকে ধরেন জড়িয়ে। মার যেন বড় ভয়। বলেন,—কুমীর গো—গৌরীমার রহস্য যেন মুখে জড়িয়েই থাকে বলেন,—কুমীর নয়, মকর বাহিনীকে দেখতে মকর এসেছিলেন।

শ্রীঠাকুরের মন নিত্যি থাকে উঁচু সুরে বাঁধা। তবু যেন ধূলার ধরণীকে পারেন না ছাড়তে। একদিন জগজ্জননী মেয়েদের দুঃখে আকুল হয়ে বলেন গৌরীমাকে,—দ্যাখ গৌরী, আমি জল ঢালি তুই কাদা চটকা—সাধারণ কাজের লোকদের নিয়ে এই উপমা—গৌরীমায়ের সব তাতেই রহস্য। তিনি বলেন,—এখানে কাদা কোথায় যে চটকাবো—শ্রীঠাকুর তখন সত্যিই জল ঢালছিলেন। বলেন,—আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি। এ দেশের মায়েদের বড় দুঃখ, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।

তখন গৌরীমা বলেন,—সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না। আমায় কয়েকটি মেয়ে দাও, হিমালয়ে তাদের মানুষ করে আনি।

শ্রীঠাকুর বলেন,—না গো না —এই টাউনে বসেই তোকে কাজ করতে হবে।

– কলকাতায় মেয়েদের আশ্রমের এর থেকেই সূচনা।

গৌরীমা প্রথম জীবনে ছিলেন মৃড়ানী—ভবানীপুর এঁদের আদিবাস। কালিঘাটের পূজায় এঁর বংশগত অধিকার ছিল বলেই বিবাহের অগ্রসূচীতেই ইনি গৃহত্যাগ করেন। শ্রীঠাকুরের দর্শন আর কৃপা অতি শৈশবেই পান। পরে গোমুখ থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রব্রজ্যা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কক্ষ্যচ্যুত তারার মত শিখাময়ী গৌরী মেয়ে।

নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে অগ্নিতুল্য তেজস্বিনী গৌরীমা নানা দিব্যদর্শনে ধন্য হয়েছেন। রাজস্থানে একবার কোন মন্দিরে দেখেন মন্দিরের মধ্যেই একটি সুঠামতনু কিশোর ভোজন রত। ভাবলেন হয়তো পূজারীদেরই কোন বালক। পরে দেখেন তিনিই আবার সিংহাসনে আসীন। মুহূর্ত্তে দৃষ্টি হয়ে যায় স্বচ্ছ। বুঝতে পারেন কে ইনি!

আবার যখন কেদার বদরীর পথে, তখন সহসা জনৈকা মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তির প্রকাশ। বলেন তিনি অতি আদরেই,– এ লালী তুম্ কিধার যাওগী—উত্তর শুনে অল্পসময়েই এক নিভৃত পথ ধরে তাঁকে মন্দির দ্বারে পৌঁছে দেন। স্থানীয় পাহাড়ী ছেলেরা শুনে হয় অবাক, এপথ দিয়ে যাওয়া আসা অসম্ভব বলেই তারা জানে।

এরপর আসে কর্ম্মময় জীবন। শ্রীঠাকুরের বাণী বহন করে প্রথম ব্যারাক-পুরে পরে কলকাতা, নবদ্বীপ আর গিরিডির শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধীরে ছায়া নেমে আসে—মহাযাত্রার দিন ছোট ছোট ছেলেরা জিজ্ঞেস করে দিদিমা কোথায় যাবে—সহজ উত্তর আসে, – রামকৃষ্ণলোক—ধূপের মত পূতকল্প জীবনের শেষে শ্রীঠাকুরের চরণ...রম্য চরণই এদের চরম পরিণতি।

উনচল্লিশ

ওরে এতদিনে আসতে হয়—আকুল উচ্ছাসে ভাষা হয়ে ওঠে উত্তরের উতল হাওয়া—আমার মুখ যে পুড়ে গেল, বিষয়ীদের সঙ্গে কথা কয়ে—ব্যথার মূর্চ্ছনায় জেগে ওঠে মর্তের মন্দাকিনী—যুক্ত করে বলেন ঠাকুর,—জানি ওগো সপ্তর্ষির-ঋষি তুমি নররূপী নারায়ণ—দীর্ঘ প্রতীক্ষারত—ত্রিযামা নিশান্তে আজ ধরণীর পরিত্রাণেই এসে দাঁড়িয়েছ পার্থের মতই দীপ্ত রূপে···বাইরে তখন দুরন্ত উত্তর বায়ুর উল্লাস হয়ে এসেছে স্তিমিত। অবিশ্বাসের উচ্ছাস যেন দখিণাপুরের পূর্বদুয়ারে থমকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ধরণীর পূর্বাশায় সেদিন নবজাগরণের দক্ষিণার প্রথম শিহর···

শীকরকণাবাহী উত্তর হাওয়া সেদিন উত্তরায়ণে যেন ক্ষণে ক্ষণে হয়ে উঠে উতলা। হিমশীতল হেমন্তের গঙ্গার থমক তরঙ্গ যেন কোন অনাগতের অগ্রছায়ে হয়ে উঠেছে রম্য··কোন চঞ্চল পান্থের পদসঞ্চারে দক্ষিণাপুরী হয়ে উঠেছে স্পন্দমান—এদিকে ধ্যান সুন্দরের সমস্ত দেহে যেন ক্ষণভিন্ন আকুলতায় জাগে শিহর; বহুদিন বঞ্চিত, যুগযুগ বাঞ্ছিত যেন কার আশায় উচকিত···মনে পড়ে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন মঙ্গল –

হেন বুঝি মোর চিতে লয় এই কথা
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে হেথা
পূর্বে মুঞি বলিয়াছো তোমা সভাস্থানে
কোন মহাজন সনে হৈব দর্শনে। (চৈঃ ভাঃ পৃঃ ১৫৩)

সেদিন দখিণাপুর ভক্ত-সমাগমে মুখর, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ এসেছেন দর্শনের আকুলতা নিয়ে, সঙ্গে এনেছেন নরেন্দ্রনাথকে।

পশ্চিমের দুয়ার খুলেই এসে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনাথ—ভোগমত্ত ধরণীর পশ্চিম দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন পূর্ব-তোরণের ত্যাগের দেবতা···যুগে যুগে প্রাচ্যই প্রতীচ্যকে দিয়েছে ত্যাগের দীক্ষা—ভগবান ঈশামসি, ভবগান জরথুষ্ট্র, কন্‌ফুসীয়স্, লাউৎজে এঁদের সকলেরই উদয়ের পথ এই প্রাচী তীর্থ···

অঙ্গ দেবতাকে চিনতে শ্রীঠাকুরের দেরী হয় না—গঙ্গাজলের জালার কাছেই নিলেন ঠাঁই—যাঁর বিদ্যুদ্দৃপ্ত লেখনীতে একদিন গঙ্গামহিমা—মহাদেবের জটানিঃসৃত গঙ্গাবারীর মতই নিষ্যন্দিত হয়েছিল, পূজার পূজ্য সেই গাঙ্গবারিপূরিততোয়াধারের মতই ধরণী সেদিন স্বামীপাদের জ্ঞান করুণার পুণ্যনীরে গহন গাহনের প্রতীক্ষায় আকুল।

তনুমন নিঙ্‌ড়ে নিবেদিত হল অশান্ত হৃদয়ের ব্যথা—কণ্ঠে জাগল,—মন চল নিজ নিকেতনে···পরবাসী আপন ভোলা শিব যেন পথহারা—দিশাহারা ক্ষণভিন্ন কুজ্ঝটির বুকে পেয়েছে অরুণিমার রাঙ্গা হাসি। সমাধির সপ্তসায়র মথিত প্রাণে ঠাকুর আদরে দেন ভরে তাঁর আদরের নরুকে··· সেদিন দক্ষিণেশ্বরের মাঙ্গলিকে জেগেছিল নূতন এক মূর্চ্ছনা—প্রাচীন ভারতে নিদালীর মোহাঞ্জনে পূর্বাশার প্রথম আবেদন।

নিশির ডাকে অমার অবলুপ্তিতে মানুষ নিঃশব্দে যায় হারিয়ে—এ ডাক অমানুষের ডাক—কিন্তু যদি ডাক দেন নারায়ণ স্বয়ং তাঁর পাঞ্চজন্যে, আঁধার আত্মা জ্যোতির সমুদ্রে নিজেকে না হারিয়েই ত পারে না।

সেদিন কুঠীর ছাতে জেগেছে অসীমের দিশাহারা আহ্বান—ডাকেন ঠাকুর,—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়···কুঁড়িনিথর ধরণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে ডাক জাগায় কাঁপন—বন্ধনের মাঝে জাগায় মুক্তির মুক্তা···এ ডাক একদিন জেগেছিল ভগবান বুদ্ধের করুণায়িত বুকে—এ ডাক জেগেছিল গৌরচন্দ্রের প্রেমার্ত্ত প্রাণে—আর নীড় বিরাগীরা দলে দলে এসেছিল ছুটে—

সিমলার ঘুমমাখা পল্লীতে সুষুপ্তির চুম্বনে নিথর হয়ে আছে সপ্তসাগরের ঋষি—সহসা সেই সর্বহারা নিশির ডাক এসে লাগে অর্গলিত হৃদয় দুয়ারে—ছুটে চলেন নরেন্দ্রনাথ দখিণাপুরীর ঠাকুরের কাছে—তন্দ্রাস্তিমিত নয়নে কিসের আচ্ছন্নতা কে জানে—স্পন্দহীন দেহ থাকে পড়ে সেই আড়ম্বরহীন গৃহকোণে—সেদিন আত্মায় পরমাত্মায় সে কি কানাকানি হয়েছিল ইতিহাসের পাতায় সে রহস্য নিবিড়তায় স্তব্ধ।

চল্লিশ

মহামায়ার বিরাট শক্তিকে কাজে লাগাতেই তাঁর নেমে আসা জগৎ খেলায় ‥গীতামুখে তাইত তাঁর কথা,—প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্যঃ বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ…ঠাকুরও বলেছেন,—অবতার লীলায় যোগমায়া ভেল্কী লাগিয়ে দেন। তাইত দেখি সেই বিরাট মায়াবী যুগে যুগে এক পরম আকর্ষণীয় বস্তু—কথায়, কাজে, চলাফেরায় তার মায়ার যাতুদণ্ডে মানুষ হয়ে যায় আপনহারা—যুগে যুগেই কথার মায়াজাল রচনা করেছেন…বুদ্ধ অবতারে জাতকের কল্পকথায় লোক হয়েছে মুগ্ধ—বেথেলহেমেও ছোট ছোট কথা কাহিনীতে হরণ করেছেন বিশ্বের প্রাণ—আজও সে অবদান অনবদ্য। দক্ষিণেশ্বরেও দেখি সেই একই লীলাঞ্চন—লীলার রাখী তিনি নিজেই পরেছেন—তাইত লীলার বৈচিত্র্যেও জেগে থাকে একটি বাদী সুর। দক্ষিণেশ্বরেও দেখি ছোট ছোট কথিকাতে দিয়েছেন বড় বড় সমস্যার সমাধান, ছোট ছোট কথায় হয়েছে অমৃতের সিন্ধু।

সেদিনের আসরে এসেছেন নরেন্দ্রনাথ—সরস আলাপে দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠেছে মর্ম্মরিত। বলেন ঠাকুর,—দেখ একজন মরে ভূত হয়েছিল, অনেকদিন একা থেকে থেকে সঙ্গীর অভাবে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে। কোন স্থানে কেউ মরছে শুনলে ছুটে যেত—ভাবত এইবার বুঝি সঙ্গী জুটবে। দেখত মৃত ব্যক্তির গঙ্গাস্পর্শে হয়েছে মুক্তি—এমনি করে তার সঙ্গীর অভাব মেটেনি। আমারও ঠিক সেই দশা—তোকে দেখে ভেবেছিলাম বুঝি একটা সঙ্গী জুটল—কিন্তু তুইত বল্‌লি তোর বাপ মা আছে। আমার সঙ্গী পাওয়া আর হোল না…নরেন্দ্রনাথের চিরউন্নত শির সেদিন কুণ্ঠায় হয়ে পড়ে একান্ত নম্র। স্তিমিত স্মৃতির দুয়ার খুলে ভাবেন…

প্রথম দর্শনের দিন গেছে কেটে—শক্তিমান নরেন্দ্রনাথের প্রাণে জেগে থাকে অসীমের একটি আকুল ডাক—সাড়া দিতে গিয়ে যেন জাগে না সাড়া—সিংহশিশুর থমকিত শরীরে জাগে শক্তির পরীক্ষা…বাঁধনের গঙ্গাধারার মত কূলে কূলে জাগে মুক্তির আকুলতা…দিনে দিনে মাস

যায় সরে…নরেন্দ্রনাথ হয়ে পড়েন অশান্ত…সেদিন এক পরমলগ্নে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে ছুটে চলেন সপ্তর্ষির ঋষি, অসীমের টানে উধাও যেন গঙ্গা—নয়নে স্বাতী লোকের চিরতৃষা…আলো আর ছায়ার মিতালী তার পদক্ষেপে—

ভগবান সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আছেন বসে ভাবে অর্দ্ধনগ্ন আপনহারা—উন্মত্তের মত প্রবেশ করেন নরেন্দ্রনাথ—চোখে সারা যুগের প্রশ্ন ছাওয়া—হিউম্, মিল্, বেন্, শঙ্করের তৃষ্ণা নিয়ে উপলভঙ্গ গতিতে এসেছেন সর্ব-তীর্থসার, দক্ষিণেশ্বরে—সর্বতৃষার গঙ্গাযমুনায়…

শ্রীঠাকুর এলেন এগিয়ে, তার প্রশ্নের উত্তরে চোখে জেগেছে শিব সম্মোহনের যাদু। দাক্ষায়ণীর মত দক্ষিণচরণটী দিলেন তাঁর বুকে ছুঁইয়ে—ত্রস্ত চকিত সচেষ্ট নরেন্দ্রনাথের বিশ্বে সহসা নেমে এল অবলুপ্তির ঘূর্নি—উচকিত নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে জাগে ভয়ার্ত্ত এক চীৎকার,—ওগো! আমার একি করলে—আমার যে বাবা আছে…অসীমের মমতা নিয়ে শ্রীঠাকুরের জাগে খলখল হাসি—এ হাসি যেন মহামায়ার নিজের খেয়াল খুসীর খেলায়, নিজের পরাজয়েরই হাসি—বলেন,—আচ্ছা থাক্, থাক্, পরে হবে।

এই পরের জন্যই প্রয়োজন ছিল দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পরম প্রতীক্ষা—এর জন্যই প্রয়োজন ছিল সিদ্ধার্থের সব হারাণর পথবৈরাগ্য।

এর পরের কথা—সেদিন পুণ্য তীর্থে তীর্থযাত্রীদের লেগেছে ভীড়, মধুকরের মত তারা ঘিরে আছেন দেবতাকে—সহসা নরেন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত, জ্বলন্ত উল্কার জ্বালা নিয়ে।

শ্রীঠাকুরও তাকে সরিয়ে নিয়ে যান যদুমল্লিকের উদ্যানবাটীতে—সবার দৃষ্টির আড়ালে—স্বভাব চেতন নরেন্দ্রনাথ নিজেকে ঠিক রাখতে শত চেষ্টাতেও হয়ে পড়েন আপনহারা—মায়াবী ঠাকুরের কাছে সর্বহারার মত দিলেন ধরা …..

আমাদের সুপ্তচৈতন্যে জমা আছে পূর্বাপর সব সংস্কাররাশি—এই নিয়েই আমাদের ব্যক্তিত্ব—এই দিয়েই আমাদের মন—এই সংস্কারের প্রেরণাই আমাদের স্বর্গনরকের নিয়ন্তা—এর মুক্তিকেই নানা শাস্ত্রে নানা ভাবে করেছে অভিনন্দিত পরম পুরুষার্থ বলে। স্বামিপাদের মগ্নচৈতন্যকে

সেদিন জাগ্রত করলেন শ্রীঠাকুর তাঁর শ্রীহস্তের যাদুস্পর্শে; সেদিন সুপ্তোত্থিতের মত ভাবী বিবেকানন্দ প্রকাশ করলেন আত্মকাহিনী--ভাবী তথাগতের অনাগত জীবনবেদ...

সম্বিৎ পেয়ে স্বামিপাদ দেখেন শ্রীঠাকুরের মুখে বেদমথিত তৃপ্তির হাসি —আর বীরসন্ন্যাসীর চোখে নেমে এসেছে অসহনীয় স্বপ্ন সংঘাত।
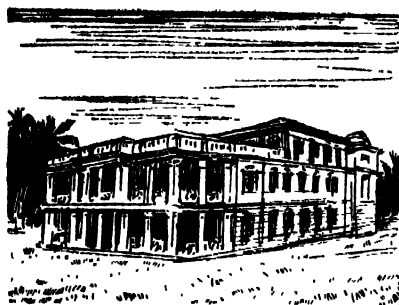
যদু মল্লিকের বাড়ী

একচল্লিশ

উনবিংশ শতাব্দীর মানবাত্মা বিজ্ঞানময়। বৈজ্ঞানিক সত্যই এযুগে চরম সত্য। বিজ্ঞানের যুগ-সন্ধানী আলোই বর্ত্তমান যুগের দিশা...তাই যুগের দিশারীকেও দেখি বিজ্ঞানঘন দৃষ্টি নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে করেছেন বিলাস—তবে এ বিজ্ঞানঘন দৃষ্টিতে রয়েছে বর্ত্তমানের কষ্টিপাথরে নিকষিত অতি বিজ্ঞানীর রহস্য ঋক্।

প্রথম দর্শনেই শ্রীঠাকুর ভক্তদের নিতেন বিড়ে করে, আর নিজেও বলতেন,—সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি তবে সাধুকে বিশ্বাস করবি। নিরীক্ষা পরীক্ষা মুখে চলত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন সংস্থান, হাতের ওজন, চোখের গড়ন--এমনি সব আধি-ভৌতিক পরীক্ষা। এরপর হত তার আধ্যাত্মিক পরীক্ষা--এ পরীক্ষা ভক্তের অন্তরের সংস্কাররাজির সঙ্গে পরিচিত হওয়া; আর পরীক্ষা ছিল ভবতারিণীর চরণ নিকশে, বিশ্বমনের মণিকোঠায় সন্ধান নেওয়া, আধি-দৈবিক এই পরীক্ষা—সব রকমে বাজিয়ে নেওয়া; কেন যে এত পরীক্ষা—এর শেষ উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। কারণাতীতের কারণ খুঁজতে যাওয়া অবান্তর চেষ্টা—তবে সম্ভবের মধ্যে এও মনে হয় যে শ্রীঠাকুরের শিশু-স্বভাব মনে যত রকম সমস্যার কথা উঠত সবই তিনি নিরসন করে হতে পারতেন শান্ত। বর্ত্তমানের বিহেভিয়া রিষ্টের দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীঠাকুর ধর্মরাজ্যে এক বিশেষ পদ্ধতির সৃষ্টি করলেন

সেদিনের ব্রাহ্মসমাজ নবোদিত জ্যোতিষ্কের মত স্বপ্রভায় সমুজ্জ্বল—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রকাশে সমাজ-মণ্ডল তখন আলোয় আলোময়। এঁদের ঘিরে ছিলেন ছোট বড় তারার মালা---তাঁদের সত্য, নিষ্ঠা, জ্ঞান এইসব সদগুণে বাংলার ব্রাহ্মসমাজ সেদিন সত্যই আকর্ষণ করেছিল জগতের প্রণতিনম্র শ্রদ্ধা।

ব্রাহ্মসমাজের এমনি ক্ষণ বসন্তের সেই লগ্ন যেন আরো রমণীয় হয়ে উঠেছিলো শ্রীঠাকুরের শুভ আবির্ভাবে। মহর্ষি, ব্রহ্মানন্দ, বিজয়, শিবনাথ, প্রতাপ এঁরা সকলেই শ্রীঠাকুরের সঙ্গ সান্নিধ্যে, আলাপ আপ্যায়নে হয়েছেন তৃপ্ত. হয়েছেন ধন্য—মহাপুণ্যের সে একদিন...

সেদিন সমাজগৃহে সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্মের মহিমা যেন আরো মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে, উৎসব পরিবেশে আর দীপমালায়। সহসা নিরুদ্ধ বিস্ময়ে সমবেতদের নয়ন সমক্ষে মূর্ত্ত সত্য-শিব-সুন্দরের মতই এসে দাঁড়ান শ্রীঠাকুর— বেদ-নির্ণিত ভাবোচ্ছল ঈষৎ হাসির ঠিকরে ব্রহ্মবিজ্ঞান বিকশিত- প্রবেশমাত্র দেহকান্তিতে জাগে সমাধির নিবাত শান্তি—

অনন্ত নিথরিত ব্রহ্মসমুদ্রে যেদিন জেগেছিল আনন্দ-হিল্লোল—যেদিন বিশ্বের সহস্রশীর্ষা পুরুষ জেগে উঠে জাগিয়েছিলেন বিশ্বের প্রাণ—সহস্র ধারায় উদ্বেলিত জোয়ারের গঙ্গার মত সেদিন বিশ্বের বুকে জাগিয়েছিল অমৃতের প্লাবন—এই শান্ত উপাসনাগম্ভীর সভাতেও শ্রীঠাকুরের ক্ষণসঞ্চরণে তেমনি জেগেছিল হর্ষের এক আনন্দ বিথার—সমবেতদের ধৈর্য্যধৃত ব্রহ্ম-চিন্তার বাঁধ গিয়েছিল ভেঙে··· সমাজকর্তৃপক্ষ উপায়হীন বিহ্বলতায় উৎসবগৃহ করে দেন আলোকহীন—নিস্প্রভ দীপমালার মধ্যে স্বপ্রকাশ চন্দ্রমণির মত শুধু শ্রীঠাকুরই ছিলেন দীপ্যমান। জ্যোতির সমুদ্রে খদ্যোৎপুঞ্জের প্রয়োজন, নিষ্প্রয়োজনেই।

সহসা উল্কার মত ছুটে আসেন নরেন্দ্রনাথ সমাধিধৃত বিগ্রহের পুরোভাগে—বিশৃঙ্খল ক্ষুব্ধ জনস্রোতে শ্রীঠাকুরের দেহরক্ষা যে একান্ত প্রয়োজন। সমাধি-ব্যুত্থিত শ্রীঠাকুরকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসেন সমাজগৃহের বাইরে—তাকে দেখতে এসেই ত দেবতার এই অপমান ! সিংহশিশু নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেদিন জেগেছিল অনেক স্নেহতিরস্কার। তীব্রযুক্তিতে সেদিন মৃগতৃষিত রাজর্ষির কথায় জানাতে ভুলে যান নি ভবিষ্যতের সতর্কবাণী···

মার চরণ নিকষে ফিরে এসে ক্ষুদ্র শিশুর আর্ত্তি নিয়ে শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে জাগে এক পরম নিবেদন—নরেন যে এমন সব বলে, তবে কি মা আমি মোহমুগ্ধ, তবে কি আমি অপরাধী ? দলমল গহন-গাহিনী জননীর পরম আশ্বাসে সেদিন দেবকণ্ঠে জেগেছিল যে কথা, নরেন্দ্রনাথের মুক্ত মুখরতা তার কোন উত্তরই জুগিয়ে দিতে পারে নি। শ্রীঠাকুর জানান—ওরে মা বলেছেন তোর মধ্যে নারায়ণ দেখি, তাই তোকে এত ভালবাসি। ভালবাসায় দেবতা মানুষ হয়—না মানুষকে করে দেবতা—না দুইই !···

বিয়াল্লিশ

দক্ষিণেশ্বরে জেগে উঠেছে এক রহস্যরম্য দিন—গঙ্গাতরঙ্গ যেন করতালি রঙ্গে হয়ে উঠেছে হরিময়। দীর্ঘ মন্দিরশীর্ষ অলকার চুম্বনে হয়ে উঠেছে অরুণায়িত·· লীলা রসময় শ্রীঠাকুর মধুর নৃত্যছন্দে ভাবোল্লাসে আত্মহারা—কখন গঙ্গাদর্শনে, কখন দক্ষিণেশ্বরীর মন্দির মুখে—ভক্তগুঞ্জনে আর ভগবৎ লীলাঞ্চনে দক্ষিণাপুরে সেদিন অলকার আল্‌পনা—সহসা নরেন্দ্রনাথ এসে পড়েন শ্রীপ্রভুর চরণনিকষে, যেন শিবজটাহারা গঙ্গাধারা—যার দর্শনে শ্রীঠাকুর হয়ে পড়েন সমাধি নিমগ্ন—যার অদর্শনে নয়নস্পন্দে ঝরেছে অঝোর শাঙনের ধারা, তারই আগমনে শ্রীপ্রভু আজ মৌনমন্থর—নরেন্দ্রনাথ চিন্তাকুল চিত্তে গিয়ে বসেন হাজরা প্রভৃতি ভক্তের সঙ্গে—ভাবেন শ্রীঠাকুরের ভাববিহ্বলতার কথা—ক্ষণে আসেন ফিরে স্নিগ্ধ প্রসন্নতার আশায়, দেখেন শ্রীঠাকুর বিমুখ শয়নে রয়েছেন শুয়ে—বিভ্রান্ত সন্ধ্যায় ফিরে যান নরেন্দ্রনাথ ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে।

এমনি দিন দিন করে মাস যায় কেটে,—দক্ষিণেশ্বরের দীর্ঘলগ্নগুলি হয়ে ওঠে দীর্ঘতর—শ্রীঠাকুরের বিরূপতায়। কিন্তু আসে না ত কোন ছেদ, কোন পরিবর্ত্তন—এই নিরুদ্ধ নিস্তব্ধতার রহস্যে সকলেই হয়ে ওঠে অস্থির।

সহসা একদিন শ্রীঠাকুর নরেন্দ্রকে অযাচিত প্রশ্নে কোরে তোলেন হৃত চকিত,—নরেন! এতদিন ধরে একটা কথাও বলিনি, তবে আসিস কেন?—ভেঙ্গে পড়া মেঘধারার মত উত্তর দেন নরেন্দ্রনাথ,—আপনাকে ভাল লাগে তাইত আসি—উত্তরে চন্দ্রমুখে জাগে শুধু প্রসন্নতার একটুকরো হাসি···লীলার এই পরীক্ষায় ভক্তের হয় হার, না ভগবান যান হেরে, কে জানে?······

নরেন্দ্রনাথের তখন নবানুরাগের বর্ষা—তপস্যার বন্যায় তখন দ্বাদশপার্ষদ আপনহারা হয়ে চলেছেন ভেসে—শ্রীঠাকুর ডেকে বলেন,—ওরে! অণিমাদি বিভূতি আমার আয়ত্তে রয়েছে, তোকে কাজ করতে হবে—তখন এটি কাজে

লাগবে। যদি নিতে চাস তবে মাকে বলি। সপ্তর্ষির রাজাধিরাজের দৃষ্টি-বিলাসে এই লাউকুমড়ো সিদ্ধাই যে কত অসার সে কথা শ্রীঠাকুরই জানেন সবার চেয়ে বেশী—তবু ছলনার হয় না শেষ।

সঙ্গীত যেন সন্ধ্যার সুর—ঘরে ফেরার ডাক—সাঁঝের কোলে মায়ের চুমা—যমুনার কূলে অকূলের অভিসার···দখিণাপুরের সুরধুনীকূলে সেদিন হরিকণ্ঠে জেগেছে ব্যথার মীড়

কথা কহিতে ডরাই, না কহিতে ডরাই

মনে সন্দ হয় বুঝি তোমা ধনে হারাই হা-- রাই

—আকাশ-গলা শিশিরের মত ঝরে পড়ে প্রাণকাড়া সুর—আর নরেন্দ্রনাথ!—তার প্রাণ শতদলও আর্দ্র হয়ে ওঠে ব্যথায়—সঞ্চিত বেদনা বর্ষণার্দ্র অন্ধকারেই পরে ঝরে—অশান্ত অসীম সাগরের বুকে যে সঙ্গীত, সেও যে সব হারানোর ডাক, আর সেই ডাকেইতো ছুটে আসে সাত সায়রের সুরধুনী—আপনহারা নরেন্দ্রনাথকে আজ ডেকেছেন স্বয়ং ঠাকুর, আর নরেন্দ্রনাথের দুকূল গেল ভেসে—লোকে শুনলো—আমাদের একটা হয়ে গেল···বিয়োগ বিধুর নরেন্দ্রনাথের বুকে জেগেছিল সর্বনাশা আগ্নেয়গিরির অভিসার—দুঃখ দুর্দশায় উর্দ্ধশিখ নরেন্দ্র সেদিন সব ছেড়ে উধাও হবার ব্যবস্থাই রেখেছিলেন করে—কিন্তু শ্রীঠাকুরের চোখের জলে আর আর্ত্তিতে তাঁর সব ব্যথাই যায় ধুয়ে মুছে—শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে শোনেন,—জানি তুমি মার কাজেই এসেছ—সংসারে তোমার থাকা ত হবে না—তবে আমি যতদিন থাকি ততদিন থাক।

অশ্রুসরস সন্ধ্যায় এমনি করেই সমাপ্তি ঘটে ঘর ছাড়ার—ঘরে ফেরার পালা, পার্থ আর সারথির মধ্যে যে বিচ্ছেদের মেঘ এসেছিল ঘনিয়ে তার আঠারো পর্বেই এই বর্ষণ উচ্ছ্বাস।

তেতাল্লিশ

সেদিন মঙ্গলবার— জয়মঙ্গলার খাসতালুক সেদিন ধরেছে গহন গহীন রূপ। দিনান্তের জ্বালা আর অশান্তির বুক চাপা ব্যথায়, ধরা দিয়েছে শান্ত সন্ধ্যার বুক-জুড়ান স্পর্শ। কৈশোরের কাহিনী এসে মিশে যায় অনাগতের স্বপ্ন কুহেলীতে···ধীরে দীর্ঘ ছায়াপদক্ষেপে নেমে আসে অধীর অন্ধকার, আশা-আশঙ্কার আবরণ, গঙ্গা তরঙ্গে মিশে যায় ঝিল্লীর একটানা সুর—ফুটে ওঠে এক অস্ফুট রহস্যের মীড়—অতীত অনাগতের রূপায়ণ—ধরণীর ঐক্যতানে আনে এক পরম বৈচিত্র্য অতীত হয় অস্ফুট অনাগতের মোহ-মদির বর্ণলেপে।

সেদিনও নরেন্দ্রনাথ এসেছেন মহাসাগরের ডাকে জীবনের শেষ প্রশ্ন নিয়ে; শ্রীঠাকুরের কাছে জানান মিনতি। শ্রীমুখের আশ্বাসে বসে থাকেন দিনান্তের প্রতীক্ষায়—রাত্রির প্রহরান্ত যে তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণ। মা ভবতারিণীকে মনে প্রাণে মেনে নিতে আজও ত পারে নি তাঁর অন্তরলোক—কালোরূপের অকুল পারাবারে আজও তাঁর কুল চাওয়ার নাই অন্ত। আজ মার চরণান্তিকে তাঁর একটিমাত্র প্রার্থনায় সমাপ্তি হবে সব সংশয়—শ্রীঠাকুর বলেছেন, আজ কালী কল্পতরুমূলে তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ হবার দিন— যা চাইবি তাই হবে।

ধীরে সেই সন্ধিক্ষণ আসে নেমে— বিরাট যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রচালিত নরেন্দ্রনাথের দেহমনে নেমেছে এক অজানা মদির বিহ্বলতা। বেপথু শরীরে চলেন নরেন্দ্রনাথ জীবন-মরণতীর্থে—ভবতারিণীর চরণান্তিকে—মৃন্ময়ী সেদিন চিন্ময়ীরূপে দিয়েছেন হাতছানি।

চন্দ্রিম বাঁশীর উচ্ছল ডাকেই ত অলকানন্দার উতল সাড়া—মার আকুল আহ্বানে ছেলের বুকের আগল আপনিই যায় খসে—তেমন ডাকার মত ত কেউ ডাকে না, তেমন চাওয়ার মত ত কেউ চায় না, তাই ত আমরা নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতায় থাকি পড়ে—জড়ের চৈতন্য, না চৈতন্যের জড়তা কে বলবে?

নরেন্দ্রনাথের বুকে সে ডাক আজ পৌঁছেচে—সপ্তর্ষির জীবনে আজ কুহেলীর মুক্তি-লগ্ন—ধীর পদক্ষেপে দেব-অঙ্গন পার হন নরেন্দ্রনাথ, এবার ধীর চরণে এসে দাঁড়ান বিশ্বের রহস্যময়ীর তোরণ তলে—নিমেষে চক্ষের আবরণ যায় সরে—চকিতে প্রাণের সব বন্ধন যায় শিথিল হয়ে—আয়ত দৃষ্টি তুলে দেখেন—চৈতন্যঘন ব্রহ্মময়ী অরূপ রূপে মন্দির আলো করে তাঁর সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করতে রয়েছেন দাঁড়িয়ে; জীবনের সর্ব-সংশয় সর্ব-অকল্যাণ অভয় হাতে দিতে চান সরিয়ে। সহস্রদল-পদ্ম আপনহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েন মার চরণপদ্মে—অন্তরালে সব কলগুঞ্জন তখন নিথরিত হয়ে জেগেছে একটিমাত্র আকুতি,—মা বিবেক দাও—বৈরাগ্য দাও—তোমার অভয়পদে অহৈতুকী ভক্তিতে করে তোল দর্শনের অবাধ অধিকারী।

হিমালয়ের অটলকে টলান চিরদিনই দায়—নরেন্দ্রনাথের দৃঢ় মনে আবার রহস্যের জাল আসে ঘনিয়ে—ফিরে যান শ্রীপ্রভুর মন্দিরে—শ্রীঠাকুরের প্রশ্নে জানান প্রার্থনার কথা—জগৎসম্বিৎ ফিরে আসে—মনে পড়ে অনশনক্লিষ্ট মা ও ভাইদের মুখ—আবার আশ্বাস দেন শ্রীঠাকুর—আবার দেন পাঠিয়ে মার চরণছন্দে—শিবাবতারের মুখে কিন্তু লাউ-কুমড়োর প্রার্থনা জাগতে গিয়েও যেন জাগে না—ফিরে ফিরেই প্রার্থনা জানান—মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও—তোমার রাতুল চরণে একান্ত ভক্তির কণাধিকার মাত্রই......অবচেতনের অধোদেশে আছে এক পরম অবচেতন—সেখানেই আছে আমাদের প্রাণ-পুরুষ—মণিকোঠায় সেই শিব-সত্বাই শাশ্বত—তাঁর বাণীই ত অন্ধকারের বুকে এনে দেয় সত্যকার সন্ধানী আলো—সেই দিশারীর ইঙ্গিতেই আপনহারা শিব নানা পথে চলেই ত পায় পরম পথের সন্ধান—এই অবচেতনের অবচেতনই ত তৃণকীটকে নিয়ে চলেছে শিবপীঠে......

চুয়াল্লিশ

প্রেম-মদিরাক্ষী সুরধুনীর পাণিহাটির কূল সেদিন হরিময়---সেদিন আবার দুকূলে জেগেছে হরিনামের বান---কীর্তনের রোলে উঠেছে—

সুরধনী তীরে হরি বলে কে রে
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছেরে ॥

সত্যই সেদিন যেন প্রেমদাতা নিতাই আবার এসে দাঁড়িয়েছেন সুরধুনী কূল আলো করে— রসোচ্ছল হরিনামে শ্রীঠাকুরের—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়
আর ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মূরছা পায়—

রূপে অপরূপ! সে দেখায় জীবন-মরণ যায় হারিয়ে—কীর্তন-সম্প্রদায় তাই আপনহারা হয়ে ধরেছে—

হরি বলে কে-রে---জয় রাধে বলে কে-রে---
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে রে।

ভাবঘন মূর্ত্তি শ্রীঠাকুরের কীর্তনে ছিল অন্তরের আবেগই বেশী। ধরা দিতে অধরা সেই আনন্দঘন বিগ্রহ---ফুলময় তনু যেন জ্যোতি সাগরের আধো একটি ফুট -সমাগত কীর্তন সম্প্রদায় যেন আবার ফিরে পায় নদীয়া বিনোদকে। আবার যেন কীর্তনের হাটবাজার যায় বসে। আবার ধরণীর শীতার্ত্ত বুকে ফিরে আসে দখিণার সমারোহ···ব্রজবিপিনে ফিরে আসে বেতস বনের নিঃসন···মনে পড়ে গৌরকিশোরের কীর্তন বিলাস---

প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়
এ-রূপ এ-প্রেম লৌকিক কভু নয়।
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমমত্ত হইয়া
হাসে কাঁদে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লৈয়া
সার্থক জানিও ইহো কৃষ্ণ অবতার
মথুরা আইল লোকে করিতে নিস্তার!

—(চরিতামৃত)

আরও—নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়।

—(চৈতন্য ভাগবত)

যুগে যুগে কীর্তনলীলা এনেছে বিপুল সমারোহ, আর যুগে যুগে এই লীলার উচ্ছলে নেমে এসেছেন প্রভু স্বয়ং—যুগে যুগেই আপনহারা মত্ততায় নিজেকে গলিয়েছেন আর গলে গেছে পাষাণের প্রাণ…

ভাবে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের বর্ণনায়—

গৌরবর্ণ দেহ ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি
ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি।
ক্ষণে ধ্যান করে ক্ষণে মুরলীর ছন্দ
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবন চন্দ্র।

—(চৈতন্য ভাগবত)

উপনিষদে বৃক্ষকে ব্রহ্মের স্তব্ধতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেন সর্বম্।

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় শ্রীভগবান নিজেকে তুলনা করেছেন বৃক্ষের সঙ্গে। ত্রেতায় দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবট যেন সত্যের সাক্ষী হয়েই ছিল দাঁড়িয়ে… বৃন্দাবনে রম্য বংশীবট হয়েছিল নিত্য রাসস্থলী আর রামকৃষ্ণ-লীলায় পঞ্চবট তপস্যার অগ্নিতে আজও শিখাময়। পাণিহাটির বটমূলও নিত্যানন্দ প্রভুর অধ্যুষিত পরমস্থান। এই লীলাসত্রে পরম ভাগবত শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী দণ্ডছলে শ্রীলনিত্যানন্দের ভক্তসেবার বিধান মাথা পেতে নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। ভাব-মন্থরে শ্রীঠাকুর এইস্থলে এসে পৌছন—সঙ্গে এক অখণ্ড জনস্রোত—ভক্তদল চিরাচরিত প্রথায় মাল্সা ভোগেরও করেন ব্যবস্থা।

শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহ শ্রীঠাকুরের তনুমনে ছিল এক সপ্ত লোকের শুদ্ধি। শ্রীঠাকুরের কথায়—সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন নূতন হাঁড়িতে রাখা

—এটি অবশ্য তাঁর পার্ষদদের জন্যেই বলা। পূর্ণ আদর্শে এতটুকু প্রতিসিদ্ধিও অমার্জ্জনীয়।...পূত গঙ্গাবারি নিষেবিত বটতটে বসেছে ভক্ত মেলা—কুহুলিত হয়ে উঠেছে হরিনামাবলি। ভাবমুখে শ্রীঠাকুরের তখন অর্দ্ধবাহ্য—ভক্ত সঙ্গে চিরদিন তিনি ছিলেন আপনহারা—সহসা ভেকধারী এক বাবাজী মাল্‌সা ভোগের কিয়দংশ গ্রহণ করে ভাবমন্থর শ্রীঠাকুরের দিকে হন অগ্রসর—ভক্তরা গণে প্রমাদ—তাদের চিরদিনের জানা শ্রীঠাকুর যে স্পর্শকাতর—সোনার শ্যাম-অঙ্গ যে সহজেই হয়ে পড়ে সঙ্কুচিত... ব্রহ্মানন্দ কেশব বলতেন,—এতবড় আধার আজ পর্য্যন্ত জগতে আসে নাই—এঁদের দেহ কাঁচের আলমারিতে সযত্নে রক্ষা করতে হয়, না হলে থাকে না। বাবাজীর অশুচি স্পর্শে শ্রীঠাকুরের দেহ মনে জাগে তীব্র প্রতিক্রিয়া—ভাব-বিহ্বলতা যায় সরে—শ্রীঠাকুর প্রসাদ গ্রহণে হন বিরত। শেষে অন্য এক ভক্তের দেওয়া অমৃত কণায় আনে পরিতৃপ্তি।

মণি সেনের গৃহ-বিগ্রহ দর্শনান্তে রাঘব পণ্ডিতের শ্রীবিগ্রহ দর্শন পথে শ্রীঠাকুরের প্রায় তিনঘণ্টা কেটে যায়—জনসমাগমই এর প্রধান কারণ।

শরণাতুর এক কণ্ঠে জাগে আর্ত্তি—সহসা এসে লুটিয়ে পড়ে কোন্নগরের ভক্ত নবচৈতন্য। অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি এসেছেন ছুটে শ্রীঠাকুরের আগমন সংবাদে। তখন প্রত্যাসন্ন বিদায়মুখে শ্রীঠাকুর নৌকায় উঠেছেন সবে।

মহাভাব বিলসিত তনুতে জাগে করুণার্দ্র শিহর, ঈষৎ হাসিতে জেগে ওঠে প্রেমার্ত্তি—চকিতে বরহস্তের স্পর্শে নবচৈতন্যের জীবনে নেমে আসে অমরার ক্ষণভিন্ন সংবাদ।

...লোকে দেখে আনন্দলোকের বিভ্রম বিলাসে ভক্ত হয়ে পড়েছেন উন্মত্ত। সেইদিন থেকেই তার জীবন-নদীর হয় দিক পরিবর্ত্তন—সার্থক কবি সত্যই বলেছেন—

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

নবচৈতন্যের জীবনে পরমচৈতন্যের আবির্ভাব লগ্ন, এমনি অঘটনরঙ্গেই ঘটনা—

পঁয়তাল্লিশ

সুখ দুঃখের মালায় গাঁথা এই জগৎ। এই মালার আলোছায়াতেই জগৎ এত বিচিত্র। আমাদের ধূলার ধরণীর শোভা এই মালা। কিন্তু এই মালা যখন জগন্নাথ নিজের গলায় নিজেই পরেন, তখন এই মালা হয়ে যায় পরম রমণীয়—স্পর্শমণির স্পর্শে হয়ে যায় মণির মণি—

যুগে যুগে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন এই মঙ্গল মাল্যে নিজেকে সাজাতে। ভগবান ঈশামসি নিলেন ক্রুশের মৃত্যু কণ্টক, আর দিয়ে গেলেন ক্ষমার অবদান……নিত্যানন্দ প্রভু নিলেন রক্তরাঙ্গা প্রেমের রাখী, হরে নিলেন যুগ যুগ সঞ্চিত পাপ ভার…ভক্তের সেবার আর্ত্তি নিয়ে ভগবান তথাগত নিলেন দারুন ব্যাধি…ত্রেতায় ভগবানের হৃদয় ভূষণ ভৃগু-পদলাঞ্ছন আজও আঁকা রয়েছে তাঁর শ্রীঅঙ্গে…আর এ যুগে রামকৃষ্ণ নিলেন পাদুকা লাঞ্ছন সমাধির পরম লগ্নে—আর বুক নিঙড়ে নিলেন দুরন্ত ব্যাধির তিলে তিলে জ্বলে যাওয়া—নিজেই বলেন,—এই দেব দেহে পাপস্পর্শ হয় নি কোন দিনই তবে কেন এ বেদনার্ত্তি? ছলনাময়ের এই প্রশ্ন নিজেকেই করা। নিজেই বলেন,—দেহ ছেড়ে মনটা বেরিয়ে এসেছে, দেখি তার পিঠময় ঘা। মা দেখান যত লোক এসে স্পর্শ করে, আর তাদের ভোগ নিতে হয়, তাই এই দুরন্ত ব্যাধি।

অসাধ্য কর্কট রোগের উপশমের জন্য শ্রীঠাকুরকে আনা হল শ্যাম-পুকুরের একটি ভাড়া বাড়ীতে—আঠার শতকের পঁচাশি সালের ভাদ্রের এক বিষাদময় দিন—শ্রীঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের পূত পরিবেশ ছেড়ে চলে আসতে হয় কলিকাতার লোকাবর্তে।

…শ্যামাপূজার রাত্রি। শ্যামপুকুরে সে এক শোক রহস্যের পরিবেশ—তমোময়ী রজনীর চারিদিকে পূজার উপাচার সজ্জিত—ভক্তের আকুতি আর ধূপ চন্দনে হাসিকান্না যায় মিশে, ভক্তদের মনে নানা কথার মেলা—ধীরে পূজার লগ্ন যায় বয়ে—পূজার প্রদীপ হয়ে আসে ক্ষীণ—সহসা পাঁচ-সিকা পাঁচআনার ভক্ত গিরিশের কণ্ঠে জাগে জয়বাণী—পুষ্প উপচারে

শ্রীঠাকুরের চরণ দুটি ওঠে ভরে, একে একে ভক্তদের ভাব বিহ্বল অর্ঘ্য নির্মাল্যে—রহস্য যবনিকা যায় খসে। শ্রীঠাকুরের দেবদেহে অভয় মুদ্রায় বিলসিত হয় ভবভয়হারিণীর অরূপ রূপ—পূজায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূজ্য নিজেই গেলেন করে…

কালী আর ব্রহ্ম অভেদ—আবার তেমনি অভেদ, লীলা আর নিত্য। ভবতারিণীর প্রকাশমূর্ত্তি লীলামূর্ত্তিইত শ্রীঠাকুর। রোগজর্জর দেহে, জীবনের অবসন্ন মুহূর্ত্তে শ্রীঠাকুরের দেহে এই প্রকাশেই আসন্ন অবসরের আয়োজন ছিল নিহিত। শ্রীঠাকুর বলতেন,—যখনই দেখবে অগ্রভাগ দিয়ে খাদ্যগ্রহণ করছি, যখনই দেখবে লোকে গণছে, মানছে তখনই জানবে অবসান দিন এসেছে ঘনিয়ে। গোপন দিশারীর প্রকাশ নিদর্শন যে নিষিদ্ধ।

মহাকালিকার এই মহাপূজায় নিজেকে প্রকাশ করেই শ্রীঠাকুর টানতে চাইলেন চিরবিচ্ছেদের যবনিকা। বিশ্বের দীপাধার নির্বাণের পূর্বমুহূর্ত্তে ক্ষণশিখায় হয়ে উঠেছিল প্রোজ্জ্বল—হয়ে উঠেছিল বেদনরম্য।

শ্যামহীন শ্যামপুকুর রয় পড়ে, শ্রীঠাকুর যান কাশীপুর উদ্যানবাটীর প্রশস্ত গৃহে…একান্ত প্রাণের আকুতিতে ভক্তের প্রাণ শ্যামপুকুরের অপরিসর গৃহে শ্রীঠাকুরকে চান না রাখতে। তাঁরা ভাবেন দক্ষিণেশ্বরীর অন্দর কেল্লার মত উদার প্রশস্ত গৃহ কলিকাতা মধ্যে না পেলেও, আলো হাওয়ার ত্রুটি না হলেই শ্রীঠাকুরের শরীরের কিছু কুশল হতে পারে। তাই কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে শ্রীঠাকুরের স্থানান্তরিত করা হল।

এই শ্যামপুকুরেই একদিন নেমে এসেছিল পূর্বপশ্চিমের মিলন পূর্ণিমা… খৃষ্টান ভক্ত মিশ্র এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীঠাকুরের কাছে। মিশ্র যুক্তকরে দীন নিবেদনে জানান নিজের সব সমর্পণের কথা। ভাববিহ্বল শ্রীঠাকুর তখন ঈশার সঙ্গে অভিন্ন, সমাধির নিথর সারা দেহে—আর সর্বভূতহিতে রত তাঁর শ্রীহস্ত দেন বাড়িয়ে পাশ্চাত্য প্রথায়। এই শ্যামপুকুরে, রোগাহত দেহে, এই স্বল্পপরিসর গৃহে তাঁকে ভক্ত সঙ্গে প্রায় তিন মাসাধিক কাল থাকতে হয়। শ্যামপুকুরের লীলা-বৈচিত্র্যের, ভবতারিণীর সঙ্গে নিজের অভেদ দর্শনেই হয়েছিল তাঁর শেষ প্রকাশ!

কাশীপুর উদ্যানবাটীর বিষাদ পরিবেশ ভক্তচক্ষে চিরদিনই হয়ে আছে বেদনা নিবিড়। কর্কট রোগের জর্জর ব্যথায় ভগবানের আর্ত্তি হরণে অক্ষম ভক্তচক্ষে শুধুই ঝরেছে শ্রাবণের ধারা। সেদিন দেওভোগের দুর্গাচরণ নাগ এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীঠাকুরের শয্যা পার্শ্বে। নয়নে দীন আর্তির সঙ্গে মিশেছে অসহায়ের বহ্নি-বিক্ষোভ ;—জ্বলবার মন্ত্র নিয়ে বলেন,—গ্যান গ্যান আমারে গ্যান...

অতি ত্রস্তে শ্রীঠাকুর বলেন,—সরিয়ে দে ওকে সরিয়ে দে! নাগ-মশায়ের গোপন সঙ্কল্প তখন পড়ে ধরা—তিনি চেয়েছিলেন শ্রীঠাকুরের সব আধি-ব্যাধি নিজের দেহে টেনে নিতে।

বিরাট পুরুষের বিরাট দাহ সহ্য করবার শক্তি নাগমহাশয়ের ছিল। দেবতা আসেন ধরণীর দাবদাহে চিরদিনই উর্দ্ধশিখায় জ্বলতে। ক্ষুদিরামের স্বেচ্ছাধৃত দারিদ্র জ্বালায় জ্বলেছেন বাল্যে, কিন্তু লীলাঞ্চনে মুছে দিয়েছেন সে জ্বালা। মধ্যপথে তপস্যার খাণ্ডবদহনে জ্বলেছেন বিশ্বের দাহখণ্ডনে। ভগবান বুদ্ধের মত বলেছেন,—

যৎ কিঞ্চিৎ জগতাং দুঃখং
তৎ সর্ব্বং ময়ি পচ্যতাম্
বোধিসত্বৈঃ শুভৈঃ পুণ্যৈঃ জগৎশান্তিং অবাপ্নতু।

পুরবীর মীড়ে আবার বেজে ওঠে সেই পরিচিত সুর—জীবন সন্ধ্যায় অসহ এই জ্বালায় সেদিন শ্রীঠাকুর নাগমহাশয়ের শান্তশীতল শরীর স্পর্শে নিজেকে চেয়েছিলেন জুড়াতে—

প্রসাদবিভ্রাটের অঘটনও এই কাশীপুরেই ঘটে। একাদশীর সে এক তিথি। নাগমহাশয় গেছেন উদ্যানবাটীতে। ইদানীং তিনি কদাচিৎ যেতেন সে বেদনার তীর্থে। বলেছেন,—ভগবান স্বেচ্ছায় যখন নিয়েছেন জরাতুর দেহ, আর তার শান্তির কোন উপায়ই যখন হবার নয়, তখন সে স্থানের প্রয়োজন হয়ে গেছে শেষ। শ্রীঠাকুর নাগমহাশয়কে সেদিন প্রসাদ দিতে বলেন স্বামিপাদ রামকৃষ্ণানন্দজীকে—তখনও মঠের শশী ভাই।

প্রসাদ প্রস্তুত—দুর্গাচরণ আপনহারা হয়ে আছেন বসে দেবসন্নিধানে—যুক্তকরে, নতনেত্রে—আহারের কোন চেষ্টাই নাই কোথাও—

শ্রীঠাকুর বোঝেন বিপদ—শেষে আদেশ দেন নীচে যেতে, যেখানে রয়েছে আহারের ব্যবস্থা—যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র, গিয়ে বসেন নাগ মহাশয় সম্মুখে প্রসাদ পরমান্ন কিন্তু প্রসাদ গ্রহণের নাই কোন চেষ্টা। নিস্পৃহ নেত্রে আছেন বসে—অন্তর্যামীর স্পর্শ-প্রসাদে হয়ে যায় শেষ মীমাংসা। নাগ মহাশয় পণ করেছিলেন একাদশীর পুণ্য তিথিতে শ্রীঠাকুরের সত্যকার প্রসাদেই করবেন তাঁর ব্রতভঙ্গ—মহানন্দে ভূমিষ্ঠ প্রণামে প্রসাদ গ্রহণ হয় শেষ—শেষে ত্রস্ত চকিত দৃষ্টির সমক্ষে ঘটে যায় ভক্তিরাজ্যের এক অঘটন—শুষ্ক শালপাতায় দেওয়া প্রসাদ—প্রভুর স্পর্শধন্য সেই শুষ্ক পত্রগুলিও হয়ে যায় শেষ। শত বাধাতেও হয় না বিরতি।

শ্রীঠাকুরের এই ভক্তটি যেন বিদুরের অবতার—বাল্যেই পরম ভক্ত বিদুরের দর্শনধন্য এঁর জীবন। তপস্যার মূর্ত্তরূপ এই দীন ভক্তটির কথা বলতে গিয়ে স্বামিপাদ, 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' প্রণেতাকে বলেছিলেন,—লিখে দিও—'মধুকর ত্বং খলু কৃতী'—আর বলেছিলেন,—এত দেশ দেখলুম কিন্তু নাগ-মহাশয়ের মত এমন একটি চোখে পড়ল না—

কাশীপুরের উদ্যানে ধরণীর ত্রিতাপে তখন শ্রীঠাকুর শরশয্যালীন। সহসা কমলালেবুর অভিলাষ জানান সেবক লাটুকে। অতি অপ্রত্যাশে নাগমহাশয় সেই সময়ে সেই ফলই নিয়ে আসেন শ্রীপ্রভুর প্রয়োজনে; একি ভক্তের আর্ত্তি, না ভগবানের তৃষ্ণা—কে জানে। তবে কৃতার্থ নাগমহাশয়ের শুষ্ক হৃদয় যে পরম আস্পদে গিয়েছিল ভরে, একথা বেশী করে না বললেও চলে।

আর একদিনের কথা। শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হল,—মুখটা কেমন করছে, পাকা আমলকী খাব। দীনধন্য নাগমহাশয় ছিলেন যুক্তকরে দাঁড়িয়ে, ধীর শান্ত তপোজ্জ্বল বুকে এই বেদবাণী হারায় না তার দিশা। ধীর নিস্তব্ধ সঞ্চারে চলে যান দুর্গাচরণ—তিন দিন অনাহারে অতন্দ্র চেষ্টায় খুঁজে পান পাকা আমলকী—পরম যত্নে পরম আনন্দে নিয়ে আসেন শ্রীঠাকুরের শয্যাপাশে—সেটা ছিল পাকা আমলকীর অসময়। শ্রীঠাকুর প্রসন্ন

হাসিতে গৃহকোণ উচ্ছ্বসিত করে বললেন, আহা !—এমন পাকা আমলকী কোথায় পেলে দুর্গাচরণ ?—দীনভক্ত লুণ্ঠিত বুক পেতে গ্রহণ করেন সে প্রসন্ন হাসির অন্তরেখা।

শ্রীঠাকুরের ভক্তদের কাছে এই দীন ভক্তের পরিচয় ছিল অতি ক্ষীণ—তিনি অতি অগোচরে, অতি অপরিচয়ে যেতেন দেবসান্নিধ্যে – গৃহকোণে দেখা যেতো—শুষ্ক মলিণ জীর্ণবাসে, যুক্ত করে আছেন বসে সকলের পশ্চাতে। শুধু দীপ্ত নয়নে জেগে থাকত তপস্যার শিখাঞ্জন।

লীলাপোষ্টাইয়ের হাজরা সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আছেন বসে – মধ্যমণি হবার সাধ তাঁর চিরদিনই ছিল। দীনবেশে নাগমহাশয় গেছেন দক্ষিণেশ্বর-ধামে – বহুবঞ্চিত বহুবাঞ্ছিত আশা আকাঙ্খার অরুণিমা নিয়ে। প্রথম দর্শনের সেই অতি গহিনক্ষণে অভাগ্যে দেখা হয় হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে —তিনি দেন না কোন দিশা, বলেন,—পরমহংসমশায় এখানে নাই। নাগমহাশয় আশাভঙ্গে হয়ে পড়েন শেলাহত—সহসা দীনের ঠাকুর দেন দর্শন—ভাবমাত্র আবরণ, অর্ধবাহ্যে ডেকে নেন দিব্য অতি পবিত্র এই সন্তানকে। নাগমহাশয় বলতেন—ফুট তাঁর হাতে, ধরা না দিলে কি ধরা যায় ? শ্রীঠাকুরও গাইতেন,—ওরে কুশী-লব, কি করিস গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে – নাগমহাশয় সেই একদিনেই ধরতে পেরেছিলেন শ্রীঠাকুরকে, আর জীবনে কখনো ভুল হয় নি তাঁর এই জানাজানি অধরাকে ধরতে পারা···

দীনহীন এই ভক্তটির আর একটি দিক ছিল। সেখানে তিনি বজ্রাদপি কঠোর হতে পারতেন! সেবার দেওভোগে প্রতিপত্তিশালী দুইজন সাহেব শিকারে যান। এঁরা সেকালের কর্তা বিশেষ। কারো কোন আপত্তি শুনবার প্রবৃত্তি এঁদের কোন দিনই ছিল না। যাই হোক এঁরা যখন শিকারে উদ্যত, তখন নাগমশায়ের চোখে পড়ে তাঁদের এই নিষ্ঠুর চেষ্টা। তিনি যুক্তকরে তাঁর সহজ সুলভ দীনতায়, নিষেধ করেন তাঁদের এই হত্যালীলা। তাঁরা দৃকপাতহীন কৃপা দৃষ্টিতে তুলে ধরেন অগ্নিঅস্ত্র। সহসা অনাহারে খিন্নশরীর নাগমহাশয়ের দেহে জাগে একটা প্রবল বিক্রম। তিনি সাহেবের হাত থেকে আগ্নেয়অস্ত্রটি নেন

কেড়ে। সাহেবেরা এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে হয়ে পড়েন হতবুদ্ধি—কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নাগ মহাশয়ের বিষয় জেনে আর কিছু উচ্চবাচ্য করেননি।

আর একবারের কথা, নাগমহাশয়ের কাছে গ্রামের জমিদার শ্রীঠাকুরের নামে কিছু কটু বলেন। নাগমহাশয় ত্রস্ত দীনতায় তাঁকে নিরস্ত হতে বলেন। তিনি কিন্তু ভুলবার পাত্র ছিলেন না। সহসা এক অভাবনীয় ঘটনা যায় ঘটে। নাগমহাশয় তখন উদ্যত রোষে তাঁকে প্রহারে উদ্যত হন। এতে কিন্তু বিপত্তির সম্ভাবনা ছিল। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে এই বিবাদের সাহস কঠিন কথা। নাগমহাশয় গুরুনিন্দা শ্রবণে জ্ঞানহারা হয়ে তাকে তাঁরই পাদুকা দিয়ে প্রহার করেন। পরে সেই জমিদার ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। গিরীশ ঘোষ মহাশয় এই ঘটনায় বলেন,—নাগমহাশয় সত্যই ফণাধারী নাগ। দক্ষিণেশ্বরের ভাঙ্গা মেলায় এরপর চোখ মেলে দেখেন নি—সে যে কানুহারা বৃন্দাবন।

মনে পড়ে পদকর্ত্তা বাসুদেবের কথা—ঘোষঠাকুর যাচ্ছিলেন তমলুকের পথ বেয়ে। মধ্যপথে পেলেন আষাঢ় আকাশের বজ্র—নীলাচল শূন্য করে নীলমাধব গেছেন চলে—চিরদিনের সে যাত্রা···পদকর্ত্তা বলেন,—আমারও আর জীবনের নাই প্রয়োজন-জীবন্ত সমাধির জন্যে হলেন প্রস্তুত—দিব্য সে যুগ—মহাপ্রভু সূক্ষ্ম দেহে এসে দিলেন সান্ত্বনা সেই দুর্দ্দিনে দুর্গাচরণও আহার নিদ্রা দেহ প্রয়োজনের সব ছেড়ে নিলেন প্রায়োপবেশনের শয্যা—বিবেক স্বামী গিয়ে দাঁড়ালেন সে সংকটে! ভক্তের রক্ষা যে ঠাকুরের দেওয়া দায়—অতিথি সন্ন্যাসীর অনুরোধে সে যাত্রা জীবনের চেষ্টায় আসেন ফিরে।

ছেচল্লিশ

দক্ষিণাপুরের সারঙ্গে কল্যাণের ছায়া এসে পড়ে। গৃহীভক্তরা শ্রীঠাকুরকে কাছে পাওয়ার এই পরমলগ্নটীকে পরমানন্দে নিয়েছিল বরণ করে। তারা ধরে নেয় শ্রীঠাকুর এই ব্যাধির ছলেই সরে এসেছেন তাদের হৃদয়তীর্থের তীরে। আর শ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা ভেবেছিল হয়ত শ্রীঠাকুর এই ব্যাধির বিপাকে অন্তরঙ্গের পরীক্ষা করেছেন আর তাঁদের মিলনমাল্যে রচনা করেছেন এক প্রেমের অমৃত বন্ধন।

ত্যাগী সন্তানদের তখন প্রথম অনুরাগের বন্যায় ভেসে চলার পালা। একদিকে যেমন বহ্নিমুখে নিজেদের নিঃশেষ আহুতিতে চলেছে সমিদ্ধ তপস্যা, অন্যদিকে তেমনি চলেছে বালখিল্য চাপল্য। শীতার্ত রজনী যায় কেটে তপস্যায় আর স্বাধ্যায়ে, এরি মাঝে জেগে থাকে প্রেমবৈচিত্র্যের নর্মলীলা।

সেদিন কাশীপুরের বাগানে নেমে এসেছে পলকহীন রজনী। সহসা জননী সারদেশ্বরী দেখেন শ্রীঠাকুর বেগে যাচ্ছেন প্রাঙ্গন বেয়ে। অবুঝ বিস্ময়ে জননী থাকেন চেয়ে, দেখেন—শ্রীঠাকুর তেমনি ভাবেই আসেন ফিরে। ছুটে যান শয্যা পার্শ্বে—দেখেন শ্রীঠাকুর অক্ষম শয়নে নিষন্ন। প্রশ্নে বলেন,—ছেলেরা খেজুরের রস খেতে গাছে উঠবে, সেখানে বিষধর সর্প ছিল তাই গিয়েছিলাম। এই বিষমবিপদে সন্তানদের রক্ষা করতেই যে ছুটে গিয়েছিলেন অধরা শরীরে!

জননী সারদেশ্বরীকে প্রথমে আনার সাহস হয়নি কারো—স্থানের অপ্রশস্ততায়। শেষে সেবার ত্রুটিতে শ্রীমাকে নিয়ে আসতেই হয়। এই শ্যামপুকুরেই শ্রীমা একবার পড়ে যান। তাঁর এই আঘাতে শ্রীঠাকুর রসোচ্ছলে বলেন,—তাঁকে কেউ যদি ঝুড়িতে বসিয়ে আনতে পারিস ভালই হয়। শ্রীমা নিত্য আহার্য্য নিয়ে যেতেন তাই শ্রীঠাকুরের এই রহস্য। গোধূলির রঙ্গের মতই ছড়িয়ে পড়ে ক্ষণিকের রঙ্গোচ্ছ্বাস—দিকচক্রবালে…

তারকেশ্বরের মন্দির—বহু ভক্তের বেদনার্তিতে নিত্যদিনই থাকে ভারী হয়ে। সেদিন সহসা গভীর রজনীর বুক চিরে জেগে ওঠে এক ঝন্‌ঝনা। জননী সারদেশ্বরী শ্রীঠাকুরের কুশলে ছিলেন পড়ে। অন্তর মথিত করে শোনেন এক মহাবাণী—শুনেই আসেন ফিরে। মুহূর্তে তাঁর বুকে জাগে এক পরম সত্য, দীপ্ত হয়ে জেগে ওঠে মৃত্যুর অমৃতময় রূপ—ফিরে আসেন জননী পূর্ণতার ব্যর্থতা নিয়ে। শ্রীঠাকুর বলেন—বিদায় গহীন হাসি হেসে,—কিগো, কি হল? কিছুই না···জীবনের যবনিকা ধীরে আসে নেমে—গৃহান্তরের সে বাণী।

কাশীপুর উদ্যান বাটীতেই দ্বাদশ অঙ্গদেবতার মিলনমালা হয়েছিল রচিত। এই বেদনার বেদীমূলেই প্রতিষ্ঠা হয় অনাগত দিনের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।··

একদিনের কথা। সেদিন রামদত্ত মহাশয় আর ডাক্তার কৈলাস বসু গেছেন শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে। বসুজা শ্রীঠাকুরের প্রতি বিরূপ ছিলেন। দুইজনে উদ্যানবাটীর জলের ধারে আছেন বসে। সহসা শ্রীঠাকুর ডেকে পাঠান ডাক্তারকে। দুইজনেই ডাক্তার, কাজেই কাকে শ্রীঠাকুরের প্রয়োজন বুঝা যায় না। শ্রীঠাকুর বলে পাঠান,—যে আমাকে শিক্ষা দিতে এসেছে তাকেই ডাক। তড়িতাহত কৈলাস বসু দেখেন, একথা যে তাঁরই উক্তি। এই কৈলাস বসু মহাশয় শ্রীঠাকুরের কৃপায় আর একবার ধন্য হন। বাড়ীতে অসুস্থ রোগী আঙ্গুরের জন্যে আকুল। সেটি আঙ্গুরের সময় নয়। সহসা পরিচিত এক ব্যক্তি আঙ্গুর দিয়া যায়। তার কাছে বর্ণনা শুনে স্তম্ভিত হন ডাক্তার—শ্রীঠাকুরের লীলামূর্ত্তি সেই ভক্তটিকে দর্শন দিয়ে জানিয়ে দেন আঙ্গুরের কথা। ডাক্তার শ্রীঠাকুরের কাছেই জানিয়ে ছিলেন। আঙ্গুরের আর্ত্তি।

মেঘমেদুর দিনে সপ্তবর্ণ রামধনু ক্ষণিকে উঠে ক্ষণিকে যায় মিলিয়ে—ক্ষণিকের বিলাসে সৃষ্টি হয় স্বর্গমর্ত্তের সেতু। অবতার পুরুষের আগমন যেমনি রহস্যময়—তেমনি ক্ষণিক। তাঁদের জীবনও রচনা করে স্বর্গ মর্ত্তের অমৃত সেতু—ক্ষণভঙ্গে চির অসঙ্গ।

হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশের সুরেশবাবুর সঙ্গে নাগমহাশয়ের গতায়াত ছিল শ্রীঠাকুরের কাছে। সুরেশ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে নাগ-

মহাশয়ের বহুদিনের অন্তরঙ্গতা—একদিন দীক্ষা বিষয়ে নাগমহাশয়ের সঙ্গে দত্ত মহাশয়ের কিছু কথান্তর হয়। দুইজনে যান দক্ষিণেশ্বরে মীমাংসার শেষ কথা শুনতে। শ্রীঠাকুর দীক্ষার প্রয়োজন বলেন বুঝিয়ে,—হবে হবে কালে হবে—এর পর দত্ত মহাশয়কে কার্য্যান্তরে কোয়েটায় যেতে হয়। সেখানে শুরু হয় এক অনাস্বাদিত আকুলতা—দীক্ষার ক্ষুধা জাগে দূর প্রবাসে—ছুটে আসেন জন্মভূমির শ্যাম কোলে, কিন্তু দখিণাপুরে তখন ভাঙ্গামেলা—চাঁদের হাট গেছে ভেঙ্গে—নিরাশ নিষণ্ণ সে পুরী—

পতিতোদ্ধারিণীর উছল কূলে সেদিন শতচন্দ্রের উদয়—ক্ষণিকে সুরেশচন্দ্রের বিচ্ছেদ বিক্ষুব্ধ নয়নতীরে জাগে নন্দনের আনন্দকুঞ্জ—শত তৃষাতুর আঁখি মেলে দেখেন দখিণাপুরের শ্যাম-গদাধর এসে দাঁড়িয়েছেন মর্ত্তের মাটিতে অমর্ত্তের হাসি হেসে—আকুল প্রাণে কানে কানে শোনেন—পরমপাবন মন্ত্র—তারপর চকিতে যায় মিলিয়ে, স্পর্শ লোভাতুর সুরেশের ধরা ছোঁয়ার বাইরে—তবু ভক্ত ভগবানের মিলন মাঙ্গলিকে রচনা হয় যে মালা, সে যে চিরঅম্লান—নিত্য বৃন্দাবনের সে যে অশ্রুমণিহার।—একি স্বপ্ন—না স্বপ্নছলে নিত্যলীলার এক পর্ব্ব!

গদাধরের মন্দির—গয়াতীর্থ

সাতচল্লিশ

ক্রন্দসী কাশীপুরধামে শ্রীঠাকুরের একটি অস্ফুট প্রকাশ দেখা যায়, মহা প্রয়াণের লগ্ন যত ঘনিয়ে আসে তত ভক্তদের কাছে টেনে নিতে যেন দিয়েছেন সরিয়ে। স্বামিপাদদের তপস্যাকুল মনেও জাগিয়েছেন দিকচক্রবালের দূরাভিসার, মৃগতৃষার হাতছানি—গৌরীমায়ের তাপস মনেও জেগেছে অধীরতা—সরিয়ে দিতে বলেছেন,—তোর যে একটা কাজ বাকী ছিল সেটা সেরে এলে হয় না? গৃহ-বৈরাগী মাষ্টারমশায়ও এই সময় ছুটে গেছেন তীর্থরাজ কামারপুকুরে—শ্রীঠাকুরের স্মৃতি সুরভিত লীলার দেউল দর্শনে স্পর্শনে মুহুর্মুহু হয়েছেন রোমাঞ্চিত—দেববাঞ্ছিত মুক্তিরজে নিজেকে করেছেন রঞ্জিত--পথের বিভীষিকা পারেনি নিবৃত করতে। তৈর্থিকের মতই গেছেন পদব্রজে সজল ব্যাকুল নয়ন মেলে। সেই দেবভূমিকে বার্দ্ধক্যের বারাণসী করে নেবার ইচ্ছাও ছিল নিগূঢ় হয়ে মনের একটি কোণায়। কেবল শ্রীমার অনিচ্ছায় তিনি নিরস্ত হন সে চেষ্টায়। দক্ষিণেশ্বরে লীলায় শ্রীম ছিলেন ব্যাসকল্প গোপন ঋষি—শান্তসৌম্য, মৌন মধুর তাঁর জীবন যেন রামকৃষ্ণ রসাভিষেকে ছিল চির অমৃত মেদুর। শ্রীচৈতন্য-চরিতকারদের মধ্যে হয়ত তিনি একজন ছিলেন। শ্রীঠাকুরের দিব্য দর্শনেও তাই হয়েছিল প্রকাশিত বলেছিলেন,—গৌরাঙ্গদেবের সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখেছিলাম, তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম। আবার বলেছিলেন,—তোমায় চিনেছি চৈতন্যভাগবত পড়া শুনে। এই যেনর মধ্যেই রয়ে গেছে গুপ্ত-নটের গুপ্ত-নাট্যকার শ্রীম।

কথামৃত-ভাগবৎ এ যুগে পরমশাস্ত্র—শ্রীঠাকুরেরই কথা,—ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান তিনে এক একে তিন—কথামৃত এ যুগের পঞ্চমবেদ। কথামৃতের কল্পলতায় আজ ধরণী অমৃতায়িত--আজও দিকে দিকে, দেশে দেশে, নানা ভাষায়, নানা ছন্দে, শ্রীঠাকুর মূর্ত্ত হয়ে উঠেছেন কথামৃতের রসায়ণে। কথামৃত আজও ভক্ত হৃদয়ে হৃদয়ের ধন, শ্রীঠাকুরের মূর্ত্ত রূপ · পূজার পূজ্য কথামৃতকারকে জানাই অন্তরের অকুণ্ঠ প্রণতি। যখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখনকার শশী মহারাজ, কথামৃতের মত অনুলেখন নিতে

সুরু করলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরই জানান আপত্তি। হয়ত মনে হবে শশী মহারাজের লিখিত পুস্তকে শ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ নূতন ছন্দে করতো আত্মপ্রকাশ, হয়ত নূতন বর্ণ লেখায় প্রকাশিত হত দক্ষিণেশ্বরের নব-পুরুষোত্তম। কিন্তু পরমপাবন ভাগবৎ গ্রন্থ একটিই হয়, গীতার ভাষ্য বহু হতে পারে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অবদান খণ্ডিত হওয়া চলে না। বহু কথামৃত হলে অমৃতের অনবদ্যতা যেত চলে, দ্বন্দ্ব সংঘাতে সংশয়াকুল হতে হত প্রতি ছত্রে। শ্রীঠাকুর মাষ্টার মহাশয়কে পরে নিজে বলেছেন—তুমি আপনার জন, এক সত্বা—যেমন পিতা আর পুত্র– মাষ্টার মহাশয়ও শ্রীঠাকুরকে নিতে পেরেছিলেন জীবনের ধ্রুবতারা করে···তাই পরীক্ষা-ছলে শ্রীঠাকুর যখন বলেন,—আমায় কি মনে হয় বল দেখি? মাষ্টার মহাশয় উত্তর দেন,—যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য ও আপনি এক। শ্রীঠাকুরের কথায় —এদের থাক আলাদা, এদের জানবার প্রয়োজন আমিকে—আর এরা কে—বলা বাহুল্য মাষ্টার বা শ্রীম বা মণি, এঁরা সকলেই এক ব্যক্তি —রামকৃষ্ণ ভক্তপরিবারে আপনজন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভক্ত গোষ্ঠীর আদরের ছেলেধরা মাষ্টার।

আচার্য্য শঙ্করের কুশাগ্রবুদ্ধির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তিনটি শিষ্য—সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, আর হস্তামলক। ভগবান বুদ্ধের ধর্মচক্রে ত্রিরত্নের শরণমন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন পাঁচটি অর্হৎ—কৌণ্ডিল্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প মহানাম ও অশ্বজিৎ। আর শ্রীঠাকুরের বাণীবার্ত্তাবহ ছিলেন চতুর্দ্দশ দিকপাল—নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন, বাবুরাম, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, লাটু, হরি, তারক আর গঙ্গাধর, গোপাল, হরিপ্রসন্ন—এঁদের মধ্যে শশীভূষণ ছিলেন সেবা-মূর্ত্তি। স্বামিপাদ বিবেকানন্দ পরে যেন বলেছিলেন, শশীকে জানবি মঠের কেন্দ্রস্বরূপ। শ্রীঠাকুরের সেবাধিকারে শান্ত এই পুরুষ, সেবাই ছিল তাঁর জীবনবেদ—একবারের কথা, শ্রীঠাকুরের একান্ত প্রিয়বস্তু জেনে তিনি একটুকরো বরফ গামছা মুড়ে নিয়ে আসেন কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে—রৌদ্র দগ্ধ দিনের দ্বিতীয় প্রহরে ভক্তি-হিমে জমা বরফের টুকরো যথাযথই এসে পৌঁছয় শ্রীঠাকুরের কাছে। সেদিন শ্রীঠাকুরও বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন সেবকের সেবানুরাগে।

এই কাশীপুরেই একবার শ্রীঠাকুরের সাধ হয় জামরুল খেতে। ভক্তির পরীক্ষা না আকুতি জাগান—কে জানে? সেবকের সন্ধানী দৃষ্টি কিন্তু সেবার অসময়ের অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। এইসব ভক্তদের সেবা-সাধনায় শ্রীঠাকুর বলেছিলেন কাশীপুরের উদ্যানে,—তোরা সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস। এরপরও বরাহনগর আর আলমবাজার মঠে শশীমহারাজেরই ছিল মঠের সেবাধিকার। শ্রীঠাকুরের স্থূল দেহের অদর্শনেও শশীমহারাজের সেবানিষ্ঠা ছিল অক্ষুন্ন। সেবার আলমবাজার মঠে এই নিয়ে ঘটে এক অঘটন। নরেন স্বামীকে শ্রীঠাকুর দিয়েছিলেন বেদান্তে দীক্ষা -তিনি মেলে ধরতে চেয়েছিলেন উচ্চ ধ্যান ধারণার আদর্শ, সংঘের সামনে —শিবশঙ্করের চিরন্তনীতে···সেদিনের আলমবাজার মঠ তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগে মুর্ত্তিপূজার অসারতা বুঝাতে চান—সেবাসিদ্ধ শশীমহারাজ তখন একান্ত অনন্যতায় খুঁজে ফিরেছেন গুরু-ইষ্টের সেবা সৌকার্য্য—কেমন করে দুটি বাতাসা, দুটি পুষ্পান্ন করবেন নিবেদন। সেবার অসারতা প্রতিপন্নে অগ্নিমূর্ত্তি শশীমহারাজ স্বামিপাদকে চুলের মুঠি ধরে পূজার ঘর থেকে দেন সরিয়ে। শিব-রামের যুদ্ধের পটক্ষেপ এক অঙ্কেই হয়েছিল আর এই অঙ্কেই হয়ত ভক্তির কাছে জ্ঞানের পরাজয় ঘটেছিল; একথা ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষরিত হয়ে আছে। স্বামিপাদের বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে পূজার প্রতিকূল চেষ্টা আলমোড়া অদ্বৈত-আশ্রমেও হয়নি সফল। যেমন বলেছেন লীলা চাপল্যে,—মনে করেছিলেন, অন্ততঃ একজায়গাতে মূর্ত্তিপূজা থাকবেনা— তা দেখছি সেখানেও আসন করে নিয়েছে।

ব্রহ্মের সিসৃক্ষা ব্রহ্মেরই আনন্দমন্থন···জগতের রম্য সমাবেশ যে জগন্নাথেরই পূজারই উপকরণ, একথা বারবার হয়ে যায় ভুল। ধরণীর পরমান্ন অলকার কড়ার ডালে অরুচি জাগায়,—এযে তাঁরি কথা।

মাদ্রাজ মঠে নিদাঘ নিথরিত একরাত্রি—সেবকের চোখে নাই নিদ্রা। দেখা গেল পাখা হাতে চলেছেন শ্রীঠাকুরের মন্দিরে—প্রত্যক্ষ দেবতার সেবার আকুলতা নিয়ে। বর্ষণ-ক্লিন্ন আর এক রাত্রি—দেখা যায় শ্রীঠাকুরের মন্দিরে ছত্র হাতে অনলস নয়নে আছেন দাঁড়িয়ে—ভগ্নছাদের জলরোধ চেষ্টায়। স্থানান্তরে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি মনে—প্রভু

যে বিশ্রান্তিতে মগ্ন। এমনও দেখা গেছে অষ্টপ্রহরাধিক পূজায় সেবক রয়েছেন মগ্ন -উপচারের হয়েছে অঘটন, স্বামীপাদ মন্দিরের পটবিগ্রহে জানাচ্ছেন ছলভরা রোষরুদ্ধ প্রার্থনা, -যদি ভোগের বস্তু না আসে সমুদ্রের বালি এনে দেব খাবে, আমিও খাব--বলা বাহুল্য সমুদ্রের বালু দিয়ে মিটাতে হয় নাই অনশন ভক্তের দেওয়া পর্য্যাপ্ত উপচার স্বাগত হয়েই এসেছে দেবঅঙ্গনে···মনে পড়ে গৌরলীলায় ভক্ত ভগবানের দ্বন্দ্ব জগদানন্দ আর মহাপ্রভুর কাহিনী মহাপ্রভুর পদ-সম্বাহন করবেন ভক্ত -তাঁকে লঙ্ঘন করে গেলেন বিনা দ্বিধায় শশী মহারাজও পদস্পৃষ্ট পাত্রের জল দিয়েছেন ধরে, ভগবানের আশু প্রয়োজনে। সুগন্ধি তৈল নিয়েছেন এনে, মহাপ্রভুর অনিচ্ছায় রোষে করছেন অনশন—লীলা একই···

মরুপথে পথহারাকে ডেকে নিতেই ত অবতারের নেমে আসা—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন প্রথম জীবনে দিশাহারা হয়ে ফিরেছেন—দিশারী সেদিন তাকে ডেকে নিতেই বলেন,—দেখ তুই যাকে খুঁজছিস সে এই—এই···। এ যেন বৃন্দারণ্যে বেণুবনের দিশারী বাঁশী--শশী মহারাজের সে পথ-চাওয়া আর ভুল হয়নি কখনও···রামকৃষ্ণানন্দ নামও করেছিলেন সার্থক।

আলমবাজার মঠ

আটচল্লিশ

ব্যথার বারাণসী কাশীপুরের অন্যতম ব্রতধারী ছিলেন গঙ্গাধর মহারাজ। অতি শৈশবেই শ্রীঠাকুরের দৃষ্টি-প্রসাদ পেয়েছিলেন এই চিহ্নিত পার্ষদটি। শিশুসুলভ চাপল্যে কখন দেখা যেত শ্রীঠাকুরের চরণে ঘসে ঘসে রক্তিম করে তুলেছেন ললাটদেশ—কখন বা শ্রীগুরু নির্দ্দেশে দেখেছেন ভবতারিণীর চরণে মহেশের নিশ্বাস-স্পন্দিত জীবন্ত দেহ—কোনদিন বা নির্ব্বাক নিস্পন্দে দেখেছেন শ্রীঠাকুরের নটভঙ্গরূপ—জগজ্জননীর চরণে প্রার্থনারত বিরাট শিশুর অসীম কাঁদনি—শ্রীঠাকুরের সেই আকুল কাঁদনই সূত্র হয়ে দাঁড়ায় সেবাব্রতী স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনে। সেদিন খেতড়ী-রাজধানীতে ঘনিয়ে এসেছে একটি রূপরম্য মধ্যাহ্ন—খেতড়ী প্রাসাদ সংলগ্ন সরোবর কূলে জমে উঠেছে রাখী-বন্ধনের রাজ-সমারোহ—উৎসবে এসেছেন রাজা অজিত সিংহ আর তাঁর অমাত্যবৃন্দ। সহসা এসে দাঁড়ান স্বামিপাদ, পরিব্রাজকের বেশে, তিনি তখন খেতড়ীর অতিথি—নয়নে বেদনোদ্বেল অশ্রুধারা—মহারাজকে জানান দুঃখের কাহিনী—তাঁর বহু আয়াসে গড়ে তোলা গোলাবালকদের বিদ্যাপীঠটি মহারাজের আদেশেই নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর তাই সন্ন্যাসী খেতে খেতেই এসেছেন ছুটে প্রতিকার মানসে। দুর্ভিক্ষের মাঝে মহুলার অন্নদান ব্রতের মূলেও ছিল অন্তরের এই আকুল ক্রন্দন···সারগাছির অনাথ আশ্রমও এই অন্তরের আবেদনে আজও হয়ে আছে প্রাণময়। আর তাঁর সেই সেবামূর্তিই প্রকাশিত হয়েছিল আলমবাজার মঠে যেদিন শ্রীঠাকুর দেখা দেন, নব-নীল-নীরদ-কান্তি গোপাল মূর্তিতে আর নিজের স্বরূপ প্রকাশিত হয় যশোদার মাতৃমূর্তিতে। ঘটে ঘটে এই বালগোপালের সেবাকেই বুকে করে নিয়েছিলেন জীবন ভোর।

শ্রীঠাকুরের দ্বাদশ দিকপালদের মধ্যে খোকা মহারাজ ছিলেন সবচেয়ে ছোট। কাশীপুরের সেবায়তনে সরল প্রাণের আকুলতায় ঔষধ হিসাবে চায়ের ব্যবস্থা ইনিই দেন। রাখাল মহারাজের নিষেধে শ্রীঠাকুরের সেটির আর প্রয়োজন হয়নি।

দুইজনের জীবনে ঈশ্বর দর্শনের প্রশ্নটি পরম প্রশ্ন হয়েই প্রকাশ পেয়েছিল প্রভুর চরণে। একজন শিবাবতার বিবেকস্বামী আর একজন এই সুবোধানন্দজী। শ্রীঠাকুর দিয়েছেন সেই একই উত্তর— দুইজনে একসঙ্গে থাকলে যেমন দেখা যায় সেই রকম সহজ দর্শনেই সাধক হন ধন্য তবে তার জন্যে চাই কান্না— ছেলে যেমন বুক ফাটা কান্না কাঁদে মার জন্যে।

লুপ্তধারা ফল্গুবুকে সেদিন হঠাৎ জাগে মুক্তির উচ্ছ্বাস। সুবোধ মহারাজ চলেছেন অপর পারে। সহসা অসহায় দুটি হাতে প্রণতি ওঠে জেগে — আসন্ন সলিল সমাধিতে তখন তিনি পরপারের যাত্রী - তবে সে ডাক তাঁর তখনও আসেনি। কে যেন তাঁকে তুলে ধরে তরঙ্গের ওপরে। অশরণের শরণ শ্রীঠাকুরই হয়ত ধরেছিলেন সেই শেষ শরণের দুটি হাত। অসময়ে সে প্রণাম ঠাকুর দিয়েছিলেন ফিরিয়ে।

শ্রীহরির প্রবেশমুখ হরিদ্বারে সেবার বেদনা জর্জর দেহে ধরেছেন তৃষ্ণার পূর্ণপাত্র কমণ্ডুল, কম্পিতহাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে যায় সে জলপাত্র— অন্তর মথিত অভিমানে জানান শ্রীঠাকুরকে নিমিলিত নয়নসমক্ষে, স্নিগ্ধ বেশে এসে দেখা দেন শ্রীঠাকুর — জুড়িয়ে যায় সব ব্যথা—মৌন মন্থরে দুটি কথা ওঠে জেগে,—আর ত কিছুই চাই না ঠাকুর, তোমায় যেন না ভুলি! অন্তর্যামীর কাছে অন্তরের এই প্রার্থনা হারায়নি কোনদিন!

কাশীপুরের সেবাযজ্ঞে বাবুরাম মহারাজ ছিলেন শ্রীঠাকুরের দরদী— একান্ত আপন। ভাবমুখে শ্রীঠাকুর একবার বাবুরাম মহারাজকে দেখেন দেবীমূর্ত্তিতে, গলার হার—তাই বলতেন, ওর হাড় শুদ্ধ নৈকষ্য কুলীন। তাই দেখি ব্রজেশ্বরী শ্রীমতির জন্মস্থান বর্ষাণায় তিনি তপস্যা নিরত - ব্রজ- রমণীগণকে করেছেন ভূলুণ্ঠ প্রণাম।

শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বরূপ এই প্রেমিক পুরুষের সবার সঙ্গে মৈত্রীই ছিল জীবনবেদ। পরবর্ত্তীকালে একবার এক শিক্ষিতম্মন্য ভক্ত মঠে আসেন— উদ্দেশ্য মঠের মহন্তদের বৃথা অন্নধ্বংসে দিবেন বাধা। প্রেমানন্দজী তখন মঠের পুরানোমন্দিরে—ভক্তটি সেখানেই এক লাঠি হাতে গিয়ে উপস্থিত। প্রেমানন্দ মহারাজ শান্ত ধীর ইঙ্গিতে তাকে নিয়ে আসেন পবিত্র গঙ্গাকূলে, প্রহারের পরমস্থানের দেন নির্দ্দেশ। দুষ্ট ভক্তটির নয়নাশ্রুতে সুরধুনী

বুকে প্রহার ও প্রহরণ দুয়েরি হয় চিরনির্ব্বাণ। প্রসাদ আর প্রেমালিঙ্গন এই ছিল প্রেমানন্দের জীবন-মাঙ্গলিক। জ্ঞান আর প্রেমের মিলনমোহনা রচিত হয়েছিল তাঁর জীবনে কি এক সীমাহীন রহস্যে। তাঁর প্রেমাভক্তির কাতর নিবেদন—শ্রীঠাকুর মার কাছে দেন পৌঁছে – চিররহস্যময়ী দেন উত্তর —ওর প্রেম হবে না, জ্ঞান হবে। এদিকে মার নর্ম-সহচরী রূপেই শ্রীঠাকুর দেখেন তাঁকে ; হয়ত জ্ঞান-ভক্তির সঙ্গমে সীমার কলঙ্করেখা যায় হারিয়ে।

তরঙ্গছন্দিত দক্ষিণেশ্বর—শ্রীঠাকুরের মন্দিরে সেদিন বাবুরাম মহারাজ আছেন শুয়ে। শ্রীঠাকুর অর্দ্ধবাহ্যে অশান্ত শিশুর মত স্খলিত চরণে বলে চলেছেন,—দিসনি মা দিসনি—সদ্য নিদ্রাতুর নয়নে এই স্পর্শ যে চিরন্তনী হয়েছিল সেকথা তাঁর সারা জীবনায়নে সহজেই যায় ধরা। স্মৃতির সঙ্গে নিদ্রার সম্বন্ধ যে নিগূঢ়, মনোবিজ্ঞানের ধারায় আর দিব্যজীবনের রস সিঞ্চনে তার প্রয়োগ রহস্য, যেন এক নূতন আলো এনে দিয়েছে শ্রীঠাকুরের এই নিশীথ লীলা। এরই প্রতিধ্বনি দিব্যমুখেই একদিন তিনি শুনেন যেদিন লীলা পোষ্টাইএর নটুয়া হাজরা তাঁকে দেখান সিদ্ধাই-এর প্রলোভন। তাই, সহজ সরল জীবন নিয়ে চিরটি দিন দেন কাটিয়ে— জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সাধনে। শেষজীবনে পূর্ব্বঙ্গে ম্যালেরিয়া-ত্রস্ত গ্রামে কচুরীপানা উদ্ধার কার্যে মরণব্যাধি নেন টেনে।—শ্রীঠাকুরকে বেশ মনে আছে ত বাবুরাম দাদা—শেষের প্রশ্ন করেন ব্রহ্মানন্দজী—প্রসাদ প্রসন্ন ইঙ্গিতেই আসে শেষের উত্তর।

কাশীপুরের সেবাব্রতীদের মধ্যে নিরঞ্জন-স্বামীও ছিলেন আর একজন দিকপাল ঈশ্বরকোটীর থাকের—শ্রীঠাকুর প্রথম দর্শনেই দেন এক পরম-শিক্ষা,—ওরে ভূত ভূত করলে ভূত হয়ে যায়, আর ভগবান ভগবান করলে ভগবান হয়ে যাবি। মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঠাকুর ধরে দেন তাঁর মহৎজীবনের ইঙ্গিত—বলাবাহুল্য ভাগবৎ সত্তার প্রথম পাঠ এই দিনই পেয়েছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

স্বাপিপাদ নিরঞ্জনের সরল সহজ ছন্দের জীবন শ্রীঠাকুরের অজস্র প্রশংসায় পেয়েছিল নান্দী। কাশীপুরে একদিন ঠাকুর বলেন— নিরঞ্জন তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব। অনন্ত ভাবময় ঠাকুর কোন ভাবরাজ্য থেকে

বলেছিলেন একথা, আজ তার দিশা পাওয়া ভার। তবে বোধ হয় স্বামিজীর দ্রঢ়িষ্ট বলিষ্ট শরীর মন যে গভীর গম্ভীর ভাব দিত এনে এ তারই ইঙ্গিত।

সহজ সরল উচ্ছলতায় একবার তিনি চেয়ে বসেন অজপাসিদ্ধি। বহু আয়াসের সাধন এই অজপা, জপময় করে তোলে সাধকের সারাজীবন —হরিময় হয়ে যায় তনুমন—আর জীবন হয়ে যায় অমৃতায়িত।

শ্রীঠাকুরও লীলাচাতুর্য্যে লিখে দেন বীজমন্ত্র—তিনটি দিন রাত্রের অজপায় নিরঞ্জন মহারাজ হয়ে পড়েন দিশাহারা, পলকহীন নিদ্রাহীন নয়নে নয়নময় হয়ে থাকে জপছন্দ, শেষে অতিষ্ট হয়ে ছুটে যান শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে; বলেন,—ফিরিয়ে নাও তোমার জপ—শ্রীঠাকুর বলেন,—তখনই ত বলেছিলাম পারবিনা নিরঞ্জন-স্বামী বলেন,—তখন কি জানি যে ভূতের মত ঘাড়ে চেপে বসবে—সত্যই ভূতাবেশ সহ্য করা সহজ কিন্তু ভূত-ভাবনকে আপন করা যুগে যুগেই বিরল!

শ্রীঠাকুরের প্রীতিতে চিরদিনই ছিল রুদ্র মধুরের আলোছায়া। নিরঞ্জন মহারাজের দৃঢ় শরীর মনে একটা সহজ তেজের বিদ্যুদ্বিলাস দেখা দিত ভাগীরথী বুকে পবনবক্ষে একখানি চলতি নৌকায় সেদিন পড়ে গেছে সাড়া। ভীত চকিত আরোহীদের মধ্যে দেখা গেল নিরঞ্জন-স্বামী রোষরুদ্র মূর্ত্তিতে আছেন দাঁড়িয়ে, নৌকার তখন পাতাল প্রবেশের দশা সেবার বহু আয়াসে শান্ত হন স্বামিপাদ। আরোহীদের মধ্যে কারো মুখে শ্রীগুরুর প্রতি কিছু অযথা উক্তিতে এই তাঁর অনুশাসন,—শ্রীঠাকুর শুনেই হন বিরক্ত। বলেন,—ক্রোধ চণ্ডাল, সতের রাগ, যেন জলের দাগ—আর লোক না পোক, ওদের উপেক্ষা করবি।

শ্রীঠাকুর ভাবে দেখেন—রাখাল, নিরঞ্জন, নরেন এদের পুরুষালিভাব। এই পুরুষকারের অগ্নিমন্ত্র চিরদিন ছিল তাঁর ললাটে লেখা।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তপস্যায় গেছেন কাটিয়ে শেষ পর্য্যাঙ্কে দেখি—হরিদ্বারে গঙ্গাগর্ভে নিঃসঙ্গে, নিঃশঙ্কে আছেন শুয়ে—সেবককে দিয়েছেন সরিয়ে···মহাপ্রস্থানের যাত্রাপথে জ্যোতির শৈলোত্থিত তনু জ্যোতির সমুদ্রে যায় হারিয়ে, শ্রীঠাকুরের দিব্য দর্শনেও ছিল এর নিরিখ।

ঊনপঞ্চাশ

কাশীপুরে জ্বলবার মন্ত্র যাঁরা পেয়েছেন দেহমনে তাঁদের মধ্যে সারদা-মহারাজ ছিলেন একজন—শ্যামপুকুর, কাশীপুর তীর্থের এঁরাই ছিলেন তৈর্থিক—গৃহে শাসন-তন্ত্রের জীবন সত্ত্বেও। সারদাপ্রসন্নের নীড় বৈরাগী মন গৃহবন্ধনকে কোনদিনই নিতে পারেনি মেনে। শ্রীঠাকুরের অসুস্থতাতেই দিকহারা খেয়ার মত ছুটে গেছেন অনির্দ্দেশের দিশায়—ভয়ে শ্রীঠাকুরকেও দেননি জানতে। পুরীর পথে, এই যাত্রায় ঘটে এক পুণ্যদর্শন। চলার পথে প্রথম পাথেয় বৈরাগ্যের আকুলতা—সেই সম্বল করে চলেছেন ক্ষুৎ-পিপাসাতুর সারদাপ্রসন্ন—অবসন্ন নয়নে নেমে এসেছে অরণ্যের আর্ত্তরাত্রি—নিরুপায়ে উঠে পড়েন বৃক্ষে—শ্রান্ত স্মরণে জেগে থাকেন শ্রীঠাকুর। নিদ্রানিমিল নয়নে বালক সহসা শোনেন কার অতি প্রার্থিত বাণী,—সন্ন্যাসী ঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েছে? এই বাতাসা নিয়ে খাও—সঙ্গে এক ঘটি জলও দিল ধরে—কিন্তু এই অসময়ের পরম অচেনা বন্ধুকে কিছুতেই পারেন নি ধরতে—ভোরের আলোতেও। সারা বিশ্বকে যিনি আছেন ধরে তাঁকে ধরা বিশ্বাতীত কাহিনী।

শ্রীমার সেবায় সেদিন সেবকপ্রাণে ঘটাল এক অঘটন—সেদিন রাত্রে মা চলেছেন জয়রামবাটী—প্রহরায় চলেছেন সারদা মহারাজ। সহসা চৈতন্যময়ীর হল নিদ্রাভঙ্গ। তিনি চেয়ে দেখেন ত্রিগুণাতীত নাই সঙ্গে—অদূরে খাদের মধ্যে আছেন শুয়ে—মার কষ্ট হবে খাদে যদি গাড়ী যায় পড়ে—উঠিয়ে নিয়ে আসেন—অবুঝ সন্তানকে।...মা চেয়েছেন ঝাল লঙ্কা—আর একবারের কথা...শ্রীঠাকুরের কথা ছিল. মা আমায় শুক্‌নো সাধু করিস্ না—তাই খাবার ব্যঞ্জনে সম্বরা এ সব দেবার কথায় বলতেন,—ওটী বাদ দিও নি ওই খেতেই ত দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। যাই হোক ঝাল লঙ্কার সন্ধানে চলেছেন সন্তান সারদা—বাগবাজার থেকে ঝাল চেখে দেখতে দেখতে, পছন্দ করতে করতে এসে পড়েছেন বড়বাজারে তখন রসনায় আর রস পাবার মত অবস্থা নাই—পুরীর আনন্দবাজারে প্রসাদ চাখতে চাখতে পেট ওঠে

পুরে—সারদাপ্রসাদের কিন্তু জিভই গিয়েছিল পুড়ে। অভয় মন্ত্রের আমন্ত্রণে একবার ভূত দেখার বাসনা হয়ে উঠে দুষ্পূর—একটি পুরানো বাড়ীর সন্ধানও যায় পাওয়া—অন্ধকার না হলে এইসব অন্ধকারের অধিবাসীদের দর্শন দুর্লভ —তাই রাত্রির অপেক্ষা করেছেন দর্শন রহস্যাতুর সারদাপ্রসাদ—দ্বিতীয় যামে এক ক্ষীণ আলোর মণ্ডলে প্রকাণ্ড চক্ষু তাঁর দিকে ছুটে আসতে থাকে—সাহস তখন অসহ হয়েই পড়েছে—সহসা শ্রীঠাকুর প্রকাশ হয়ে বলেন—নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করা মূর্খের কাজ—পরমরহস্যকে ছেড়ে রহস্য করার পিছনে থাকে অনেক অঘটন—এইটাই হয়ে যায় ভুল।

সেবার কৈলাস-মানসের পথচারী স্বামীপাদ—সঙ্গে সম্বল শ্রীঠাকুরের অভয়-মন্ত্র। চলতি পথে নেমে এসেছে ভীতিনিমিল সন্ধ্যা—সামনে স্রোতোচ্ছল পাহাড়ী পল্লল অদিশার এক সর্বনাশা মোহ আছে, নিশির ডাকের মত। এর ডাকে কত ঘরছাড়া, কত আর্ভিন, ম্যালোরি দিয়েছে সাড়া জীবনান্ত পণে, তার নেই ইয়ত্তা -উপলছন্দা নির্ঝরিণীর উপর ম্লান সন্ধ্যার পুরবীতে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক মরণমোহ যাকে ঠেকিয়ে রাখা দায়—এই মোহই ত জীবন, আবার এই মোহই এনে দেয় মৃত্যু! ছুটে চলেন স্বামিপাদ—উপরে ভগ্ন সেতু, নীচে নির্ঝরিণীর স্বপ্নভঙ্গ রঙ্গ—ভাঙ্গা ভাঙ্গা সেতুপথে পায়ে পায়ে চলেছেন এগিয়ে—সহসা মেঘের অন্তরালে মলিন চাঁদের আলোও যায় হারিয়ে—থমকিত পায়ে দাঁড়ান সারদাপ্রসাদ—সামনে মৃত্যু—পিছনেও মৃত্যু—নীচে মৃত্যুর আবর্ত্তনৃত্য। সহসা অমর্ত্তের দিশার মত উর্দ্ধ হতে আসে অমৃতের বাণী,—আমার অনুসরণ কর। ভয়ার্ত্ত পার্থের কানেও এমনই অভয়বাণী দিয়েছিলেন পার্থ-সারথী,- মাম্ অনুস্মর যুগে যুগে পার্থ-সারথিই ত দাঁড়ান জীবনের ভগ্ন সেতুর পুরোভাগে, অভয় ইঙ্গিতে।

বরানগর মঠে আর একবার শ্রীঠাকুরের কৃপার সাগর উঠেছিল উথলে। বরানগর মঠে তপস্যার আগুনে তখন সমিধ হয়ে জ্বলছেন সবকটি দিকপাল —সহসা নিদ্রামথিত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন শ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল,—ওরে সারদা যাস্নি যাস্নি—নিরুদ্ধ বেগ নিয়ে ফিরে আসেন

সারদা···শ্মশানের ভয়াল্ক সাধনে সেদিন ছিল তাঁর অভিসার রাত্রি—আর ঠাকুরই জানান নিষেধ।

চির-ভয়াতীত এই ত্রিগুণাতীতই হাসিমুখে নিজের মৃত্যুর দিন দিয়েছিলেন নির্দিষ্ট করে, বিবেকস্বামীর জন্মতিথি পার করে। যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক উন্মত্তের বোমার আঘাতে সেদিন শায়িত ছিলেন বেদনার বেদীতে—কর্মবীরের উপযুক্ত মৃত্যুই তিনি পেয়েছিলেন। ধর্মের ইতিহাসে এঁরাই শহিদ—প্রেমের সমিধে আহুতি হয়ে এঁরাই যুগে যুগে নিত্যানন্দ, দয়ানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ।

বরাহনগর মঠ

পঞ্চাশ

কাশীপুরের সেবা-সম্পুট যাঁরা করেছেন রচনা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঠাকুরের একান্ত আপন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর তাঁকে নিয়েছিলেন চিনে, মানসপুত্র বলেই।

বিষয়ীর সঙ্গ শ্রীঠাকুরকে বিশেষ কষ্ট দিত, দিত জ্বালা। বলতেন,—মা বিষয়ীদের হাওয়া আর সহ্য করতে পারি না, জিভ পুড়ে গেল—বিষয়ীদের হাওয়া পাছে লাগে বলে গায়ে পুরু কাপড় জড়িয়ে থাকতেন।

দার্শনিক হোয়াইট্‌হেড্‌ বলেন,—সমস্ত জগৎটাই সহানুভূতিময়—জড়, জীব সবাই্ এক অসীম স্নেহরসসিক্ত··· একথা শ্রীঠাকুরেরই কথার প্রতিধ্বনি,—জগৎটা যেন তাঁতে জ্বরে রয়েছে—তাঁর প্রেমে বিভোর—এই অনুভূতির কথায় দার্শনিক বলেন,—এক বস্তু আর এক বস্তুর প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করে, একটা প্রিহেন্‌শন্‌ই তাকে অন্য বস্তুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, তাই দেখি--ভোরের সুরে পাখীর কুলায় সুর জাগে--ঋষি সত্রে ঝঙ্কার ওঠে·· সহনাববতু—সহনৌ ভুনক্তু···তাই শুনি ঈসামসির কণ্ঠে,—নিষ্পাপ শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, স্বর্গরাজ্য তাদেরই। শ্রীঠাকুর ডাকছেন কুটীর ছাদে, আর্ত্ত তৃষ্ণায়,—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, আমি যে আর থাকতে পারি না। তাই একদিন দেখেন পঞ্চবটীর কল্পমূলে দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর সুন্দর--আর একদিন দেখেন ভবতারিণী সেই কিশোর কুমারকেই দিলেন কোলে ; বললেন,—এইটি তোমার পুত্র···আরও একদিন দেখেন সুরধুনী আলো করে ফুটেছে এক আলোর শতদল ; আর তারি বুকে দলমল রূপে দাঁড়িয়েছেন আলোর দুলাল ব্রজরাজ স্বয়ং, আর হাত ধরে নুপূর সিঞ্জিত চরণে দাঁড়িয়েছেন রাখাল-সখা—রূপে রূপময়···

এই দিনেই রাখাল মহারাজ এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, আর এসেই চিনেছিলেন নব-ব্রজেশ্বরকে সুরধুনী কূলে।

ব্রজলীলায় সুবল সখারা এসেছিলেন প্রারম্ভলগ্নে—তাই কৈশোর লীলাই হয়েছিল রসপুষ্ট।···মহাপ্রভুর গম্ভীরা আর নদীয়ার লীলা পুষ্ট করতে যে সব পার্ষদরা এসেছিলেন তাঁরাও ছিলেন সমকালের। এবার কিন্তু পার্ষদরা এলেন বিদায় গোধূলীতে—লীলাপাটের শেষ পটক্ষেপে ; মাত্র বছর পাঁচের মধ্যেই পার্ষদরা চিরবাঞ্ছিত থেকে হলেন চিরবঞ্চিত। বোধ হয় কর্মপদ্ধতির জয়শ্রীতে এবার পুরুষার্থের প্রয়োজন ছিল বেশী তাই পার্ষদদের হয়েছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। ভক্তবীর গিরীশ ঘোষ যেমন বলতেন,—এবার বুঝি জগৎ উদ্ধার। পার্থের এবার সত্যকার বিশ্বরূপ দেখার পালা, আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়—তাই পার্থসারথী গেলেন সরে। সরাতে হয়েছে সখ্যমধুর প্রকাশ ব্রজের রাখালের সঙ্গে। এবার লীলার ছন্দে এসেছিল অন্যরূপ—ব্রজরাজ এবার মাতৃরূপে নিলেন ব্রজের রাখালকে। তাই দেখি রাখাল মহারাজ যখন তখন বসে পড়েন শ্রীঠাকুরের কোলে—সুরু করে দেন দুধ খেতে। শ্রীঠাকুরও ক্ষীর, সর, ননী ধরে দেন তাঁর মুখে—সংকোচের কোন বালাই নাই কারো। শ্রীঠাকুরের মানসপুত্রের জন্য হতেন আকুল, বলতেন,—মা রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে আর ওদিকে রাখাল মহারাজও গৃহকোণে হতেন সারা—ছুটে আসতেন আর্ত্তশিশুর আকুলতায়—এই বাৎসল্যের টানেই গঙ্গার কূলে ঠাকুর ডেকেছেন,—ও গৌরদাসী আয় না, রাখালের খিদে পেয়েছে। গৌরীমাও রসগোল্লা হাতে এসে নেমেছেন নৌকা থেকে।

···যখন মন উর্দ্ধভূমিতে উঠতে হয়েছে অক্ষম, যখনই মনে ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার শ্রীঠাকুর তখনই অমৃত স্পর্শে এনে দিয়েছেন এগিয়ে যাবার আনন্দ—যুগে যুগে চরৈবেতি মন্ত্র যে তাঁরই দান।

শ্রীঠাকুর তাঁর মানসপুত্রকে শব্দব্রহ্মের মহিমা শুনিয়েছিলেন বিহ্বল কণ্ঠের বেদ গাথায়। আবার যোগৈশ্বর্য্যের প্রকাশে রাখাল মহারাজের স্বচ্ছদৃষ্টি নির্বাধে অন্যের অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করতে পেরেও অক্ষম হয়েছিল শ্রীঠাকুরেরই কৃপায়। শ্যামপুকুরের শ্যামা পূজার রাত্রি তাঁর কাছে এনেছিল নবরাত্রির ছন্দ—সেদিন শ্রীঠাকুরের মাতৃমূর্ত্তিতে দর্শন

করেছিলেন বিশ্বমাতৃকার বিরাট রূপ। এই মহামাতৃকার পূজাই তিনি করেছিলেন ঘটে ঘটে সারা জীবন। এই কাশীপুরেই শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতেই স্বামিজী তাঁকে রাজা আখ্যা দেন—ভাবী সঙ্ঘনায়কের এই প্রতিষ্ঠা শ্রীঠাকুরেরই ইঙ্গিত।

শেষের সুরে সেদিন মিলেছে প্রথম দিনের সুর। শেষ পর্য্যায়ে বলছেন,—এই যে পূর্ণচন্দ্র—রামকৃষ্ণ, রাখাল কৃষ্ণ—আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দাও, আমি নাচবো, কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো...নাচতে নাচতেই গেছেন চলে—রাখালরাজের কাছে।

শ্যামপুকুরের বাড়ী

একান্ন

কাশীপুরের সেবা-শতদল তখনও অফুট কুঁড়ি—তখনও সবে দখিণ হাওয়ার নাচন হয়েছে সুরু। আজকের আনন্দছন্দ তখন শিব-জটায় আপনহারা জাহ্নবী। স্বামীপাদ যোগানন্দ সেই সুখের সত্রেই দিয়েছিলেন যোগ।

সাবর্ণি চৌধুরী বাড়ীর ছেলে—দীর্ঘায়ত সুগৌর দেহছন্দে, শান্ত করুণার্দ্র চোখে, এমন একটা সুষমা ছিল—এমন একটা মহিমা ছিল যাতে সাধারণ মনে একটা সম্ভ্রম না জাগিয়েই পারত না। বংশের গৌরবে শ্রীঠাকুর বলতেন,--এরা এককালে জাত দিতে নিতে পারতো। কলিকাতা এককালে এদের ইজারা ছিল।

বেদনামুদিত নয়ন মেলে সেদিন শ্রীঠাকুর জানান,--পালো দেওয়া ক্ষীর খাবো। প্রয়োজন যে কার সেকথা বুঝা কঠিন।.. মনে পড়ে দখিণাপুরে সে এক তমসার রাত্রি—সহসা শ্রীঠাকুর জানান,—ওরে রামলাল! আমার যে খিদে পেয়েছে, কি হবে? শ্রীমা ছিলেন নহবতের নর্মকোণে—সংবাদ গেল সেখানে। কাঠকুটো জ্বেলে সুরু হয় অন্নপূর্ণার অন্নদান ব্রত। বড় একবাটী হালুয়া হল তৈরী। গোলাপমাও ছিলেন উপস্থিত। তিনি ধরে দেন সেই সম্পুট শ্রীঠাকুরের সামনে। ভয়ার্ত্ত চোখেই দেখেন—ঠাকুরের আহার না কুণ্ডলিনীকে নিবেদন! আরো মনে পড়ে মহাপ্রভুর মধ্যলীলা, অদ্বৈতগৃহে—

আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চুয়ান্নবার।
এক বারে অন্ন খাও শত শত ভার॥ চরিতামৃত

আবার মনে পড়ে যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর ব্যবস্থায় শ্রীঠাকুরের বিরাট ক্ষুধার বিরাট আয়োজন। মনে পড়ে কামারপুরে নিশীথ নিরালায় এক রেক চালের অন্নগ্রহণ। বাহান্নপর্ব ভোগেও যে হয় না জগন্নাথের তৃপ্তি!

সেদিন যোগীন ছুটে যায় কলিকাতায় পালো ক্ষীরের প্রয়োজন মিটাতে। যোগীন মহারাজের বিচারশীল মনে জাগে এক চিন্তা—বিশেষ রোগখিন্ন

দেহে বাজারের মিষ্টে হয়ত দেবদেহ হবে কুপিত। দেবদেহের ক্ষুণ্ণতা তখন সকলেরই অন্তরের অন্তরকে করছে ব্যথিত। তাই মহারাজ বলরাম মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হন। ত্যাগে, বৈরাগ্যে, ভক্তিপ্রীতিতে এইটি ঠাকুরের আড্ডা —তাঁর বৈঠকখানা।

যাই হোক ভক্তগৃহে সানন্দে এই সংবাদ গৃহীত হল, কিন্তু ক্ষীর প্রস্তুতে হয়ে যায় বেলা। স্বামিপাদও বেলা চারটার সময় সেই ক্ষীর কাশীপুরে উপস্থিত করেন। শ্রীঠাকুরের কিন্তু সে ক্ষীর আর গ্রহণ করা হয় নাই। হয়ত গুরুবাক্য লঙ্ঘনের এই ফল—হয়ত গোপালের মার মহিমাকে করতে চেয়েছিলেন আরো উজ্জ্বল। কারণ সে ক্ষীর শ্রীঠাকুর গোপালের মাকে দেন গ্রহণ করতে—বলেন,—ওর অন্তরে গোপালই ভরে আছে।

স্বামিপাদের বিচারশীল মন একাধিকবার শ্রীঠাকুরের পরীক্ষায় হয়েছিল উদগ্র। দক্ষিণেশ্বরে তখন যাতায়াত সদ্য হয়েছে সুরু। বয়স অল্পাধিক পনেরো। পঞ্চবটী মূলে সাধুদের যোগাদি ক্রিয়ায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীঠাকুরের কাছে গেছেন ছুটে—শরীরের প্রক্রিয়ায় মনকে শুচি সুন্দর যদি বা যায় করা। শ্রীঠাকুর অকৈতবে হরিনামের মাহাত্ম্যই দেন ধরে। নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে চিরদিনই সজাগ ছিলেন স্বামিপাদ। তিনি ভাবলেন হয়ত শ্রীঠাকুরের ওসব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নাই কোন পরিচয়—তাই সহজ পথেই চান নিয়ে যেতে। তবু ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সন্দেহ দোলায় নামই যান করে, গুরুবাক্য অলঙ্ঘ্য ভেবে। অল্পদিনেই হরি নামের অমোঘ ফলে হলেন পরিতৃপ্ত। ..নিশির ডাকে না নিশার ডাকে যোগীন মহারাজ আছেন দাঁড়িয়ে, দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে গভীর সংশয়। করুণাবতারের নাই কৃপার পার--তিনি স্নিগ্ধ হাসিতে তুলে নেন সব কাঁটা। বলেন,— সাধুকে দিনে দেখবি, সাধুকে রাত্রে দেখবি, তবে সাধুকে বিশ্বাস করবি।

সেবার কবিরাজের বিধানে লেবুর হল প্রয়োজন। নিয়ে আসেন যোগীন মহারাজ নিত্য। একদিন কিন্তু শ্রীঠাকুরের হাত আর ওঠে না। সংবাদে জানা গেল ফলটি বাগানের মালিকের অগোচরেই হয়েছে আনা।

শ্রীঠাকুরকে কুশাগ্র বুদ্ধি দিয়ে বিচারে আর একবার যোগানন্দ মহারাজ পড়েন বিপাকে। সেদিন মার মন্দিরের বরাদ্দ প্রসাদ ঠাকুরের ঘরে

এসে পৌঁছয়নি। ঠাকুর হয়ে পড়েন চঞ্চল। যোগানন্দজী ভাবেন হয়ত ঠাকুরের চালকলা বাঁধা অভ্যাস তাই এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নিজে ত নিতেনই না ওসব কিছু। যাই হোক ভুল ভাঙ্গলো যখন ঠাকুর বুঝিয়ে দেন ধর্মের গূঢ়গহন রহস্য। বলেন,—রাণী রাসমণি-মার দেওয়া জিনিষ ভক্তরা খেলে সার্থক হবে তাঁর দান। ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান; যে তিনে এক, একে তিন।

কাশীপুরে সেবার অত্যধিক সৌকর্য করতে গিয়ে যোগীন মহারাজ অসুস্থই হয়ে পড়েন। ঠাকুরও বিশেষ দুঃখিত হন সেবকদের অসুস্থতায়। সময়ে খাওয়া এই পর্য্যায়েই হয় সুরু।

ঠাকুরের কাছে স্বামিপাদের হয়নি দীক্ষা। এরও প্রয়োজন ছিল। মার এমন একনিষ্ঠ সেবক আর ত দুটি ছিল না। মার বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজায় বাসনমাজার কাজ মা নিয়েছিলেন নিজে—বিবেকস্বামী তাই বলতেন,—জগজ্জননী সাধ করে বাসন মাজছেন, ঘর নিকুচ্ছেন। ভাবতে সত্যই বিস্ময় লাগে, তিব্বত থেকে হলিউড পর্য্যন্ত যাঁর পূজার ব্যবস্থা—তাঁকে কি-না করতে হয়েছে। যোগেনস্বামীর এটি সহ্য হয়নি। তিনি কাঠের বাসন করে দিয়েছিলেন যাতে মার কষ্ট না হয়। আরো, পূজার জন্য কয়েক বিঘে জমি দিয়েছিলেন করে। মার প্রয়োজন হবে বলে একটি পয়সাও বৃথা খরচ করতেন না, রেখে দিতেন জমা করে। মনে হয় ঠাকুর মাকে একান্ত আপন করে দেবার জন্যই নিজে দেননি দীক্ষা—আর দীক্ষার আদেশ তিনবার তিনি পেয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে। রামকৃষ্ণ-সারদাগত এমন একটি প্রাণ যুগে যুগেই একা।

বাহান্ন

ভক্তভগবানের লীলা বিচিত্র। তার চেয়েও বিচিত্র ভগবানের নরলীলা...মহাপ্রভুর দন্তে তৃণ নিয়ে দ্বারে দ্বারে দাস্যভক্তির ভিক্ষা আমরা আকুল হয়ে শুনি...দক্ষিণেশ্বর লীলায় দেখি ভগবান কত দীন হতে পারেন—সাবর্ণি চৌধুরীদের ছেলে যোগেনস্বামী—সহজেই বংশ-গৌরবে আকাশ দেউল—সহজেই দক্ষিণেশ্বরে আসা যাওয়া কম। সেদিন গর্বগতি নিয়ে পাদচারণ করছেন দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে, এই অবস্থায় ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার কথায় ঠাকুর বলতেন,—হাতে ষ্টিক নিয়ে বাবু পাইচারী করতে করতে বলছেন,—ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন। যাই হোক দিনান্তের আতপ্ত বেলায় যোগেন মহারাজ দেখেন—দীন বেশে, আপনহারা চলেছেন শ্রীঠাকুর—একান্ত আপন করার উদভ্রান্তের সে চলা—সব দিয়ে সব নিয়ে নেবার সে চলা,—শ্রীঠাকুরের হল রূপায়ণ, ধরলেন মালীর বেশ, দিব্যতম এক মালী।

যোগেন স্বামী পারেন না ধরতে ঠাকুরকে—চেয়ে বসেন ফুলের তোড়া। শ্রীঠাকুরও পরম শিষ্টের মত দিয়েছিলেন হাতে তুলে সেই ফুল—শ্রীঠাকুরের মুখের কথা,--ওরে কুশী লব, কি করিস গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে—ধরা দিতে এসেও অধরা হওয়ার এই লীলা, না অহংটুকু নিলেন কেড়ে—কে জানে?

আরো একটি দিনের কথা, যোগেন স্বামী গেছেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরের দ্বারে—দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় আছেন দাঁড়িয়ে-- সহসা ডেকে পাঠান দ্বন্দ্বহারী শ্রীঠাকুর,—বাইরে যারা আছে তাদের নিয়ে এসো ডেকে...অতি-পরিচয়ের মাঝে থাকে অতি অভিমানের রহস্য। তাই কি সে বাধা ভেঙ্গে দিলেন এক মুহূর্ত্তে। ডেকে বলেন,—তবে ত তুমি আমাদের চেনা ঘর গো—তোমাদের বাড়ীতে তখন কত যেতুম—কত ভাগবৎ পুরাণ পাঠ হত—বেশ আধার, খুব হবে।

শ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরই এই চিহ্নিত পার্ষদটি নেন শ্রীমার সেবাধিকার। সেবার বৃন্দাবনের পথে হল বিষম জ্বর বিকার—তিনি তখন ট্রেনের কামরায়। ভাবছেন শ্রীমা আর তাঁর গোষ্ঠীবর্গকে কেমন করে শ্রীধামে দেবেন পেঁৗছে। সহসা এক দিব্য-দর্শনে ভেঙ্গে যায় সব ভয়, সব ভাবনা। দেখেন শ্রীঠাকুর দিব্যরূপে আলো করে আছেন বসে আর সঙ্গে আছেন এক মাতৃমূর্ত্তি আর এক বিকট পুরুষ। বলেন তিনি,—তোকে দেখে নিতাম ; তবে শ্রীঠাকুরের জন্যই কিছুই করা হোল না। তবে এই বেটীকে কিছু রসগোল্লা দিস্।—এরপর তাঁরা জয়পুরে এই শীতলা দেবীরই পান দেখা কোন এক মন্দিরে, আর নিকটেই রসগোল্লারও এক দোকান দেখেন...দিব্যলীলার পূর্ব্বাপর সব যেন ঠিক করাই থাকে।

জীবন-মরণের ব্যূহমুখে সেদিন দাঁড়িয়েছেন জীবন্মুক্ত এই পুরুষ। পিতামাতাকে জানান অন্তরের আশীর্ব্বাদ মুক্তানন্দে,—সামাজিক সব বাধাই গেছে ছুটে। শিবানন্দ মহারাজ যখন বলেন,—শ্রীঠাকুরের কথা মনে আছে ত যোগেন ভাই ? ব্যাধির সহস্র-শর-জর্জর দেহে সেদিন উত্তর দেন, —আরো বেশী—আরো বেশী করেই মনে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেবদেহে ব্যাধির সঞ্চারে প্রথম ক্ষণে যাঁরা তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়ান, তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান অংশ নিয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। আঠারশত পঁচাশির এপ্রিলের তখন প্রথম মুখ—শ্রীঠাকুরের অসুস্থতার প্রথম সঞ্চার। স্বামিপাদ সেদিনও কালীপ্রসাদ। দুর্গাচরণ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে তিনিই শ্রীঠাকুরকে নিয়ে আসেন, লাটু মহারাজও ছিলেন সঙ্গী-সহায়। পানিহাটী মহোৎসবে কালীপ্রসাদও শ্রীঠাকুরের লীলাসঙ্গে হননি বঞ্চিত। কারণে বা অকারণেই তাঁর প্রকাশ কথামৃতে দুর্লভ হয়েই আছে। পরবর্ত্তীকালে রহস্য করে যেমন বলতেন, —আমরা ইত্যাদির দলে পড়ে গেছি। শ্যামপুকুরের বিষাদ-নাট্যেও গৃহমেধী মন বিসর্জন দিয়ে, কালীপ্রসাদ ছিলেন উপস্থিত। নরেনস্বামীর নির্দেশে তাঁর সেবাধিকার ছিল চার ঘণ্টা, দিনেরাত্রে মিলে—কাশীপুরের দ্বিতলে গাড়ীবারান্দায় শ্রীঠাকুরের স্নান পুণ্যে হতেন সহায়—আতপতাপে করতেন দেহের পরিচর্য্যা।

কৃপায় না অকৃপায় সেবার দেবতার কাছে থেকে কালীপ্রসাদকে নিতে হলো বিদায়। জননী নয়নতারা তখন পুত্রের অদর্শনে একান্ত আকুল—মার বুক নিঙরে চোখে নেমেছে অশ্রুর প্লাবন—পিতা বহন করে আনেন সে বার্ত্তা—শ্রীঠাকুর স্বামিপাদকে দেন গৃহে পাঠিয়ে। প্রতিকূল আবেষ্টনীরও প্রয়োজন সাধন রহস্যে। গুরুবাক্যে স্বামিপাদও যান জননীর সান্ত্বনায়—সহসা মাতৃগৃহে শরাহত মন নিয়েই ছুটে আসেন—পড়েন শান্তিময়ের চরণে, নয়নে ভয়ার্ত্ত আকুতি—পরমানন্দের গৃহ, সে যে তাঁর কাছে ভয়ের অরণ্য হয়েছিল।

মাস্তুলের পাখী হয়ে একবার কাশীপুর থেকেই স্বামিপাদ ছুটে যান অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে—ইচ্ছা হঠযোগের কিছু প্রক্রিয়া নেবেন শিখে – আজন্ম যোগী যে নিজে। শ্রীঠাকুর বলতেন,—ও আর জন্মে একজন বড় যোগী ছিল—তাইত ওকে বেঁধে পাঠাতে হয়েছে—তাইত জন্মের সঙ্গেই গায়ে দাগ দেখা গিয়েছিল, দড়ি দিয়ে যেন বাঁধার দাগ। হঠযোগীর কাছে এদিকে তাঁর 'কম্‌লী ছোড়তী নঁহীর' অবস্থা হয়েছিল। যাই হোক জল আনার ছল করে পালিয়ে আসেন সে যাত্রা। শীত শীর্ণ চন্দ্রলেখার মত ঠাকুরের দিব্য অধরে জাগে এক টুকরো হাসি—বলেন,—চার খুঁট ঘুরে আয় দেখবি কোথাও কিছু নাই। যার হেথায় আছে তার সেথায় আছে—যার হেথায় নেই তার সেথায়ও নেই—

এই দেব অঙ্গনেই শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তাঁকে বেদান্তের সর্বত্র ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি কি তা দেখিয়ে দেন। সহসা সেদিন অসহ যন্ত্রণায় শ্রীঠাকুর বলেন,—দেখ দেখ বাইরে ঘাসের উপর কে যেন চলে যাচ্ছে– আমার বুকের ওপর দিয়ে যেন যাচ্ছে—বারণ কর! দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য তীর্থেও এমনি অনুভূতির কথা আমরা জানি—

ভবনদীতেই যেন সেদিন মাছ ধরছেন—দুই স্বামিপাদ, অভেদস্বামী আর বিবেকস্বামী। কাশীপুরের দিব্য উদ্যানের কাকচক্ষু পুকুরে বসেছেন দুই দিব্য শিকারী। প্রাণে গীতার মন্ত্র তখন অনুরণিত হচ্ছে—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে; শ্রীঠাকুরের দৃষ্টি এড়ায় না—ডেকে পাঠান তিনি—অনাগত দিনের

আচার্য্য যে তাঁরা—জগৎগুরু বলেন গুরু-গম্ভীরস্বরে,—দেখ্, বঁড়শিতে টোপ্ দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা—এ যেন বন্ধুদের ডেকে খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়া—সহজে শুনতে চান না দিক্-পালরা—শেষে পরাজ্ঞানের পরম পথই দেন ধরে—বলেন,—ধ্যান কর—বুঝতে পারবি—তিন দিন ধ্যানের পর বুঝতে পারেন তাঁরা শ্রীঠাকুরের বেদবাণীর স্বরূপ।

মনে পড়ে দর্শনের একমতে সমস্ত জ্ঞান আমাদের অন্তরেরই ধন—সে যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সক্রেটীস্ এই তত্ত্বের দিয়েছিলেন প্রমাণ—নিরক্ষর এক অনার্য্য বালকের মুখে জ্যামিতির এক দুরূহ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন উদ্‌ঘাটিত।

এই দিব্যধামেই বিবেকস্বামিপাদ এক অদ্ভুত অনুভূতির প্রকাশ দেখান কালীমহারাজকে। সেদিন বিবেকস্বামীর দক্ষিণ জানু স্পর্শে কালী-মহারাজের এক দিব্য কম্পন হয় উপস্থিত—পরবর্তীকালে যে দিব্যশক্তি বীরসন্ন্যাসীর দেহমন হতে বিচ্ছুরিত হত সেই শক্তির প্রথম প্রকাশ এই ভাবেই হয়ত হয়েছিল—আর সে শক্তির প্রথম ধারক হয়েছিলেন দেবসঙ্গী কালীমহারাজ।

শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পরও তাঁর দিব্যসঙ্গ হতে তিনি বিচ্যুত হননি কোন দিনই। মধ্য কলিকাতার এক গৃহে তখন অস্থায়ী আশ্রমের কর্মচক্র প্রসারমুখে চলেছে এগিয়ে। দিবামধ্যে স্বামিপাদ আছেন বসে সমাগত ভক্ত সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে—নিজের জীবনবেদ বলতে গিয়ে বলেন,—দেখ্ শ্রীঠাকুরের কৃপা—সেদিন এই টেবিলে মাথা রেখে ভাবছি—ঠাকুর বোধ হয় আমাদের গেছেন ভুলে, আর তেমন দেখা পাই না কেন—সহসা দিব্যমূর্ত্তিতে শ্রীঠাকুর এসে দাঁড়িয়েছেন, বলেন,—কালী, মনে আছে সেই নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনতে যাওয়া—লোক জমেনি, তাই যাত্রাও তেমন জমতে পায়নি, মনে আছে?—চমক যায় ভেঙ্গে, চকিতে ফিরে আসি বাস্তবে—দর্শন এই ভাবে ভাবলোকেই হয়।

অন্তরঙ্গদের কথায় শ্রীঠাকুর বলতেন,—দেখ, তোদের সঙ্গে আমার জন্মজন্মের সম্বন্ধ। তোরা যেন কলমিলতার দল—তাই বিবেকস্বামীর হাত

ধরে নিত্যসঙ্গীরূপে শ্রীঠাকুর কতদিনই চলেছেন মার্কিণের পথে,---তাই লুসিটেনিয়া জাহাজে অভেদপাদ আরোহণে উদ্যত—দুই দুইবার শোনেন শ্রীঠাকুরের কাছে প্রত্যাবর্ত্তনের বাণী—লুসিটেনিয়ার সলিল-সমাধির বিধি-লিপি সেইবারেরই ঘটনা। ঝুসীর শৈল-শিখরে সেবার শ্রীঠাকুরের কৃপার নিরিখ পান অভেদপাদ। সেবারের পরিক্রমায় সঙ্গী ছিলেন জনৈক নানকপন্থী সন্ত। সেই সঙ্গী সাধকের কুর্মদেবতা দিনান্তে হয়ে পড়েছে একান্ত ক্ষুব্ধ। ভিক্ষান্নের সন্ধানে তিনি তখন উদগ্রীব, পরামর্শও দেন শ্রীপাদকে। স্বামিপাদের অন্তরে তখন গীতার মহাবাণী স্ফুরিত হয়ে উঠেছে—যোগক্ষেমং বহাম্যহম্-- তাই তিনি অটল আসনে গীতা আলোচনায় হলেন মগ্ন—সেদিন বর্ষণখিন্ন দিনান্তে ভক্ত ভগবানের লীলার এক পর্য্যায় হল সুরু। ভক্তের কাছে বারে বারেই দিতে হয় ভগবানকে পরীক্ষা – সব সমর্পণের মন্ত্রে তারা যে নিয়েছে দীক্ষা...। সান্দ্র বর্ষণক্লান্ত দিনের শেষ আলো যায় মিলিয়ে। সাধুদের অন্তর তখন পাঠসুখে আপনহারা। সহসা উচকিত কণ্ঠস্বরে দুই সন্তহৃদয় হয়ে উঠে স্পন্দিত – চেয়ে দেখেন জনৈক ভক্ত একটি ঝুড়িতে প্রচুর উপচার বহন করে এসেছেন সাধু সন্দর্শনে। নানকপন্থী সন্তটীর অন্তর তখন পুলকে উচ্ছল।

সেবার শ্যামপুকুরের লীলাপীঠেই শ্রীঠাকুরের এক দিব্য প্রকাশ হয় মহাষ্টমীর সন্ধিলগ্নে। জগজ্জননী ক্ষণিকের করুণায়িত দৃষ্টিতে যেন চেয়ে দেখেন আর্ত্তধরণীর দিকে---ঘরে ঘরে মার আবাহনের আর্ত্তি মিলিয়ে যায় উর্দ্ধ-গগনে—ভক্তসুরেন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণেও উঠেছে সে আর্ত্তি অশ্রুর অভিষেকে—সহসা শ্যামপুকুরপীঠে ঠাকুর হয়ে পড়েন সমাধিস্থ। নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, এইসব ভক্তেরা মার আবির্ভাবের এই শুভলগ্নকে হেলায় চাননি হারাতে---পুষ্প-সম্ভারে চরণনিকষ হয়ে উঠে সমৃদ্ধ – অনুলোমমুখে বলেন ঠাকুর, – এখান থেকে জ্যোতির পথরেখায় দেখলুম পূজামণ্ডপে মার পাশে অশ্রুপল্লল নেত্রে দাঁড়িয়ে আছে সুরেন্দ্র---তোমরা যাও তাকে আশ্বস্ত করে এস। নিভৃত প্রাণের ব্যাকুলতা দিয়ে সেদিন সুরেন্দ্রনাথের মাকে ডাকা সার্থক হয়েছিল। মা-ই তাকে ঠাকুরের রূপে দেখা দিয়েছিলেন—মহাসন্ধিক্ষণের পুণ্যলগ্নে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গদের নিত্যসম্বন্ধের আরও কত কথাই না জানা গেছে।

সেবার উনিশশত বাইশের এপ্রিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বামিপাদ দেখেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভীষণ অসুস্থ—স্বামিপাদের চারিপার্শ্বে সাধু-সন্তেরা আছেন বসে—উদ্বেল উদগ্রীব, আর ঠাকুরও উপস্থিত আছেন শয্যা পার্শ্বে—বলা বাহুল্য এ দৃশ্য, দীপ নির্ব্বাণেরই দৃশ্য।

পথচারীর রুক্ষ বেশে অভেদস্বামী অনেকদিনই দিয়েছেন কাটিয়ে। সে সব কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাওয়া সম্ভব নয়। বলতেন,—আমি কি লিখে রাখতে তপস্যা করতুম -সেবার প্রব্রজ্যাক্রমে মিরাটের বাগানে এসে আসন করেছেন। স্বামিপাদ বসেছেন একা একটি দেয়াল ঘেসে—ব্যাবৃত চক্ষুঃ সমাধিমুখী—সহসা কে যেন বলে,—সরে বস- সরে বসেন অভেদপাদ—সহসা সেই দেয়ালপাট দমকা হাওয়ায় যায় পড়ে। এ সতর্কবাণী আর কারও নয়—ঠাকুরেরই।

আর একদিনের কথা তখন স্বামিজী নিউইয়র্কের কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক মহিলার গৃহে অতিথি। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরছেন, সহসা জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা, আলাপে কিছু দেরী হয়ে যায়—ফিরেই দেখেন গৃহের ছাদ গেছে পড়ে। নিশ্চিত মৃত্যুর ললাটলিপি শ্রীঠাকুরই মুছে দেন অভয় হাতে। দয়াবতী মহিলাটি সমস্ত শুনে যুক্তকরে অশ্রুলচক্ষে প্রার্থনা করে বলেন,—নিশ্চয়ই আপনার জন্য কেউ প্রার্থনা করেছিল। তিনি জানতেন না যে স্বয়ং ঠাকুরই তাঁর সন্তানদের অভয় ইঙ্গিতের দেবদূত, (guardian angel) অতন্দ্রে নিয়ে চলেছেন জীবনের পথে পথে। পরের একদিনের কথা.. সুইসআল্পসের তুষার ধূসর পথে চলেছেন মগ্নমনে—প্রকৃতির পরমোৎসব দৃশ্যে আপনহারা—সহসা কে যেন হাতে ধরে সরিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূরে—আর সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকাণ্ড পাথরের চাঙড় পড়ে গড়িয়ে—এইটি গায়ে পড়লে শৈলসানুতে নিতে হত চিরসমাধি—চির-আশ্রিতদের, চিরদাসানুদাসদের রক্ষাকবচ তিনিই ত বেঁধে দেন অভয় হাতে।

ঊনবিংশ শতকের পঁচাশী সালের শেষের দিকে একদিনের কথা—বেদনার্ত্তি নিয়ে শ্রীঠাকুর কাশীপুরের অন্তর্লীলায় আছেন শুয়ে—সহসা গিরীশ চক্রবর্ত্তী আর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এসে উপস্থিত—

তর্কালঙ্কার মহাশয় সাধারণের মত 'ভাগাড়দর্শী' ছিলেন না, ছিলেন সত্যসন্ধী. যাবার সময়ে শ্রীঠাকুরের দিব্য অবস্থার কথাই বলে যান।

গিরীশবাবু ছিলেন সারদানন্দ মহারাজের পিতা আর তাঁর গোপন ইচ্ছা ছিল প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের তুলনায় শ্রীঠাকুরের দৈন্য প্রকাশ পেলে পুত্রের মনের পরিবর্ত্তনই হবে কিন্তু বিধাতার বাদে ঘটনা অন্য পথই নেয় সে যাত্রা।

এই কাশীপুরের শেষ আশ্রয়েই শরৎ মহারাজের তিতিক্ষার পরীক্ষা হয় একদিন। সেদিন ভিক্ষান্নের পবিত্রতা প্রসঙ্গে সন্তানদের দেন পাঠিয়ে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে। শরৎ মহারাজের 'নারায়ণ হরির' বিনিময়ে প্রথম ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হয়েছিল রিক্ত তিরস্কারেই। এই তিতিক্ষার দীক্ষা প্রথম জীবনেই শান্ত রসাস্পদে হয়েছিল স্নিগ্ধ। তাই দেখা যায় জীবন মৃত্যুর সীমান্তেও কি তাঁর সমাহিত শান্তি। নিরানব্বই সালের কথা, অধ্যাপক ওকাকুরা এসেছেন জাপান থেকে ভারতের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে। সারদানন্দ হলেন সঙ্গী বুদ্ধগয়ার তীর্থপথে। ফিরে আসার পর বিবেক স্বামিজীকে দেখতে যান কাশ্মীরের ভূস্বর্গে—সহসা অশ্বযানের গতি হয়ে উঠে শঙ্কিল। পাশ-কাটাবার চেষ্টায় গাড়ীটি পাহাড়ী খাদে যায় পড়ে আর পিছনে পড়তে থাকে একটি বড় পাথরের চাঙড়। নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানিতে স্বামিপাদ রইলেন বসে নিষ্পলক শান্তিতে। শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতেই গাড়ীটী একটি গাছে আটকে যাওয়াতে সে যাত্রা সারদানন্দজী পান নিষ্কৃতি।

আর এক বারের ঘটনা—মহারাজ চলেছেন বিলেতে, জলপথে—সহসা সারাসমুদ্র মথিত করে নেমে আসে মৃত্যু তুফান। সহযাত্রীরা সকলেই সলিল সমাধির ভয়ে বড় উদ্বিগ্ন—তাঁর সেদিন নিরুদ্ধ নিষ্পন্দে বসে থাকা সকলের মনেই জাগিয়ে তুলেছিল বিরক্তির সহঘাত—অন্য বারের কথা ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রয়োজনে ডাক্তার কাঞ্জিলাল আর শরৎ মহারাজ চলেছেন বেলুড়মঠে, গঙ্গাপথে—সহসা কালবৈশাখীর ঝড়-তুফানে পড়ে যায় তাঁদের নৌকা—অবস্থা হয়ে পড়ে এখন তখন—সারদানন্দজী কিন্তু নির্বাক নিশ্চিন্তে ধূমপান রত—মৃত্যুর মুখে এ নিশ্চেষ্টতা ডাক্তারকে করে ফেলে বিষম অসহিষ্ণু—হরিতে ধূমপানের সরঞ্জাম পায় গঙ্গাগর্ভে

স্থান। আর একটি ঘটনা, পাহাড়ী চড়াই-এ চলেছেন সারদানন্দজী, সঙ্গে কয়েকজন সহযাত্রী—এদের মধ্যে জনৈকা বৃদ্ধার হাতে কোন যষ্ঠি ছিলনা—এই অভাবে তার চলার কষ্ট দেখে স্বামিপাদ পথের সম্বল লাঠিটি-নিশ্চিন্তে ধরে দেন তার হাতে—এর ফলে কিন্তু পার্ব্বত্য পল্ললে যান পড়ে। আবার দুর্গম জনমানবহীন পথেও পথহারা সারদানন্দ ধ্যানানন্দে গেছেন ডুবে, স্থান কালের বিস্মৃতিতে—সন্ধানরত তুরীয়ানন্দজী এসে দেখেন তুষার-মৌলী আছেন বসে নির্জ্জন গিরি-শৃঙ্গে—শান্ত সমাহিত।

শরৎ মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেছিলেন ঋষি-কৃষ্ণের দলে। শ্রীঠাকুরের এই দর্শনের সঙ্গে পাই পরবর্ত্তীকালের পূর্ণ সমর্থন। তিনি তখন সেণ্টজেভিয়ার্সে'র স্নাতক,—বাইবেল অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট—ফাদার লা ফ্রণ্ট প্রসন্নার্ত্তিতে দিচ্ছেন সে পাঠ। আবার রোম নগরীতে সেণ্টপিটারের গীর্জ্জায়, পিটারের মূর্ত্তির সম্মুখে হয়ে পড়েন সমাধিতে আপনহারা...হয়ত পূর্ব্ব স্মৃতি পথেই হারিয়ে গিয়েছিলেন ঋষিকৃষ্ণের দলের এই প্রাচীন ভক্তটি—

মঠের কর্ম্মসচিব হিসাবে স্বামিপাদের উপর ছিল বিরাটভার, আবার অন্যদিকে শ্রীমার সমস্ত ভারই ছিল এই সন্তানের হাতে—সার্থক-নামা শ্রীপাদ ছিলেন মার দ্বারী আর ভারী দুই·· সেবার শ্রীমার চরণে ব্রণ হয়েছে, অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন-- শরৎ মহারাজ ডাক্তার আনেন ডেকে, কি জানি কেন আর্ত্ত লীলায় শ্রীমা হয়ে পড়েন অবুঝ—মায়ের ভয় দেখে গোলাপমা হন বিরক্ত—তখন ধীর শান্ত মুখে মহারাজ বলেন,—অভয়া যদি ভয় পান মা, তবে সে দোষ কি শরতের ?—শ্রীমার উদ্বোধন গৃহনির্মাণের সব ভার ছিল তাঁর এই ভক্তটির উপর--শ্রীমার সব ভারই ছিল শরতের।

...দীনের আর্ত্তিতে বাল্যেই স্বামিপাদের চিত্ত যেত গলে। প্রতিবেশীর অসহায় পরিচারিকার বিসূচিকা—সেবার ভার নিজের হাতেই নেন স্বামিপাদ। অপ্রবাসী কারও অসুস্থতায় স্বামিপাদই যেতেন এগিয়ে। কাশী সেবাশ্রমের কর্মী, দীননারায়ণের অন্নদান ব্রতে অনিচ্ছুক,—সারদানন্দজী নিজেই তুলে নেন তার ঝুলি।—সেবার গৌরীমা, বসন্তরোগে অসহায়ে আছেন পড়ে—ছুটে গেছেন স্বামিপাদ সেবার আগ্রহে—এমনি কত !

কল্পবৃক্ষের তলায় ভীড় করেছে ভক্তের নানা প্রার্থনা। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, – কিরে তুই যে কিছু চাইলি না। শরৎ মহারাজ বলেন, – কি আর চাইবো, আমি যেন সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি এই করে দিন। শ্রীঠাকুর বলেন, – তা তোর হয়ে যাবে। আমরা দেখেছি এই সাধনার সিদ্ধ হতেই তিনি তান্ত্রিক পূর্ণাভিষিক্ত হন।

কাশীপুরে সেবক সঙ্ঘে শরৎও দিয়েছিলেন যোগ। কিন্তু শ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পর মন দিতে হয় পড়াশুনায়। কিন্তু নরেনস্বামীর প্রেরণায় আবার এঁর মঠে যাওয়া আসা সুরু হয়। পিতা পেলেন ভয়, বাড়ীতে চাবি বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। শেষে ছোট ভাই গোপনে চাবি খুলে দেন, আর তিনিও সুযোগ বুঝে পিঞ্জরাহত পাখীর মত দক্ষিণেশ্বরে ছুটে চলে গেলেন! এঁর পিতা বৃথা চেষ্টা ছেড়ে তাঁর অঙ্কুশহীন যাত্রা পথই কামনা করেছিলেন।

শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর সুরু হল অগ্নি তপস্যা। তারপর সুরু হল দুর্গম তৈর্থিকের জীবন। সময়ে সময়ে গিরিশৃঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিশ্চল ধ্যানে ডুবে গেছেন এমনও দেখা গেছে। আবার শ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা করাও চলেছে এরি মধ্যে। নিঃসঙ্গ পথে মনে মনে ভাবছেন এই সময় যদি গরম হালুয়া লুচি পাই তবেই জানবো শ্রীঠাকুর আমাদের সঙ্গী হয়েই আছেন। অঘটনের ঠাকুর তেমনি সবই জুটিয়ে দেন সেই উপলারণ্যে।

প্রব্রজ্যার পর বিবেকস্বামীর আহ্বান আসে, তিনিও লণ্ডন যাত্রা করেন। এটি ১৮৯৬ সালের এপ্রিলের ঘটনা। এর পর জুন মাসে তিনি মার্কিনের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ এর জানুয়ারীতে তিনি ভারতে ফিরে আসেন স্বামিজীর নির্দেশে। পরবর্ত্তী জীবনে স্বামিজী প্রদত্ত মঠ মিশনের কর্মসচীবের পদে থেকে কাজ করে গেছেন। লীলা প্রসঙ্গ, গীতা তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, এই সব বইও এই সময়ে লিখে ফেলেন।

তাঁর ধীর স্থির নিবাত নিস্কম্প জীবন তাঁর স্থিত প্রজ্ঞতার পরিচয়ই দেয়। শ্রীনগরের পথে একবার ঘোড়ার গাড়ী খাদে গড়িয়ে পড়তে থাকে, তিনি কিন্তু অচঞ্চল মনেই বসেছিলেন। পরে সুবিধামত লাফিয়ে পড়েন। আর একবার ভুমধ্যসাগরে ঝড়ে পড়ে যায় তাঁদের জাহাজ। তিনি নিথরিত

চিত্তে বলেছিলেন। আরও একবার গঙ্গার বুকে তাঁদের নৌকা ঝড়ে পড়ে। তিনি তখন সাক্ষীস্বরূপ বসে একটি গড়গড়া টানছিলেন। সহযাত্রী এরূপ নিস্পৃহতা সহ্য না করতে পেরে তামাকের কল্কেটি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামিপাদ বলেছিলেন— তামাক খাব না তো গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি? এরপর শ্রীমার সমস্ত ভার, কলিকাতায় তাঁর আবাসবাটী, জয়রামবাটীর মন্দির এ সব নির্ম্মাণের কাজ নিয়ে নিজেকে মার দ্বারী করে নিয়েছিলেন। ১৯শে আগষ্ট ১৯২৭ অব্দে এই মহাদীপশিখা রামকৃষ্ণ লোকে মিশে যায়।

শ্রীঠাকুর তাঁকে শিবের আদর্শ নিতে বলেছিলেন, নরনারায়ণের দুঃখ আর্ত্তি আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠই তিনি হয়েছিলেন। গৃহের পর পর বিপদ, আশ্রমের কর্মগহনপথের অশান্তি, দেহের অস্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত মিলে শ্রীঠাকুরের দেওয়া হেম্‌লক্ পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই পূর্ণতা নিয়েই ধীরে এসেছেন সরে—এমনি ধীর নীরব অয়নপথেই গেছেন সব পথের পারে...

স্বামিজীর বাড়ী

তিপ্পান্ন

ভগবান ঈশামসি ক্রুশার্ত্ত হয়ে প্রভুর চরণে চেয়ে নিয়েছিলেন ক্ষমা, দুষ্কৃতকারীদের জন্য—আর এই যুগে শ্রীঠাকুর হাসিমুখে তুলে নিয়েছিলেন ভক্ত অভক্ত সবারই আর্ত্তি, পরম গোপনেই রয়ে গেছে সে কথা,—শুধু একবার মাত্র আমরা পাই তাঁর শ্রীমুখে—মা দেখিয়ে দিচ্ছেন, আত্মা দেহ হতে বেরিয়ে এসেছে, দেখি পিঠময় ঘা হয়েছে—মা দেখিয়ে দিচ্ছেন, লোকে কামনা বাসনা নিয়ে ছোঁয়, তাদের পাপ তাপ নিতে হয়, তাই এই ব্যাধি—কিন্তু দুরপনেয় এই ব্যাধির যন্ত্রণা সইতে গিয়ে রহস্যময় গোপনতায় দেখিয়েছেন কতই আর্ত্তি—সাধারণের মতই হয়েছেন অধীর—সেদিন হরিনাথ এসেছেন কাশীপুরের বেদনার দেউলে। জিজ্ঞাসা করেন শ্রীঠাকুরকে,—কেমন আছেন এখন? লীলার-সায়র-বিহারী বিরসে দেন উত্তর,—বড় জ্বালা, বড় যন্ত্রণা, খেতে পারিনা। হরি মহারাজ উত্তর দেন,—যাই বলুন না মশায়, আপনি শান্তির সমুদ্র—আর গোপন করা হয় না—অন্তরাগে শ্রীমুখ হয়ে ওঠে উচ্ছল, বলেন,—ধরে ফেলেছে...বলা নয়, অমনি সমাধির সপ্তলোকে হয়ে যান উধাও। শিষ্য দেখেন স্বয়ং নারায়ণই শরীরী হয়ে আছেন বসে।

হরিনাথই পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দজী নামে রামকৃষ্ণ ধর্মচক্রে হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ। প্রাচীনপন্থী সাধুর জীবনে তাঁর ছিল আবাল্য অভ্যাস। পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশের উপযুক্ত নিষ্ঠায় বাল্যেই নিয়েছিলেন দীক্ষা। তপস্যার দীপ্তশিখায় চির অমলিনই ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। প্রথম জীবনেই দেখি গঙ্গাগর্ভে কুমীরের মুখে পড়ে আচার্য্য শঙ্করের মত নির্ভয় বিচারে রত—তীরস্থ স্নানার্থীর সতর্ক বাণীতেও হন না অবহিত। বেদান্তের ব্রহ্মসত্য, জগন্মিথ্যা—এই অভীমন্ত্রে সাক্ষাৎ মৃত্যুও সেদিন তাঁকে পারে নাই স্পর্শ করতে।

শ্রীঠাকুর বলতেন—গুরুমুখে শাস্ত্র কথা শুনতে হয়,—তখন হরিমহারাজ বেদান্ত চর্চায় খুবই অভ্যস্ত। একদিন শ্রীঠাকুরের কাছে গেছেন। শ্রীঠাকুর

বলেন,—কি হে তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্ত চর্চা করছ—তা বেশ বেশ—তবে বেদান্ত বিচার ত এই ব্রহ্মসত্য,—জগন্মিথ্যা—না আর কিছু··· স্বামিপাদ বলেন, সেই দিনই শ্রীমুখের কথায় তাঁর গ্রন্থের গ্রন্থি চিরতরেই যায় খুলে আর অনুভূতির তৃষ্ণায় মন হয়ে ওঠে আকুল। এমনি একদিনের কথা—বলরাম মন্দিরে ভক্ত-ভগবানের মিলন-মেলায়, কথামৃতের গঙ্গা যমুনা যাচ্ছে বয়ে। হরিনাথ মহারাজ দ্বিধামথিত মন নিয়ে এসে উপস্থিত। শ্রীঠাকুর দিব্যকণ্ঠে ধরেছেন গান—

ওরে কুশি-লব কি করিস্ গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে।

গানের সঙ্গে নামে প্রেমের অলকানন্দা—আর মহারাজের নয়নেও সেই ব্যথার বাদল—দুঁহুঁ মুখ হেরি দুঁহুঁ আজি কান্দে—
স্বামিপাদের মনের সব দ্বন্দ, বাদল ধোওয়া দিনের মত হয়ে ওঠে স্বচ্ছ, মধুর।

আরো একদিনের কথা···কথা হচ্ছে বেদান্ত নিয়ে। পণ্ডিত বেদান্তের ব্যাখ্যা করে চলেছেন—উপযুক্ত শ্রোতা পেয়ে ব্যাখ্যা উঠেছে বেশ জমে—এমন সময় শ্রীঠাকুর বলেন,—আমার কিন্তু অতশত ভাল লাগে না বাবু—আমার মা আছে আর আমি আছি—বেদান্তী হরিনাথের কাছে সেদিন বেদান্তের পারের তত্ত্বই হয়ে উঠেছিল মূর্ত্ত—মাতৃতত্ত্ব বেদান্তের পারের কথাই যে।

শ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরও তুরীয়ানন্দজী একাধিকবার পরম অনুভূতিতে তাঁর কৃপালাভে বঞ্চিত হননি। উত্তর ভারতের বিবিক্ত-সেবী সাধুর মত নগ্নপায়ে ঘুরেছেন স্বামিপাদ। উজ্জয়িনীর এক বৃক্ষতলে সেদিন ছিলেন সুপ্তিনিষণ্ণ—সহসা কে যেন দেয় জাগিয়ে—জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃক্ষের একটি ডাল পড়ে ভেঙ্গে। শ্রীঠাকুরই তাঁর সন্তানকে এই আশু বিপত্তি থেকে দেন নিষ্কৃতি।

যুক্তরাষ্ট্রের বিদায় আসন্ন রাত্রে সহসা মা ভবতারিণীর দর্শনে হয়েছিলেন ধন্য—মা-ই জানিয়েছিলেন চলে আসার নিষেধ···তবে সেবার বিবেক-স্বামিজীর দর্শনোৎকণ্ঠায় জগজ্জননীর সে নিষেধ নেননি মেনে; বোধ হয় বিবেকস্বামিজীর মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বাভাসই তাঁকে করে তুলেছিল অধীর।

আর একবারের কথা—ঘটনাটি শ্রীধাম পুরীতে ঘটে, অরুণস্তম্ভের সোপানে; সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন—সহসা দেখেন মন্দির আলো করে আসছেন শ্রীঠাকুর—প্রাণের পরম প্রণতি জানাতে গিয়ে ভুল হয়ে যায় সব—মাথা তুলে দেখেন ঠাকুর গেছেন সরে—সম্বিত আসে ফিরে। কিন্তু অতি অসময়ের সে সম্বিত। অদ্বৈত-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েও শেষমুহূর্ত্তে দেখি অক্ষম দুটী হাত তুলে ধরেছেন সমাপ্তির প্রণাম মন্ত্রে,—জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ,...অনির্ব্বাণ শিখা যায় মিলিয়ে সন্ধ্যার শেষ তিমিরে...

শ্যামপুকুরে প্রথম সেবারামে লাটু মহারাজ দিয়েছেন যোগ...পরম নিষ্ঠায়। প্রথম দর্শনের দিন থেকেই শ্রীঠাকুরের সাথে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধ সেবার সম্বন্ধ—ভক্ত রামদত্তের সেবাসম্ভার শ্রীযুক্ত লাটুই আনতেন বয়ে। শুধু সেবা যে এক পরম তপস্যা লাটু মহারাজই তার প্রমাণ। শ্যামপুকুরে প্রভুর সেবার মাঝেও গভীর ভাবস্থ হয়েছেন। সে ভাব ভাঙ্গাতে আবার শ্রীঠাকুরকেই আসতে হত। সেবারে স্থান-মাহাত্ম্যের কথা শোনেন ঠাকুরের মুখে—শুনেই জাগে তীর্থ তৃষ্ণা— শ্রীগুরুর চরণ যে সর্বতীর্থসার একথা সেদিনও লাটুমহারাজ পারেননি বুঝতে—শ্রীঠাকুর দূরে দূরেই রাখেন শিষ্যকে এই ভুল বোঝায়—শেষে শ্রীমার শরণে উদ্ধারপান সে যাত্রা—ভগবান শ্রীগুরুরূপে এই শিক্ষাই দিয়েছেন দ্বাপরলীলায়—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ।—ভাগবৎ ১১।১৭।২৭

উচ্চ ধ্যান-ধারণাই ছিল মহারাজের প্রাণ, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত—আর এই ধ্যান চিন্তার ফলে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা শাস্ত্র মুখে সহজেই পারতেন ধরতে। তাঁর উচ্চ ধ্যান সমাহিত অবস্থায় অনেক সময়ই শ্রীঠাকুরকে বলতে হয়েছে,—লেটো চড়েই আছে, ক্রমে লীন হবার যো—এই অদ্ভুত জীবন-বেদ তাঁর অদ্ভুতানন্দ নামেরই পরিচয়।

কাশীপুরের সেবাসত্রে সেবক লাটুর প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। শ্রীঠাকুরকে একদিন বলেছিলেন,—হাম্‌নে তো আপনার মেস্তর আছে। ভক্তবীর গিরীশ এসেছেন, শ্রীঠাকুরের আদেশ হল,—তামাক সেজে খাওয়া, ফাগুর দোকানের কচুরী নিয়ে আয়।

আর একদিনের কথায় লাটু মহারাজের দিব্য আর সূক্ষ্ম বোধের কথা আমরা পাই। কাশীপুরের থেকে স্বামিজীরা গেছেন বুদ্ধগয়ায়। মনে হবে কি নিষ্ঠুরই না ছিলেন তাঁরা ; ঠাকুরকে এমনি অবস্থায় ফেলে সব চলে গেছেন ! লাটু মহারাজ কিন্তু বলেন,—তোমরা বুঝবে তাঁর ভারি কষ্ট হোত—তোমরা দেহকে বোঝ, বাকী তিনি তো বুঝতেন না। তা না হলে যাঁরা তাঁকে এত ভালবাসতো তাঁরা কি তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতো ?

দূর ছাপরার ছেলে দীন সেবক হিসাবে এসে হয়ে দাঁড়ালেন ব্রহ্মবিৎ—শ্রীঠাকুরের একজন দিকপাল। প্রথম জীবনে রামদত্তের বাড়ী নেন চাকরী। পরে শ্রীঠাকুরের কাছে কিছু কিছু ভোগের রসদ আনতে আনতে তিনি শ্রীঠাকুরের কাছেই রয়ে গেলেন। শ্যামপুকুরে একদিন তাঁর গভীর ভাবাবেশ হয়। ভাবে গায়ের জামা ছিঁড়তে থাকেন। ঠাকুর তাড়াতাড়ি দেন জামাটি খুলে আর—বুকভ'রে শ্রীহস্ত স্পর্শে দেন জুড়িয়ে। চরিতামৃতে আমরা পাই ভক্ত পুণ্ডরীকের কথা—শ্রীভাগবত-সঙ্গীত গদাধর মুকুন্দের মুখে শুনে সমস্ত সজ্জা ছিঁড়ে ধূলায় দিয়েছিলেন গড়াগড়ি।

আর একদিনের কথা—হিসেব জমা নিয়ে গৃহী ভক্তদের মধ্যে একটা কথা ওঠে। শ্রীনরেনের মনে তখন কৌপীনবন্তের বৈরাগ্য, কাজেই একটু মেঘ ঘনিয়ে আছে দুই তীরেই। মীমাংসা ক'রে দিলেন লাটু মহারাজই, বলেন—হিসাব রাখা ভাল। বলেন,—হামার কথা রাখাল ভাই মেনে নিলো।

শ্যামপুকুরেও লাটু ছিলেন ঠাকুরের সঙ্গী। বলেন,—সেখানে হামাদের খাওয়া পরার কোন কষ্ট হোত না। ভক্তরা চাংড়া চাংড়া খাবার আনতো সঙ্গে ক'রে। লাটু সে সবের বেশী ভাগই গরীবদের বিলিয়ে দিতেন। গরীবের ছেলের এই উদারতা দেখবার মত। তাঁর মন্ত্র ছিল,—আস্লি উপাসনা সেবায়।

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর একদিন নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সেদিন ঠাকুর লাটুকে মাথায় হাত বুলাতে বললেন। কিছু পরেই তাঁর গভীর সমাধি। গাত্র স্পর্শেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। শ্রীঠাকুর বলেন,—ওকে আর বিরক্ত করিসনি, ওর মন কি এ জগতে আছে ?

ঠাকুর একদিন শশীভাইকে বড় আদর করলেন, বললেন,—দ্যাখ্! তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস, তোরা যদি বলিস্ তাহলে একবার সেখানকে দেখে আসি। একথা শ্রীশ্রীমার কানে গেল। তিনি যোগীন-ভাইকে দিয়ে হামাদের বলে পাঠালেন,—আজ বাহিরের কাউকে যেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া হয়। এটি ঠাকুরের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা, এটি আমরা লাটু মহারাজের কাছেই পাই।

বিভিন্ন ব্যক্তি নানা ভাবে কালীতপস্বীকে নানাকথা বলায় লাটু মহারাজ বলেন—যাকে যেমন তিনি বুঝিয়েছেন, সে তেমনি ত বলবে। কালীভাইকে তিনি যেমন বুঝিয়েছেন, কালীভাই তেমনি বলেছে। সে কি দোষ করেছে যে আপনারা তাকে হাম্‌বড়িয়া বলছেন!

জ্ঞানসিদ্ধ ঠাকুরের কাছে থেকে লাটু মহারাজের বুদ্ধি যে কত কুশাগ্র হয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর একটি কথায়—জনৈক ভক্ত যখন বলেছেন—ঈশ্বর ন্যায়াধীশ। তখন শ্রীযুত লাটু মহারাজ উত্তর দিয়েছেন—বাকী তিনি রাশিয়ার স্বেচ্ছাচারী 'জার'কেও চালাচ্ছেন।

মাঝে মাঝে তাঁর সারসিক বাংলা শেখার পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে যেমন—মাসতুতোয় মাসতুতোয় চোরে ভাই। বলা বাহুল্য এটি চোরে চোরে মাসতুতো ভাই এর বিহারী রূপান্তর। এই নিরক্ষর বিহারী বালকটির রহস্যময় জীবন বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে শ্রীধর স্বামীর সার্থক বাণী—মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লংঘয়তে গিরীম্ যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।

শ্যামপুকুরের বেদন-মন্দিরে গোলাপমাও ছিলেন একজন পূজারিণী—সেবা সহায়ে তিনি ছিলেন মার সঙ্গী। এই গোলাপমা আর যোগীনমা ছিলেন রামকৃষ্ণ লীলার মেরী আর মার্থা। এঁদের বাগবাজারের গৃহে শ্রীঠাকুর কত আনন্দ করে এসেছেন। এই গোলাপমা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরের সম্মুখে ধরে দিয়েছেন ভোগের থালা আর বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছেন কুলকুণ্ডলিনীকে নিবেদন। শ্রীঠাকুর এই গোলাপমার জন্য মাকে বলেছেন,—এই মেয়েটির যত্ন করো, এ বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে—ঘটেছিলও তাই, গোলাপমা যেন শ্রীমার জীবনে নায়িকা শক্তি—ভক্তদের অযথা ভক্তিতে ইনিই আনতেন বাধা...

বেলুড়ে সেদিন পঞ্চতপার আগুন উঠেছে জ্বলে—অঙ্গদেবী যোগীনমা বলেন,—এস মা ঢুকে পড়ি—এই বলে অভয়াকে দেন সাহস। এই যোগীনমাকে ঠাকুর বলতেন,— সহস্রদল পদ্ম—শেষের দিন সহস্রদল বিকশিত হবে। তপস্যা সমাহিত জীবন সত্যিই সহস্রদলে পড়েছিল ঝরে শ্রীঠাকুরের চরণমূলে...

গোলাপমার বাড়ী

চুয়ান্ন

কাশীপুরের সেবাসত্রে গোপাল দাদা ছিলেন এক যুক্ত যোগী। শ্রীঠাকুরের বেদনা-মুদিত দেহের সৌকর্যের ভার নিয়েছিলেন বুড়ো গোপাল অদ্বৈতানন্দজী নিজে।

সে একদিনের কথা, গোপালজী শ্রীঠাকুরের সেবায় নিবিষ্ট—সহসা সে দেব-বিগ্রহে লাগে আঘাত। তাঁর কাতরতায় গোপাল মহারাজের কোমল প্রাণে লাগে ব্যথা। নিজেকে এই কাজে অক্ষমই মনে করে হাত নেন গুটিয়ে। শ্রীঠাকুরও তাঁর অন্তরের আকুতি বুঝতে পারেন—বলেন,—আমি—মন গুটিয়ে নিচ্ছি,—রোগ জর্জ্জর দেহ নিয়ে সাতদেউড়িতে দৌড়ান সেই সপ্তলোকের দেবতাতেই সম্ভব।

আর একদিনের কথা ভক্ত ভগবানের দ্বন্দতে পড়েছেন নেমে অদ্বৈতানন্দজী। শ্রীযুত লাটু সেদিন শ্রীঠাকুরকে ধরেছেন তাঁর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে। আর শ্রীঠাকুর মধ্যস্থ মানেন মুরুব্বি বুড়ো গোপালকে। বলেন,—এখানকার কথা কি বলা যায়। গোপালজী কিন্তু লাটুর পক্ষ নেন। তবে ঠাকুরের কথাই ছিল,—ওরে কুশী-লব কি করিস্ গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে? এই অধরা ঠাকুরকে ধরা যে কি কঠিন তার নিরিখ পাই পরের ঘটনায়···শ্রীঠাকুর বলেন,—কিগো, তোমার কি ইচ্ছা তীর্থ যাওয়া? উত্তরে গোপালজী বলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু ঘুরে ঘেরে আসি—যুগে যুগে ঘোরার ফেরেই তিনি ভক্তদের দেন ফেলে—ধরা দিতে হয়েই যান অধরা···এই বুড়ো মহারাজের হাত দিয়েই শ্রীঠাকুর তাঁর এগারজন ত্যাগী ভক্তদের কাষায় বস্ত্র দেন—শ্রীমার কথায় সাধুর বগ্‌লস্।

প্রথম জীবনে শ্রীঠাকুরের জন্য নতজানু হয়ে সজল চোখে শুধু কৃপা করেছেন প্রার্থনা—সে প্রার্থনার ফল শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল বজায়। কি সরল অনাড়ম্বরই না ছিল তাঁর জীবন। ব্রহ্মচারীদের সুবিধার জন্য মঠের বাগানের তরি-তরকারী ফলানর কাজে শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিলেন

তৎপর। আবার শ্রীমাকেও পাঠাতে হতনা ভুল। অবশ্য জপ, ধ্যান, তীর্থ ভ্রমণ এসবও ছিল। বিবেকস্বামিপাদ নির্বিকল্পসমাধি লাভের দিন ছিলেন তাঁরই পাশে—আর স্বামিজীর তাঁকে লক্ষ্য করেই প্রথম আত্মপ্রকাশ,—গোপালদা, গোপালদা আমার শরীর কই? অশীতিপর হয়েও শরীর স্বাস্থ্য ছিল শেষ পর্য্যন্ত অটুট। শেষের দিকে পেটের অসুস্থতায় যখন দেখেন মহাপ্রস্থানের আর দেরী নাই, যুক্ত করে শ্রীমাকে জানান মিনতি—চির বিদায়ের মিনতি। শ্রীঠাকুর তাঁর পুরাতন সেবককে দেন দেখা গদাধর বেশে—মৃত্যুর দুয়ারে অমৃতময় রূপে—ভক্তার্ত্তিহারীরূপে…এই কি তাঁর অভীষ্ট দেবতার রূপ—কে জানে! আমরা শুধু দেখি মৃত্যুর মুখে ফুটে উঠেছে বিদায়ী পূর্বাশার হাসি…রামকৃষ্ণ লোকযাত্রীর শেষ সম্বল…

কাশীপুরের লীলাপীঠে হাসিকান্নার সঙ্গে যাঁরা জড়িয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে গৃহীভক্ত বলরামবাবুর একটি প্রয়োজনীয় স্থান ছিল। শ্রীঠাকুরের পথ্যের সমস্ত ব্যয়ভার বসুজামহাশয় নিজেই নিয়েছিলেন হাসিমুখে—শ্রীঠাকুর চাঁদায় খাওয়া পছন্দ করতেন না তাই। ভগবানকে চাঁদায় খাওয়ান কার অদৃষ্টলিপি কে জানে!

বলরামবাবুর গৃহকে শ্রীঠাকুর বলতেন,—মা কালীর দ্বিতীয় কেল্লা। এই বলরামকেই ঠাকুর দেখেছিলেন বটতলা থেকে বকুলতলা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনের পথে—বলতেন,—বলরামকে দেখলাম গৌরাঙ্গের দলে, না হলে মিছরী এই সব যোগাবে কে? তাইত তিনি শ্রীঠাকুরের অবর্ত্তমানেও তাঁর ত্যাগী ছেলেদের রসদ যুগিয়েছেন নিত্য অকুণ্ঠে।

এই বলরাম গোষ্ঠীকে শ্রীঠাকুর এত আপন বোধ করতেন—সেবার বলরাম গৃহিণী অসুস্থ—ঠাকুর শ্রীমাকেই পাঠান কুশল প্রশ্ন নিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে বাগবাজারে—যাত্রার মুখে কোন গাড়ী যায় না পাওয়া। মায়ের যাওয়া যেন হয় না; —শ্রীঠাকুর বলেন,—আমার বলরামের ঘর ভেসে যাচ্ছে, আর তুমি গাড়ী অভাবে যাবে না—সেবার অবশ্য পাল্কী করেই মার যাওয়া হয়েছিল। এই ভাগ্যবানের বৈঠকখানায় শ্রীঠাকুর রথাগ্রে কত নৃত্য করেছেন—এই গৃহে শ্রীঠাকুরের কতবার শুভাগমন হয়েছে—আর কত না নৃত্য-কীর্ত্তনে মুখর হয়ে উঠেছে এই ভক্তগৃহ। আজ এই

ভক্ত গৃহের অর্দ্ধাংশ, বলরাম মন্দির—ভক্তজনের এক পরম আনন্দের, পরম কল্যাণের তীর্থ ?

বাগবাজার অঞ্চলের এই মন্দিরে—সেদিন পূজার লগ্ন যায় বয়ে, মন্দির আর খোলে না—সন্দেহ জাগে সবার মনে, চোখে চোখে নানা ইঙ্গিত—শেষে আর অপেক্ষা না করে দরজা ফাঁক করে দেখা যায় গৌরী মা সংজ্ঞাহীন হয়ে আছেন পড়ে—পূজার ঠাকুর শ্রীদামোদর শিলা ধূলায় নিষণ্ণ। প্রকাশে জানা যায়—দামোদরের সিংহাসনে দুটি জীবন্ত চরণ দিয়েছে দেখা—নিবেদনের তুলসীও ছড়িয়ে পড়ে সেই চরণে— বুকের তলে কিসের যেন টান—অসহ মধুর সে টানে চেতনে থাকা যে দুরূহ···

বসু পরিবারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর এসে দেখেন সেই জীবন্ত চরণ—লুটিয়ে পড়েন শ্রীঠাকুরের চরণে—শ্রীঠাকুরও সেদিন সূতো গুটিয়ে রাখছিলেন টেকোয় ভরে। এই সুতোর টানেই গৌরীমা হয়েছিলেন আপনহারা। গৌরীমাকে দেখে আকুল আনন্দে শ্রীমার কাছে যান নিয়ে--বলেন,—ওগো ব্রহ্মময়ী, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে—দেখ কে এসেছে। লীলারসোচ্ছল দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত-ভগবানের মিলনে সেদিন হঠাৎ জাগা এক আনন্দের জোয়ারে দুকূলই যেন ভেঙ্গে পড়ে। উপলছন্দা গিরি-নির্ঝরিণী যেন এসে পড়ে সাগর সৈকতে—দীর্ঘ দিনের পথ পরিক্রমায়।···বৃন্দাবনের বাঁশরীতে থাকত মিলনের সুর--গৃহকোণে ভক্তের প্রাণ হত আকুল। এবার টেকো গুটিয়ে সূতোর টানে করেছেন উন্মত্ত—এই সূতোর টানে, আকুলতায় ছুটে এসেছিলেন মত্ত গিরিশ তাঁর পাঁচসিকে পাঁচআনা ভক্তির মন্দাকিনী নিয়ে—আর গৌরীমাও এই দূর রহস্যের টানেই চলে গেছেন রামকৃষ্ণ-লোকে, ধরা-ব্রজের মায়া ছেড়ে···রামকৃষ্ণ-লোকেও কি তাঁর হাতে এই টেকোর আবর্ত্তন চলেছে--কে জানে!

আর একদিনের রসমেদুর দক্ষিণেশ্বর—গৌরীমা আছেন দাঁড়িয়ে। সেদিন বকুলগন্ধী ঘাটে আছড়ে পড়ছে ভৈরবীর মাঙ্গলিক ভক্ত-ভগবানকে ঘিরে, শ্রীঠাকুর ডেকে বলেন,—ওগো গৌরদাসী আমি জল ঢালি তুই কাদা চট্‌কা—গৌরীমা বলেন,—এখানে কাদা কোথা যে চট্‌কাবো? দূর দিকচক্রবালে করুণার্দ্র দুটি আঁখি মেলে শ্রীঠাকুর বলেন,—আমি কি বললুম আর তুই কি

বুঝলি ?—এদেশের মায়েদের জন্য তোকে কাজ করতে হবে। তাদের যে বড় দুঃখু। সহজে নত হওয়া গৌরীমা জানতেন না কোনদিনই। বলেন,—হৈ হৈ করা আমার ধাতে সয়না—আমায় কয়েকটি মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ করে দিচ্ছি··· রহস্য গহিন নয়নে ফেনিয়ে ওঠে দূরের স্বপ্ন—শ্রীঠাকুর বলেন,—না গো, এই টাউনে বসেই কাজ করতে হবে—তপস্যা যথেষ্ট হয়েছে···

আজ—গৌরীমার স্নেহসিঞ্চনে যে বিরাট পাদপপাদপ মাতৃজাতির কল্যাণ কল্পে বেড়ে উঠেছে—শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও শাখাগুলিতে—সে তো শ্রীশ্রীঠাকুরের রহস্যময় ইঙ্গিতেরই সামান্য প্রকাশমাত্র।

যোগ্যপাত্রেই শ্রীঠাকুর দিয়েছিলেন ভার। ·· আর একদিনের কথা, স্বামিপাদ তখন আদরের নরেন্দ্রনাথ। শ্রীঠাকুর বলেন,—তোকে আমার কাজ করতে হবে—সেদিনও সপ্তর্ষি মণ্ডলের সমাধি-নিষণ্ণ নয়নে জেগেছিল এমনি দ্বন্দ্ব—এমনি সেদিন শ্রীঠাকুরকে বলতে হয়েছিল,—তোর হাড় করবে—আমি মনে করেছিলাম কালে বটবৃক্ষের মত ছায়া দিবি—তা-না তোর মুখে এই কথা··· ··পার্থ আর পার্থ-সারথীর মাঝে যুগে যুগেই এই লীলা সংঘাত।

হোমা পাখীর গগন-চোঁওয়া প্রাণ নিয়ে গৌরীমা অল্প বয়সেই একা একা ছুটে গেছেন তীর্থ হতে তীর্থান্তরে—জ্বলবার মন্ত্র নিয়ে বেড়িয়েছেন পথে পথে—কত দুর্দৈব গেছে কেটে মাথার ওপর দিয়ে কালবোশেখীর ঝড়ের মত—কত দীর্ঘ দিন-রজনী গেছে বয়ে—অনশনে, অর্দ্ধাশনে—কত কৃপা পড়েছে ঝড়ে জীবনের মরু-বুকে, শত ফুলের স্নিগ্ধতা নিয়ে—তার কতখানিই বা আছে ধরা···

সেবারের কথা—কেদার বদরীর ঊষর তুষার রেখায় দিকহারা নক্ষত্রের মত চলেছেন গৌরীমা—নিঃসহায়, নিঃসম্বল। পথশ্রান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে তনুমন—চোখে ঢলে পড়ে আঁধারের এভালান্স। সহসা দিশারীর মত এসে দাঁড়ায় এক পাহাড়ী মেয়ে—অনিন্দ্য তার রূপ, তরল জ্যোৎস্নার মত দুকূলে পড়ছে আছড়ে—মধুরে বলে,—এ লালী তু কিধার যাওগী ?—স্নেহকণ্ঠে সব ব্যথা নেয় কুড়িয়ে, আর সহজেই পৌঁছে দেয় কেদারের পদতলে

নিমেষে মুছে যায় মোহের অঞ্জন—জননী বুঝতে পারেন—এ সেই উমা-মহেশ্বরী, এ তাঁরই রহস্যঘন মঙ্গল-লীলা…না হলে এই গহিন দূরের পথে কে হবে আর্ত্ত-দিশারী ?

আর একবার দ্বারকার রণছোড়জীর মন্দিরে ভোগারতি দর্শনান্তে আছেন দাঁড়িয়ে। দেখেন এক শোভনসুন্দর কিশোরকুমার, মন্দিরে ভোজনরত …ক্ষণিকের মোহ যায় সরে—দেখেন কুমার কিশোর সিংহাসনে…অশ্রুর অভিষেকে জানান অন্তরের অপূর্ণতার আর্ত্তি…

শেষের কথা—শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রে শ্রীঠাকুরের শেষটানে শেষ সজ্জায় সেজেছেন গোরীমা—শেষবারের মত টেনে নিয়েছেন অভীষ্টদেবকে—আকুল আবেগে—আর ধরার মঙ্গলদীপ, গৌরীকেদারের শেষ প্রদীপের মতই উঠেছে জ্বলে অনির্ব্বাণ শিখায়।

যোগোদ্যান রাম দত্তের বাগানবাড়ী

পঞ্চান্ন

সন্ধ্যার আসরে—তারার মিতালী—একফালি দ্বিতীয়ার চাঁদ—ক্ষণভঙ্গে যায় সরে, রেখে যায় শুধু গগনজোড়া শূন্যতার ব্যথা...দখিণাপুরে গদাধর চন্দ্রও অস্তমিত, বেদনার পাণ্ডু-রেখা যায় মুছে শ্রাবণের কাঁদনীতে—জলভরা সে চোখে সান্ত্বনার কোন বাণীই পায় না ঠাঁই। যুগে যুগে অমৃতের পশরা নিয়ে যাঁর আসা তাঁর বিদায় অচলে মিলিয়ে যাওয়া—ভক্তের কাছে চিরদিনই অসহ—চিরদিনই তীব্র...

শ্রীমা হয়ে পড়েন তড়িতাহতা—মৃত্যু কামনায় অধীর,—স্বামিপাদেরাও জীবন্মৃত—দিশাহারা—ভক্তেরা মুহ্যমান ..সেদিনের এক বিষাদ সন্ধ্যায়--নরেন্দ্রনাথের বুক নিঙরেই জেগে উঠেছে...

হরি গেও মধুপুরী হাম কুলবালা
বিপথে পড়ল সখি মালতীক মালা।

বেদনার মীড়ে রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেগে ওঠে কানুহারা ব্রজপুরীর আর্ত্তি—নয়ন কোণে অশ্রুর শিশির পড়ে গলে –গেয়ে চলেন স্বামিপাদ—

নয়নক নিদ গেও বয়ানক হাস
সুখ গেও পিয়া সাথ—দুখ মঝু পাশ—

অসহ দুঃখই নেমে এসেছিল সেদিন ধরণীর বুকে। অসীম থেকে এদের আসা তারাঝরা পথে...আবার অসীমেই যায় হারিয়ে –মৃত্যুর যবনিকা– তার দুইতীরেই এই গহীন রহস্য...

...তারা ছড়ান অসীম আকাশের কি যেন এক রহস্য আছে। এই নীলাঞ্জনে চোখ রেখে ধরার সব ব্যথাই যায় জুড়িয়ে। এ যেন সব পেয়েছির দেশ। সব কল্যাণই যেন সেখানে রয়েছে—বাইবেল সে পরম পাওয়ার কথায় বলে—নয়ন হেরে নাই, শ্রবণে না শুনি, অন্তরে তার নাহি অনুরণি—ভগবান রেখেছেন ধরে তাদেরই তরে যারা তাঁরে ভালবাসে—...ঈশামসি যখন নেমে এলেন বেথ্‌লেহেমে, সেই পরম আবির্ভাব লগ্ন কয়েকজন প্রাচ্যের পণ্ডিতদের চোখেই দিয়েছিল ধরা—এক দিকদর্শী তারা

রূপে। আর যখন শ্রীঠাকুর স্বামিপাদকে নামিয়ে আনেন বিলোমভূমিতে তখনও হয়েছিল এই জ্যোতির অবতরণ...তারা পশিল যে ধরা পর—গ্রীসের ঋষি প্লেটোর ধ্যান নেত্রে ফুটে উঠেছিল রহস্যময় এক দ্যুলোক—এই তারায় তারায় আপনহারা জীবন, সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে চিরনিথর—সে জীবনইত আমরা হারিয়েছি—চিরদিনের তরে। আবার দেখি আধুনিক মনস্তত্ত্বে—প্রথম সৃষ্টির উষায় যে ধূলা (ডাষ্ট্ ক্লাউড্), অনন্ত আকাশে ছিল তারার স্বপ্ন বুকে এঁকে, তাদের মধ্যেই ছিল মাইণ্ড্-ডাষ্ট্, ধূলারূপে চেতনায় প্রথম প্রকাশ—পিথাগোরাসের আকাশের ছন্দ—তারার নৃত্যপথেই হয়েছিল প্রকাশ—উপনিষদের ঋষিরা এই অনন্তের মাঝেই পেয়েছেন সৃষ্টির বিলাস—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।

—শ্বেতা ৪।৮

যুগে যুগে শ্রীঠাকুর আসেন, যুগে যুগেই তাঁর চরণ চিহ্ন বুকে ধরে ধূলার ধরণী সোনা হয়ে যায়, বারে বারেই তিনি আসেন বেদনার ক্রুশ বুকে নিতে—বুকভাঙ্গা দুঃখে ধরণীর সঙ্গে এক হতে...কিন্তু কেন এ আসা—মনে হয় অকারণেই এ ভালবাসা, শুধু খেলার ছলেই এ আসা। ব্যথার এত বোঝা আমাদের কোনদিনই হবে না, যাতে শ্রীভগবানের আসন যাবে টলে—এমন গ্লানি ধর্মরাজ্যে হতে পারে না যাতে শ্রীঠাকুরকে তাঁর পরমস্থান থেকে করবে বিচ্যুত। আর বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কার্য্যকারণবাদ অতি স্থূল আর অতি সূক্ষ্ম এই দুই রাজ্য থেকেই যাচ্ছে উঠে। সে বিশ্বাতীত রাজ্যে আমাদের কার্য্য-কারণ-বাদের প্রবেশই নিষেধ। মহামতি কাণ্টেরও এই মত—ন্যুমেনার রাজ্যের খবর ফেনোমেনার রাজ্য থেকে যায় না পাওয়া।

তবে তাঁতে সবই সম্ভবে,—নিজমুখে একথা দক্ষিণেশ্বর লীলাতেই গেছেন বলে। বলেছেন,—তাঁর ইতি করিস না। তাই সাধুদের পরিত্রাণ করতে আর দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করতে তাঁর আসা সম্ভব—গীতামুখে এই আশ্বাস তিনি গেছেন দিয়ে। আর এযুগে বলে গেলেন,—অবতার আসেন তারণ করতে, জীবকে প্রেম, ভক্তি শিক্ষা দিতে...

এই সীমাহীন, এই নিত্য বর্দ্ধমান বিরাট বিশ্বের তুলনায়, আমাদের বুদ্ধি যে কত নগণ্য তার ধারণা হয় না। তাই কারণ যদি থাকে—তা অতি সামান্য হলেও তার জন্য করুণার্দ্র হয়ে তাঁর আসা এ আমরা আশা করতে পারি। তিনি যে আপনার মা-গো,—নিজেই সে কথা গেছেন বলে।

এবারের অবতার—বিশ্বের অবতার। সমস্ত বিশ্ব বৃংহন মুখে চলেছে—একৃস্প্যানডিং ইউনিভার্স। ব্রহ্মের অর্থই ত বৃংহন। অবতার তত্ত্বও তাই বেড়ে চলেছে। পূর্বে যিনি রামরূপে এসেছেন, কৃষ্ণরূপে এসেছেন, তিনিই এবার বিশ্বের ঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্মাণী প্রভৃতি দেশে শ্রীঠাকুর পড়েছেন ছড়িয়ে সে দেশের ঠাকুর হয়ে—ভারতের ত কথাই নাই। যাই হোক—বিশ্বের কণ্ঠে তখন তাঁর অবতরণের জন্য কি করুণ ডাক উঠেছিল জেগে, সে কথা বিশ্বের ইতিহাসেই রয়েছে ধরা—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেখি ফরাসীদেশে বিপ্লবের সূচনা। দেশের জনসাধারণ নিরন্ন। অত্যাচারের শেষ পর্য্যায়ে আর্ত্তনারায়ণ উঠেছেন জেগে—যার ফলে বাস্তিল-দুর্গ ধ্বংস—রাজা ও রাণীকে গিলটিনে দিতে হয় আত্মাহুতি। সন্ত্রাসবাদের পর্য্যায় হয় সুরু, আর সে বহ্নিমুখে নিজেরাও হয়ে পড়ে সমিধ। এই ফরাসী বিপ্লব দেশে দেশে ছড়িয়ে দেয় বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ।

ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ প্রায় এই সময়েই হয়, আর এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল প্রাসিয়া, স্পেন, রাশিয়া—সার্ডিনিয়া আর অষ্ট্রিয়া।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের অধীনতার-শৃঙ্খল ছিন্ন করতে দৃঢ় সংকল্প করে। আর দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে গৃহবিবাদ প্রায় এই সময়ই হয় সুরু! আবার দেখি আঠারশত আটচল্লিশে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছিন্ন করতে ইতালীর সংগ্রাম—প্রায় ঐ সময় অষ্ট্রিয়া-প্রাসিয়ার যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। আর প্রায় ঐ সময়েই চীন-জাপানের সংঘর্ষ ওঠে জেগে। সামাজিক দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখি ঊনবিংশ শতকের চিন্তা রাজ্যে ঘনিয়ে এসেছে জটিল মেঘভার। চিন্তা রাজ্যের পরিধি এই সময় গেছে বেড়ে। মার্কিন ও রুশীয় চিন্তাধারা এসে মিলেছে ইয়োরোপের

ভাবস্রোতে। প্রাচ্যের চিন্তাধারাও তার পুরাতন কাহিনী নূতন বেগ প্রবাহে এসে ইউরোপকে আরও বেশী রকম দরদী করে তুলেছিল প্রাচ্যের চিন্তা-ধারার প্রতি। এই যুগ ইংলণ্ডের রেনেসাঁসের যুগ। যন্ত্র-শিল্পের বিশেষ অগ্রগতিতে এই যুগে উৎপাদন ক্ষমতা গিয়েছিল অত্যধিক বেড়ে আর তার ফলে মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি গিয়েছিল বদলে। ভোগাসক্তির বৃদ্ধি এরই ফল। আরও মানুষের মনে তার পারিপার্শিকের প্রতি বিশেষ শক্তি সচেতনতা দিয়েছিল এনে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এর সঙ্গে পাতায় মিতালী যার ফলে মানুষের মনে জাগে অহংএর বিরাট ঔদ্ধত্য। ভগবৎ বিশ্বাস, পরলোক এসব থেকে মুক্তির দিশায় সে যেন উঠেছিল পাগল হয়ে। আঠারশতক একদিকে এনে দিয়েছিল লক, হিউমের নাস্তিক মতবাদ, অন্যদিকে কাণ্ট প্রভৃতির সংশয় বাদ ; আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল চিন্তাশীল মন। কাণ্ট, হেগেলের র‍্যাসনালিস্‌মের সুরে যে বিদ্রোহ ছিল, যে সংশয় ও বিচার ছিল, তারই একদিকের গতিভঙ্গী রূপ পেল জার্মাণীর মার্ক্স-বাদ আর রাশিয়ার বলসেভিক সাম্যবাদে। চার্চের পুরোহিত সম্প্রদায় এতদিন ঈশার নামে যে কলঙ্ক লেপন করছিল রাজশক্তির সহযোগিতায়, আজ জনশক্তির অভ্যুদয়ে রক্তের স্রোতে সে কলঙ্ক মুছে যেতে বসল। ফলে ধর্মকেও দেশান্তরী হতে হল সোভিয়েট রাশিয়া থেকে। আবার আঠারশতকের শেষে রোমান্টিসিস্‌মের উদ্ভব। যার ফলে দর্শনে, শিল্পে, রাষ্ট্রে, ভাবের বিলাস বিভ্রম হয়েছিল সৃষ্টি। কবি বায়রন, সোপেনহায়ার, মুসোলিনী, হিটলার, এই সব বিপ্লবীদের আবির্ভাব এই যুগেই।

ছাপান্ন

ভারতের ভাগ্যলিপিও তখন ভারাক্রান্ত। বহুধা বিভক্ত পরাধীনতায় শৃঙ্খলিত হতে গিয়ে ভারত-লক্ষ্মী তখন বিত্রস্ত, বিপর্য্যস্ত। ভাগ্যলক্ষ্মী কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন তার স্থিরতা হচ্ছেনা। খণ্ড খণ্ড স্বাধীন-রাজ্য একদিকে, আর অন্যদিকে বৃটিশ সিংহের দৃপ্ত চেষ্টা—ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে নিষ্পেষিত করতে। মারাঠাদের স্বাধীনতা সূর্য্য তখন দীর্ঘতর ছায়া রচনা করেছে। পাঞ্জাব কেশরীর দুর্দ্ধর্ষ খালসা সৈন্যদের আত্মরক্ষায় জীবন মরণ পণে তখন চলেছে একের পর এক যুদ্ধ বিগ্রহ। এর পরই আসে সিপাহী বিদ্রোহ; রক্তের অক্ষরে লিখে যায় বিভীষিকার লিপি। এই ছিল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আকাশের ঘনঘটা।

অন্যদিকে সামাজিক জীবনে সুরু হয়েছে নব বিপর্য্যয়। এর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা নিয়ে এলো এক নব বৈদেশিক উন্মাদনা। দেশব্যাপী উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত যায় বয়ে। মিশনারীরা এর সঙ্গে করে অকুণ্ঠ মিতালী। ফলে দেশে সনাতন ধর্মপদ্ধতিতে ধরে ভাঙ্গন। একদিকে ডিরোজিও প্রভৃতি পাশ্চাত্যের স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা, অন্যদিকে রামমোহন, শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সনাতন পন্থীদের ভাবধারা—উপলবিক্ষুব্ধ গঙ্গা-প্রবাহের মত চঞ্চলতা করেছিল সৃষ্টি ভারতের চিন্তায়।

এদিকে ইনডাসট্রিয়াল রেভলিউশন্এর ঢেউ এসে লেগেছে ভারতের প্রাণতটে—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে। কল কারখানার উদ্ভব সুরু হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাদের হয়েছে পরিপুষ্টি। আর ভোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগবৎ পন্থা থেকে মানুষের মন সরে যেতে সুরু করে।

ভাবধারার একটা ঘাত-প্রতিঘাত আছে। বৈদিক যুগে এদেশের দার্শনিক ও অন্যান্য ভাবধারা ওদেশের প্রাণতটে করেছে আঘাত। বাণিজ্য পথ বেয়ে সে তরঙ্গ আরব, আসিরিয়া, ও গ্রীকসভ্যতাকে করেছে অভিভূত। সক্রেটিস, প্লেটোর দার্শনিক চিন্তায় রয়ে গেছে তার ছাপ।

তখন ভারত সমুদ্রের ছিল দীপ্তি—ছিল অমৃত। বর্ত্তমান যুগে ওদেশে রোম্যানটিসিজ্‌ম্‌ অথবা র‍্যাশ্‌ন্যালিজ্‌ম, ইনডাসট্রিয়াল ইভোলিউশ্‌ন্‌ এসেছে ভারতের তীর্থতীরে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীতে জাগে সাড়া এই তরঙ্গাভিঘাতের। দার্শনিক চিন্তায় প্রধানতঃ দুটি স্রোতাবর্ত্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে চিন্তাজগৎকে। একদিকে কাণ্ট, হেগেল, সোপেনহাওয়ার, বার্গশঁ, আইনষ্টাইন, হোয়াইট্‌-হেড, আরবান, ক্রোচে, ম্যাকগ্রেগার্ট, এদের আস্তিক্যবাদ; অন্যদিকে মার্কস, এঙ্গেলস্‌, ক্রেপট্‌কিন প্রভৃতির জড়বাদ। কিন্তু এই সব মতাবলম্বীদের মধ্যে ভাববাদীদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠতর মণীষী বর্ত্তমান। ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীঠাকুর—শ্রীশ্রীভবতারিণীর কাছে এই ভাববাদের নির্দ্দেশই পেয়েছিলেন একাধিকবার,—তুই ভাবমুখে থাক। তাইত এই স্রোতের হয়েছে পরিবর্ত্তন। তাই দেখি ধর্মরাজ্যে আবার ভারতকেন্দ্র থেকে এক প্রবল তরঙ্গ ছুটে চলেছে ইউরোপ, আমেরিকার অভিভূতিতে। এই প্রেরণার প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান সব মতের সব পথের দিশারী—প্রফেট। অন্যদিকে দেখি যে শ্রীঠাকুরের আগমনের পূর্বাশার প্রস্তুতি হিসাবে ধর্মরাজ্যে এসেছেন কয়েকজন মহারথী। বাংলায় সিদ্ধ ভগবান দাস, সিদ্ধ চৈতন্যদাস, রাজা রামমোহন, চরণদাস, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, উত্তর ভারতে ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, বালানন্দ, ভোলানন্দ, দয়ানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতি ধর্মগোপ্তাদের আবির্ভাবে ধর্মের গতি একেবারে ব্যাহত হতে পারছিল না। এঁরা যেন প্রভাতী তারার মত নব-যুগের সূচনাই করছিলেন…

জাগ্রত ভগবান…যার আসায় যুগে যুগেই ভারত বেদমাতা—ধর্মে-রাষ্ট্রে-শিল্পের সবদিকেই রবীন্দ্রনাথের ভারত, বিবেকানন্দের ভারত, অরবিন্দের ভারত, গান্ধীর ভারত, অমর ভারত—যুগে যুগেই দেব-মাতৃকা।

পরিশিষ্ট-ক

কথামৃতের কল্পলতা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে যে গল্পের কল্পলতা আছে ইংরাজীতে সেগুলিকে প্যারাবল্ বলা হয়। জগতের ঐতিহ্যে এই প্যারাবল্গুলির বিশেষ স্থান আছে—ধর্মরাজ্যে বিশেষ করে। এই প্যারাবল্ বা নীতি কল্পলতাগুলির ধাতুগত অর্থ, একটিকে আর একটির পাশে রেখে তুলনা করা—আরিস্ততল বলেছেন,—অন্যকে স্বমতে আনার জন্যই এদের উদ্ভব (রেট ২।২০)

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে এই কল্পলতাগুলির ব্যবহার রয়েছে। আমরা সেগুলির আলোচনায় দেখি ভগবান ঈশামসি এই নীতি-গল্পগুলির প্রচুর ব্যবহার করেছেন আর পাশ্চাত্যদের মতে তিনি এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে ভগবান ঈশার নীতি-গল্পগুলির মধ্যে কিছু কিছু অব্যবস্থা দেখা যায়। জুলিচার (Julicher) বলেন,—নির্দোষ নীতি-গল্পগুলি হওয়া চাই সহজ, তাতে থাকবে একটি মাত্র শিক্ষার কথা, আর এগুলি হবে ধর্মবিষয়ক কথা। কিন্তু ঈশামশির নীতি-কাহিনীগুলিতে অনেক সময় একাধিক তত্ত্ব কথার দ্যোতনা থাকত অথবা সেগুলির অর্থ একটু গভীরতায় থাকত ঢাকা। যেমন,—প্যারাবল্ অফ্ দি কিংডাম এর গল্প বলতে গিয়ে বলেছেন,—সাধু ইসাইয়াস (Esaias) বলেছেন,—তোমরা শুনেও শুনতে পাবে না, দেখেও দেখতে পাবে না; তাই তিনি প্যারাবল্ অফ্ দি কিংডামকে দুরবগাহ করে তুলে ধরেছেন। আর অনেক সময় তিনি এর মধ্যে একাধিক দ্যোতনা রাখতেন গূঢ় করে।

গল্প বলা আর গল্প শোনা, সব জাতির মধ্যেই অতি প্রাচীন প্রথা। যেমন আমরা ওমাহা ইণ্ডিয়ানদের দেখি গল্পের আসর এদের শীতের সন্ধ্যাকে করতো আনন্দ মন্থর। এই সময় গ্রাম্য-বৃদ্ধেরা তাদের স্মৃতি-সঞ্চয় থেকে ভূতপ্রেতাদির গল্প করত পরিবেশন। এই গল্পগুলি সাগা (Saga) ও মারচেন (Marchen) নামে খ্যাত। এই সাগা ও মারচেনগুলির

ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল। কোন কোন স্থলে, কোন কোন ক্ষেত্রে উপদেশ সম্বলিতও হত। এই সব শিব-গল্পগাথা বর্ত্তমানের অনেক লেখকদের অনার্য্যজুষ্ট লেখনীতে আর দেখতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানের লেখকদের সম্বন্ধে নিউইয়র্কের অধ্যাপক কোলম্যান (Coleman) লিখেছেন,—বর্ত্তমানে অল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকেরা এক বিপদের সৃষ্টি করেছেন। ভাল নভেল লেখায় যে অর্থ পাওয়া যায় তাতে দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখকেরা তাঁদের শক্তির অপব্যবহার করেন। আর তাঁরা ঐ পুরস্কার লাভ করেন সাধারণ পাঠকদের অমার্জিত অথবা হীন রুচির খোরাক জুগিয়েই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে একরকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলতি হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়। যে সাহিত্য সমাজ-দেহে আর সমাজ-মনে পুষ্টি, বুদ্ধি, ধৃতি, শান্তি আর আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে না সে সাহিত্য সমাজ-অঙ্গে দুষ্ট ব্রণই সৃষ্টি করে।

বৌদ্ধধর্মে ভগবান তথাগতের জীবনীতে জাতক কল্পলতাগুলি উচ্চ তত্ত্বের নীতিগল্পের সমষ্টি ; কিন্তু বৌদ্ধ নীতি-গল্পগুলির মালমশলা রাজা-মহারাজদের কাহিনী, চাষীদের জীবনী, জীবজন্তুদের আর গাছপালার কথায় ভরপুর। আর কথামৃতের গল্পে রাজা মহারাজের কথা নাই বল্লেই হয়। এতে আছে—নানা প্রাণীর কথা—বহুরূপী, হাতী, মাছমুখে চিল, হোমাপাখী, ফোঁসছাড়া সাপ, নির্ভরশীল ব্যাঙ আর আছে সাধারণ মানুষের কথা যেমন এগিয়ে পড়া কাঠুরিয়া, খানদানী চাষা, ভক্ত সাজা স্বর্ণবণিক, সত্য বাজীকর, ভক্ত তাঁতী, ভক্ত দ্বারবান, মেছুনী, জহুরী আর বেগুনওয়ালা প্রভৃতি। সমস্ত মিলে প্রায় শতাধিক গল্পের স্থান রয়েছে এই কথামৃতে। তাও-ধর্মের, কনফুসিয় ধর্মের লেখকদের মধ্যেও এই রকম কথা-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। পবিত্র কোরাণেও নীতিগল্পগুলিকে ভগবানেরই সৃষ্টি বলে বর্ণনা আছে। একই গল্প বিভিন্ন ধর্মসাহিত্যে পাওয়া যায় যেমন—বাজীকরের গল্প রয়েছে কথামৃতে, বুদ্ধ নীতি-কথায়, আবার অন্ধের দর্শনের কথা—কথামৃতে ও বৌদ্ধধর্মে আছে। 'প্যারাবল্ অফ্ দি সাওয়ার' নামক বাইবেলের গল্পটি সংযুক্তনিকায়ে আছে। এতে মনে হয় নীতিগল্প গুলির একটি বিশ্বজনীনতা আছে।

মনস্বী হেভেট (Havet) এর মতে ঈশামসির নীতিগল্পগুলি ভারত থেকে নেওয়া (L. Christiahisme et ses origines) পণ্ডিত বেন্‌ফে (J. Benfey) সমস্ত নীতি-গল্পগুলিকেই বৌদ্ধধর্মের কাছে ধার করে নেওয়া বলে মনে করেন। হয়ত ভারতের চিন্তা, ঋষিদের চিন্তা, ভূমায় পরিণত হয়েছিল। ছোট ছোট কথা দিয়ে, ছোট ছোট গল্পের এক প্রাণধর্ম আছে। Short wave কম্পনের শক্তি যেমন বহুদূর বিসারী, তেমনি এই ছোট ছোট কথায় গাথা ছোট ছোট গল্পগুলির দ্যোতনা অমোঘ। যার জন্য বাইবেল এত আদৃত। কথামৃত আজ বিশ্বের বাইবেল বলে গণ্য হতে চলেছে। বিশেষ এতে প্রধান প্রধান সব জাতির, সব ধর্মের কথাই ত রয়েছে। অনুবাদ সাহিত্যে হিসাবে আজ প্রায় সব প্রধান প্রধান ভাষায় এর স্থান অবিসংবাদী।

আরো কথামৃতের ভাষায় এক অনবদ্যতা—এক নূতন কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। কত নূতন উপমা রয়েছে এর ভিতর। যেমন—'গম্ভীর জল', 'একঘেয়ে হব না', 'খাল জমিতে জল', 'আঁস চুপড়ীর গন্ধ', 'ছেলে-মা যাব বলে', 'পৌগণ্ড অবস্থা', 'গলায় মটর গিড় গিড় করে', 'শুঁটকে সাধু', 'বুকে বিল্লি আঁচড়াচ্ছে', 'ভস্ করে ওঠা তুবড়ী,' এমনি কত মিষ্টি চলতি উপমা নেওয়া হয়েছে। সে যুগে তখনও দিব্য অথচ চলতি ভাষরা ব্যবহার সুরু হয়নি। হয় 'আলালী, হুতোমী' ভাষা, না হয় শুদ্ধ 'বঙ্কিমী' ভাষার যুগ সেটা। কথা শেষ করে আবার তার একটু খেই টেনে নেওয়া কথা সাহিত্যের একটি মধুর বিশেষত্ব। যেমন,—এখনও ভগবতীর পূজা, মেলার সময় হয়—বারুণীর দিনে ; বাহিরের কর্ম কখন কখন সাধ কোরে করে—লোকশিক্ষার জন্য।

কথামৃতের ভাষা ভাব-বাহী আর জ্ঞানবাহী দুই-ই। যেমন 'চাউনিতে যেন জগৎটা নড়ছে' 'জগতের সব গম্ভীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন' আবার সেটি ভাব-তান্ত্রিক, বস্তু-তান্ত্রিক দুই-ই বটে। যেমন—যদু মল্লিকের ঐশ্বর্য্য দেখে সবাই, বাবুকে খোঁজে কজন। আবার মাঝে মাঝে লঘু পরিবেশের সৃষ্টিও করেছেন,—স্বামিজীকে বলেছেন,—তুমি ত 'খ'—তবে যদি টেক্স (বাড়ীর খাজনা) না থাকত। কিছু কিছু খেউরও কথা-সাহিত্যে প্রয়োজন।

যেমন আমরা কেবল আঁঠি আর চামড়া—খেলে হয় অম্লশূল ; যাত্রাওয়ালারা প্রায় ঐ রকম হয়, গাল তোবড়া, পেট মোটা,* হাতে তাগা ;—সর্বদা ভাবে থাকতেন অথচ কি গভীর দৃষ্টি, রস সাহিত্যিকের দৃষ্টি—এমন কত আছে। বলতেন,—আমি আঁস জল দি। বিশেষ ঐ থাকের ভক্তও আসত। কথামৃত শুধু সাধুদের জন্যই ত নয়, সব নিয়ে কথামৃত একটি কাব্যবিশেষ। তিনি যে কবি—যুগে যুগেই।

মানবতার এই বাইবেলে রয়েছে ধর্মের কত না গূঢ় তত্ত্ব : যেমন সাংখ্য দর্শনের পুরুষের নিশ্চেষ্টতা আর প্রকৃতির প্রসবধর্মী স্বভাবের সঙ্গে বিবাহ-উৎসবে নিশ্চেষ্ট গৃহ কর্ত্তার আর চঞ্চল গৃহকর্ত্রীর তুলনা। মার্থা-মেরীর অনুরাগের কথা—মহামহিম আল্লার কথা, ভগবান বুদ্ধের কথা, কি যে নাই! আরো রয়েছে সমসাময়িক ভক্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের আলাপ-সংলাপ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম, কবি মাইকেল, ব্রহ্মানন্দ কেশব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আরো কত না জীবনাদর্শ ধরা এর পত্রে। ধার্মিক তাঁতীর রামের ইচ্ছায় জীবনায়ন, ফোঁস না করা সাপের চরিত্র। এমনি কত তত্ত্বমণি যে ছড়ান রয়েছে কথামৃতের পাতায় পাতায়। আর আছে মিষ্টকথায় নিজের লীলাঞ্চন, নানা ভক্তসঙ্গে, নানা পরিবেশে, রঙ্গিন তার পর্ণপুট আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ছন্দিত হয়ে রয়েছে কত মধুর কণ্ঠের সাধন সঙ্গীত…সমস্ত মিলিয়ে কথামৃত যেন এক সব পেয়েছির স্বর্গ—মর্তের বুকে অমরার অবদান—নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য ভগবানের সঙ্গ।

পরিশিষ্ট—খ

দর্শন ও মনোবিজ্ঞানে শ্রীঠাকুর

শ্রীঠকুরের জীবন বেদে আমরা দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের অনেক তথ্যই পাই। অনেকের প্রশ্ন থাকে, শ্রীঠাকুরের কথায় আবার এসব আনা কেন? সে হিসাবে বলা যায় ভগবান ঈশামসির মনোবিজ্ঞানের কথা সেদেশে আলোচিত হয়েছে। (জিসাস্ ক্রাইষ্ট ইন্ দি লাইট্ অফ্ সাইকোলজি—জি, এস, হল) আর আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ধর্মরাজ্যের মহাপুরুষদের দর্শনও আলোচিত হয় এদেশে ওদেশে।

প্রথমেই দেখি শ্রীঠাকুর জ্ঞানলাভের এক অভূতপূর্ব্ব উপায় করেছেন আবিষ্কার। জ্ঞানের উৎসের কাছে চেয়েছেন জ্ঞান পিপাসার শান্তি। না খেয়ে পড়েছিলেন,—মা বেদে পুরাণে তোকে যে ভাবে জেনেছে আমায় জানিয়ে দে। সে প্রার্থনা মা শুনেছেন। কথামৃত আজ বিশ্বের ধর্মগ্রন্থ। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন জ্ঞানের তিনটি উপায় দিয়েছেন—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, বৈচারিক জ্ঞান আর প্রজ্ঞাজনিত জ্ঞান। এদের মতে অন্য দুটী জ্ঞান সত্যতত্ত্বকে বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। (আইডিয়ালিষ্ট ভিউ অফ্ লাইফ্) আমাদের দেশে আচার্য্যশঙ্কর, আর পাশ্চাত্যে প্লেটো, দেকার্ত্তে, স্পিনোজা প্রভৃতির কতকটা এই মত।

দর্শন বিষয়ে তিনটি তত্ত্ব আলোচিত হয়—ঈশতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব। ঈশ্বর-জ্ঞানের সম্বন্ধে মনস্বী কাণ্ট বলেছেন,—তাঁকে সীমায়িত মনের দ্বারা জানা যায় না। ন্যুমেনা ও ফেনোমেনা—জগতের দুটি ভাগ তিনি করেছেন। ফেনোমেনার রাজ্য এই জগৎ, আর পারের জগৎ ন্যুমেনা। ভগবান এই পারের জগতে আছেন। আর সে জগতের সংবাদ আমাদের এই ফেনোমেনার মন দিয়ে পাওয়া অসম্ভব। তবে শ্রীঠাকুর বলেছেন,—শুদ্ধ মন, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরা যায়। বলেছেন,—তাঁকে এই ইন্দ্রিয় দ্বারা বা মনের দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু যে মনে বিষয় বুদ্ধি নাই, সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়। আর ঠিক কে জানবে?

আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু হলেই হল। ডেঁয়ো পিঁপড়ে আর চিনির পাহাড়ের উপমা দিয়েছেন এই বিষয়ে। ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি ইতি করতে বারণ করতেন। তাঁর ইতি করা যায় না তিনি নিরাকার সাকার আবার আরো কত কি; ভক্তের জন্যে তিনি সাকার। (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত) জ্ঞানসূর্য্য উঠলে তখন আর ব্যক্তি বলে বোধ হয় না—এখানে তিনি সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের উপমা দিয়েছেন কূলকিনারা নাই, ভক্তি-হিমে স্থানে স্থানে বরফ হয়ে যায়। জ্ঞান-সূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়—তবে তিনি, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ বলেছেন। আবার তাঁর ব্রহ্ম জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির পারে—বিদ্যা অবিদ্যার পারে—সত্ত্ব, রজঃ তমের পারে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহের পার—প্রকৃতির পার—জ্ঞান অজ্ঞানের পার। এসব বৈদান্তিক বিচার সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, আমি সবই লই। ব্রহ্ম জীবজগৎ বিশিষ্ট, এইটি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। তাঁর কাছে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। সচ্চিদানন্দ ভক্তি হিমে জমে যান—আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠলে গলে যান। ঈশ্বরই কর্ত্তা, তিনিই সৎ, তিনিই বিভুরূপে সকলের ভিতর আছেন। তিনি মায়াকে বলেছেন যেন পানা, আর সচ্চিদানন্দ যেন জল। মায়ার যে দুটি শক্তি আছে, আবরণী আর বিক্ষেপণী—পানাতে এ দুটির বেশ প্রকাশ। জীব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, মায়াতে এই উপাধি। তত্ত্বজ্ঞান অর্থে জীবাত্মা আর পরমাত্মার এক জ্ঞান। বেদান্তের সার তিনি এক কথায় বলেছেন,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। শ্রীঠাকুরের মতে এক জ্ঞানই জ্ঞান, বহু জ্ঞান অজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ—বিচার পথ। জ্ঞানীর ভিতর একটানা বইতে থাকে অর্থাৎ জ্ঞান পথে চিত্ত নিরোধ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। ভক্তিতে জোয়ার ভাটা খেলে। জ্ঞানের দুটি লক্ষণ। অভিমান থাকবে না—আর শান্ত স্বভাব। আবার বলেছেন,—জ্ঞানীর অনুরাগ থাকবে আর কুণ্ডলিনীর জাগরণ হবে। জ্ঞানী স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করে। বিজ্ঞানী দেখে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান। বিজ্ঞানী নিত্য হতে লীলায় আবার লীলা হতে নিত্যে যায়। জ্ঞানী তাঁকে জেনেছে, বিজ্ঞানী তাঁকে নিয়ে সম্ভোগ করেছে। আচার্য্য শঙ্কর বিজ্ঞানীর লক্ষণে বলেছেন, যিনি উপলব্ধি করেছেন।

জগৎ যেন ঝাড়ের মত। জীব—ঝাড়ের দীপ—শ্রীঠাকুর এই কথাটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি বলে বলেছেন। এখানে অর্থ এই যে দীপ না থাকলে ঝাড়কে দেখা যায় না, তেমনি জীব না থাকলে ঈশ্বরকে কে দেখাবে? জড়ে চৈতন্যে ভেদ, শ্রীঠাকুর মানেন নাই। তিনি বলেছেন,—জড়ের সত্ত্বা চৈতন্যে লয়, আর চৈতন্যের সত্ত্বা জড়ে লয়। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানে ম্যাদাম কুরী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা জড়ে ও শক্তিতে প্রভেদ দূর করেছেন, তবে শক্তিতে ও চৈতন্যে পার্থক্য তাঁরা দূর করতে সক্ষম হন নাই। আবার অন্যত্র শ্রীঠাকুর শরীরকে সরা বলেছেন। মন রূপ জল, তাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। এতে জড় ও চৈতন্যের একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায়। মাটির সরায় জল আছে। তবে দুটি এক নয়। দেহ মন চৈতন্যের আধার। দেহ মনের প্রয়োজন এইজন্যে। কিন্তু লাইবনিজ্ প্রভৃতির মতে দেহ ও মনের কোন বাইরের যোগ সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। এরা দেহ-মনে, ভগবানের দেওয়া সামঞ্জস্যবাদী [প্রিএসটাব্লিষ্ট হারমনি]। আবার ডেকার্টে প্রভৃতি মনস্বীরা দেহ মনের মধ্যে চির পার্থক্য স্বীকার করেন। স্কোলাষ্টিক দার্শনিকরা মনে করতেন, এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু শ্রীঠাকুর যে ভাবে তাঁর দেহ মনের সম্বন্ধটি দিলেন সেটি সকল মতের পরিপোষকও বটে আবার তাদের ছাড়িয়েও গেছে। এক চৈতন্য সর্ব্বত্র থাকায় সবই মূলতঃ এক, আবার এই উদাহরণের মধ্যে সাংখ্যের চিচ্ছায়া আছে, বেদান্তের সচ্চিদানন্দ আছে।

শ্রীঠাকুর বলেন,—আম খেতে এসেছো—আম খেয়ে যাও—কত ডালপালা, অত হিসাবে কি হবে—বাবুর সঙ্গে যো সো করে আলাপ কর—বাবুর কখানা বাড়ী, কত ঐশ্বর্য্য এসবে কি হবে—পাশ্চাত্য দর্শনে আমরা এই তত্ত্ব পাই—এটি প্রাগমাটিজ্ম্। আচার্য্য উইলিয়াম জেম্স্, এর একজন প্রবর্ত্তক। তাঁর মতে ব্যবহারিক উপযোগিতাই জগতের সত্যকার রূপ। আর আমাদের জ্ঞানের নিরিখ হচ্ছে তার কার্য্যে প্রয়োজন। এই মতে আমাদের জ্ঞানের পরিধি দিন দিন যায় বেড়ে। [প্রাগমাটিজম্—উইলিউ জেম্স্] শ্রীঠাকুরও বলতেন,—এগিয়ে পড়। কাঠুরের গল্পে বলেছেন এগিয়ে যেতে। কাঠের বন, তামার খনি, রূপার খনি, সোনার খনি। মনস্বী

ডিউইর জগৎও এমনি পরিবর্ধনশীল। শ্রীঠাকুর বলেছেন,—জগৎটা যেন জ্বরে রয়েছে, বর্ষায় যেমন জ্বরে থাকে। হেনরি বার্গসঁর মতে, জগৎ চৈতন্যময় [ইলান্-ভাইট্যাল্] তাঁর মতে জগৎকে জানতে হবে প্রজ্ঞার নেত্রে। শ্রীঠাকুর বলতেন,—পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। বার্গসঁ তুবড়ির উপমা দিয়েছেন তাঁর ম্যাটার ও মাইণ্ড এর পার্থক্য বুঝাতে। শ্রীঠাকুর তুবড়ীর উপমা দিয়েছেন জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর পার্থক্য বুঝাতে [বেসিক টিচিংস—ডাঃ ফ্রষ্ট। কথামৃত]

বর্ত্তমান দর্শন মানুষের অন্তরের পরিচয় বাদ দিতে পারে না। [হিউম্যান ভ্যালু]। আবার বিজ্ঞানকেও নিয়েছে আদর করে—জর্জ্জ সান্তায়ানা প্রভৃতি এই দলের। শ্রীঠাকুরের জীবনবেদে আমরা এদুটি দিকেরই পরিচয় পাই। বাজিয়ে নেওয়া, যাচিয়ে নেওয়া তিনি কোন দিনই দেন নি ছেড়ে [সায়েন্টিফিক্ মেথড] আবার সত্য-শিব-সুন্দরের তিনি ছিলেন মূর্ত্ত বিগ্রহ।

নবগতিবাদের প্রবর্ত্তক লয়েড মরগান। এঁর মতে জড় ও দেশকাল থেকে ক্রমে দেবতাদের উদ্ভব হয়। এই গতির মাঝে একটা নূতনত্ব দেখা যায়। জড় থেকে চেতনা, চেতনা থেকে মনের উদ্ভব নবগতিবাদের সূচনা করে। আলেকজাণ্ডার ও লয়েড মরগানের নব-গতিবাদের কথা [ইমার্জেন্ট এভলিউস্‌ন] শ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা পাই। তিনি বলেন,—মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না। এই বলা হল যে, বাজ উঁচু জায়গায় পড়ে কিন্তু দেখা গেছে বড় বাড়ীর পাশে চালা ঘরে এসে বাজ পড়ল। হাউইএর তুবড়ী খানিকটা ফুল কেটে ভেঙ্গে যায়— অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শনের পর দেহ পড়ে যায় আর বিজ্ঞানী নারদাদির তুবড়ি একবার ফুল কাটে আবার বন্ধ হয়, আবার ফুলকাটে—অর্থাৎ প্রেম বিলাস চলে। তিনি আরো বলেছেন মহাবায়ুর কথা। এই মহাবায়ুর গতি কুণ্ডলিনীর গতি—ইনি একে একে চক্র পার হয়ে সহস্রারে গেলে দেবমানব সৃষ্টি হয়। তবে কুণ্ডলিনী চৈতন্যময়ী জড়বৎ থাকেন, জড় দেশকালের থেকে চৈতন্য সৃষ্টি হয় না। [শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত]

মন সম্বন্ধে শ্রীঠাকুরের বাণী,—মনকে যদি ভক্ত সঙ্গে রাখো, ঈশ্বরচিন্তা,

হরি কথা এই সব হবে। মনটি যদি কুসঙ্গে রাখো সেইরকম কথাবার্ত্তা চিন্তা হয়ে যাবে। মনটা দুধের মত। এই সব তত্ত্বে আমরা পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান তত্ত্বের মিল পাই। 'মিল' প্রভৃতি দার্শনিকদের এসোসিয়েসনিষ্ট বলা হয়। এদের মতে মনে যা কিছু জ্ঞান সমস্তই বহির্বিষয়ের সঙ্গে মনের সম্বন্ধেই গড়ে ওঠে। এদের মতে মন যন্ত্র-স্বরূপ। শ্রীঠাকুরও বলেছেন,—আমি যন্ত্র। [ফ্লুগেল—হানড্রেড ইয়ার্স্ অফ সাইকোলজি]

শ্রীঠাকুর আবার বলেছেন,—মনের বাস আজ্ঞাচক্রে। পাশ্চাত্য দেশে কোন কোন মনিষীদের [ডেকার্টে—দি প্যাসন্স্ অফ্ দি সোল ; ষ্টাউট—ম্যানুয়াল অফ সাইকোলজি] এই মতে মনের বা আত্মার বাস পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড এ। [penial gland] এই গ্ল্যাণ্ডই যে দ্বিদল চক্র একথা বলা বাহুল্য মাত্র। উপনিষদেও ব্রহ্মরন্ধ্রে আত্মার বাস উল্লিখিত আছে। [কেন. উপ.]

শ্রীঠাকুর বলেছেন,—কর্ম করতে গেলে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিষটি মনে করে আনন্দ হয়। এই কথাটি মনোবিজ্ঞান সম্মত। উইল [will] বিলিফের [belief] মধ্যে একটি পারস্পরিকতা আছে [টু ফোল্ড রিলেশন] আর আনন্দ হওয়াটাও মনোবৈজ্ঞানিকের ধারা সম্মত। আরো বলেছেন বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞান তত বাড়বে। এও মনোবিজ্ঞান সম্মত কথা, সমস্ত জ্ঞানের পিছনে একটা বিশ্বাস প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান বলতে বুঝায় কতকগুলি চিন্তাধারা, সত্য বস্তুর সঙ্গে এদের সম্বন্ধ, আর এই সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস। শ্রীঠাকুর বলেছেন—ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। অগ্নি বল্লেই দাহিকা শক্তি বুঝা যায়। সাবস্ট্যান্স ও এট্রিবিউটএর অদ্বয়ত্ব শ্রীঠাকুর এই ভাবে প্রতিপাদিত করলেন। সাধারণতঃ এ দুটি তত্ত্বে ভেদ আছে। কিন্তু শ্রীঠাকুরের মতে এদের মধ্যে নিত্য অভেদত্ব রয়েছে।

শ্রীঠাকুর বলেছেন,—দেহ যেন সরা, মন যেন জল, সেই জলে চিৎ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে অর্থাৎ দেহমন যেন চৈতন্যের আধার—চৈতন্য প্রতিফলিত হবার জন্যই তাদের প্রয়োজন। দেহ ও মন সেই হিসাবে পৃথক হলেও যুক্তভাবে আছে। পাশ্চাত্য মতে এটি ইণ্টারএকসনিস্ম্ [interactionism] প্রফেসর বুসের (Prof. Busse) মতবাদও এই

প্রকার। এঁর মতে চৈতন্যের আধারই দেহ ও মন। দেহের পুষ্টির সঙ্গে মনের পুষ্টির যোগ আছে। দেহ ও মন যুক্তসত্ত্বা (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন এণ্ড এথিকস্। পৃঃ ৭০৮) পাশ্চাত্যে বিভিন্ন মনের মধ্যে এই মতই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

বর্ত্তমানে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীঠাকুর এর কারণ দিলেন,—যে মায়েরই খেলা। উপমা দিয়ে বলেছেন,—চোর, চোর খেলা দেখ নাই—বুড়ির ইচ্ছা খেলাটা চলে—অর্থাৎ কর্ম্ম চলুক—মহামায়ার এই বিরাট ইচ্ছা। গীতার ভগবানও অতন্দ্রিত কর্ম্মী। (৩।২৩)

ওয়্যারদিমার, কফ্‌কা প্রভৃতির মতে জ্ঞান সামগ্রিক (Gestalt) শ্রীঠাকুরের ভিতরেও দেখি এই সামগ্রিক দৃষ্টি ভঙ্গী। তাঁর কথায়—কানার হাতী দেখা খণ্ড জ্ঞান, পূর্ণ জ্ঞান নয়। আরো একটি গল্পে এটি বিশদ করে তুলেছেন—সে গল্পটি গিরিগিটী দেখার গল্প। আরো কফ্‌কা প্রভৃতির মতে জ্ঞান প্রজ্ঞা-দৃষ্টির দ্বারা লভ্য। শ্রীঠাকুরের বাণীতে তারই পরিপোষক অর্থ পাই।

কথামৃতে আছে কতকগুলো কানা, হাতীর কাছে এসে পড়েছিল।... হাত বুলিয়ে যে যেখানটা পেলে দেখে এসে কেউ বল্লে জালার মত, কেউ বললে থামের মত ..মহা-বিবাদ। বহুরূপীকে জানাও এমনি, যে গাছ তলায় থাকে ঠিক সেই জানে। কলার, কফ্‌কা প্রভৃতি জেসটালট বাদীদের মতে জ্ঞান অর্জনের পিছনে আছে একটি প্রজ্ঞা দৃষ্টি (Instinct), আমরা সামগ্রিক ভাবে দেখে তবেই জ্ঞান অর্জন করি (It is total reaction to a total response--Basic teachings) আর এই জ্ঞানার্জন সহসাই এসে উপস্থিত হয়। বার্গশঁ প্রভৃতিও এইরূপ কেটে কেটে নিয়ে জানার পক্ষপাতী নন, বৌদ্ধিক দৃষ্টির পক্ষপাতী, প্রজ্ঞাদৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি। হেগেলেও সমগ্রকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। খণ্ড দৃষ্টি তাঁর কাছে ভ্রান্ত দৃষ্টি।

আচার্য্য জেম্‌স্ ল্যাঙ্গ প্রভৃতির মনে সেন্‌সেসান্ বা সংবিত্তি হতেই ভয়, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতি জাগে। শ্রীঠাকুর কিন্তু বললেন,—চোরেরা ক্ষেতে ফসল চুরি করতে আসে। তাই ভয় দেখাবার জন্যে মানুষের চেহারা

করে খড়ের ছবি রেখে দিয়েছে। একজন দেখে এসে বললে ভয় নাই। তবু বুক দুড় দুড় করছে। অর্থ এই ভয় জাগাতে যে সেন্‌সেসান্ হয়েছিল সেটা না থাকাতেও ভয় থেকে যাচ্ছে। আরো বলেছেন,—স্বপ্নে ভয় দেখে জেগে উঠলেও বুক দুড় দুড় করে অর্থাৎ সেন্‌সেসান্ না থাকলেও ভয় হতে পারে।

শ্রীঠাকুর বলেছেন,—উদ্দীপন হয়…শ্রীমতীর সেইরূপ হত—মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়তো।…শোলার আতা দেখলে আসল আতা মনে পড়ে। মাটির কালী দেখলে ভক্তের মনে আসল মা-কালী, মা-আনন্দময়ীর উদয় হয়। বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে। মনোবিজ্ঞানের মতে এগুলি ল অফ এসোসিয়েসন্-এর মধ্যে পড়ে। ল অফ এসোসিয়েসন্-এর তিনটি রূপ আছে তন্মধ্যে ল অফ সিমিলারিটির মধ্যে এগুলি পড়ে। শ্রীঠাকুর আরো বলেছেন,—মেড়গাঁ দিয়ে চৈতন্যদেব যাচ্ছিলেন—শুনলেন এগাঁয়ের মাটিতে খোল তৈরী হয়, অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন—হরিনাম কীর্ত্তনের সময় খোল বাজে—এগুলি ল অফ্ এসোসিয়েসনের মধ্যে পড়ে তবে ল অফ কন্‌টিগুইটির উদাহরণ, ল অফ কনট্রাষ্ট-এর উদাহরণও কথামৃতে আছে। দুইবন্ধুর গল্প—একজন সৎস্থানে গেছে কিন্তু তার অসৎ স্থানের চিন্তা মনে উঠেছে।

ফিজিওগন্‌মি সম্বন্ধে শ্রীঠাকুরের জ্ঞান অদ্ভুত ছিল। বলেছেন,—চলনেতে লক্ষণ ভালমন্দ টের পাওয়া যায়—উনপাঁজুরে, বিড়ালচক্ষু, টেপা নাক—অসরল হয়। ভারী হাত, হাড় পেকে, কনুয়ের গাঁট মোটা, ঠোঁট ডোমের মত হলে নীচ বুদ্ধি হয়। ট্যারা ভারি খল ও দুষ্ট হয়—বিড়াল চোখ, বাছুড়ে গালও।

চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞানও শ্রীঠাকুরের কিছু ছিল। সময় না হলে কিন্তু হয় না, বলে বলেছেন,—যখন খুব জ্বর তখন কুইনাইন দিলে কি হবে—ফিবার মিকচার দিয়ে, বাহ্যে টাহ্যে হয়ে একটু কম পড়লে তখন কুইনাইন দিতে হয়। আবার কারু কারু অমনি সেরে যায়, কুইনাইন দিতে হয় না। দেহেতে রস অনেক রয়েছে, কুইনাইনে কি কাজ হবে। আবার বলেছেন,—বৈদ্যের কাছে না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না। সঙ্গে

সঙ্গে ঘুরতে হয় তবে কোনটি কফের নাড়ী, কোনটি পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়।

শ্রীঠাকুরের চিত্রকলার জ্ঞানও ছিল। নিজেই বলেছেন,—দেখ আমি ছেলেবেলায় চিত্র আঁকতে বেশ পারতুম। দেওয়ালে যশোদার ছবি দেখে বলেছেন,—ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনী মাসী হয়েছে।

উপরে আমরা দর্শন-মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের তত্ত্বের কথা উদ্ধৃত করলাম। কথামৃতের প্রতি ছত্রে এসব গ্রথিত আছে। শ্রীঠাকুরের বাণীর মধ্যে, বীজাকারে যে সব বর্ত্তমান যুগের প্রধান প্রধান দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব উপরে দেওয়া হল, এগুলি দেবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীঠাকুর আজ বিশ্বের মন্দিরে পূজার্হ হয়েছেন। কাজেই তাঁর জীবনায়নে বিশ্বের ভাব ধারার কিছু কিছু নির্দেশ আমরা পেতে পারি। তাঁকে বিশ্বদেব বলে মানলে, বিশ্বের বাণীবার্ত্তাবহ বলে মানতেই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু
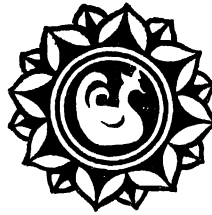
যে সব বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ

রামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা (১ম ও ২য় খণ্ড)—স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম খণ্ড)

—মহেন্দ্রনাথ দত্ত